ইঙ্কাপা খুঁজে ফেরে

ড. জয়দেব মুখোপাধ্যায়

ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে

(দ্বিতীয় খণ্ড)

ড.জয়দেব মুখোপাধ্যায়

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক

সুরেশ দাশ

৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ

কলকাতা বই মেলা,২০১৫

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ শিল্পী

শঙ্কর বসাক

অক্ষর বিন্যাসে

মঞ্জু দাশ

৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা—৯

মুদ্রাকর

রবীন্দ্র প্রেস

১১এ. জগদিশ রায় লেন। কলকাতা-৬

উৎসর্গ

যাঁর অকৃত্রিম মমতা এবং অপরিসীম সহানুভূতি নীলাচলের অনুসন্ধানী মুহূর্তগুলিকে প্রতিনিয়ত অনুরাগে রঞ্জিত এবং অনুপ্রেরণায় স্পন্দিত করে রেখেছে, অগ্রজপ্রতিম পরমবৈষ্ণব এবং আয়ুর্বেদবিশারদ যোগেশ দা'র স্নেহ-কোমল করকমলে 'কাঁহা গেলে তোমা পাই' সকৃতজ্ঞচিত্তে তুলে দিলাম।

প্রীতিধন্য
লেখক

প্রকাশকের কথা

আমার সহৃদয় পাঠক সাধারণ ড. জয়দেব মুখোপাধ্যায়-এর লেখা 'ক্ষ্যেপা খুঁজে ফেরে' প্রথম খণ্ডে আমি আপনাদের কথা দিয়েছিলাম তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধগুলো সংগ্রহ করে দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশ করব। দুঃখের বিষয় সেইলেখাগুলো সংগ্রহ করতে দেরী হওয়ার জন্য দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশেও দেরী হল। এরজন্য আপনাদের নিকট প্রথমেই আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

বর্তমানে 'ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে' বইটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে নিজেকে অনেকটা দায়মুক্ত মনে করছি। এই খণ্ডেও অনেক বিস্ময়কর প্রবন্ধ রয়েছে যা পাঠ করে আপনারা অনেক নতুন নতুন বিষয় জানতে পারবেন এবং আপনাদের কৌতুহল নিবারণ করতে পারবেন। তৃতীয় খণ্ড প্রকাশেরও প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। আপনাদের ধৈর্য্য ও সহযোগীতা কাম্য।

প্রকাশক

এই খণ্ডে আছে—

গুণিজনদের বইটি সম্পর্কে অভিমত

"সে কোথায়"

প্রতি বছরের মত ১৯৭৬ এর জুনে পুরী এসে ক্রমে শুনলাম আনন্দময়ী আশ্রমের সংলগ্ন গৃহে একজন অধ্যাপক বাস করছেন কোনও গবেষণায় রত হয়ে। সামান্য দেখাশুনা আলাপও হয়েছিল সেবারে। তারপর ১৯৭৭ -এর অক্টোবরে পুরী এলে আশ্রমের এক ব্রহ্মচারী আমাকে পাঠিয়ে দিলেন পড়বার জন্য একখানা 'ঝাড়গ্রাম বার্তা' যাতে প্রকাশিত হয়েছে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণার বিষয় একটি লেখায়। প্রথমেই পড়ে মুগ্ধ হলাম-- একটি ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়বস্তুকে নীরস কঠোর ঐতিহাসিক তথ্যকে রোমাঞ্চকর কাহিনীর আকারে প্রকাশ করবার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা দর্শন করে। তারপর শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি থাকা সত্বেও ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধানের প্রতি তাঁর গভীর নির্ভীক নিষ্ঠাও মনকে মুগ্ধ করে। আমার মনে হয় ইহাও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগেরই ফল। যে অনুরাগী সেই প্রেমাস্পদের অশেষ বিশেষ জান্‌তে ব্যাকুল হয়। তাঁরই জিজ্ঞাসা জাগে 'সে কোথায়?

অর্ধাধিকজগতের নরবপু ভগবান্ যীসুখৃষ্ট প্রকাশ্যেই ঘাতকের দ্বারা দেহ- ত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন,অর্ধাধিক ভারতের প্রাণ (Soul of India) নরবপু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গুপ্তঘাতক ব্যাধের গুপ্তবাণের আঘাতে দেহত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু তাতে সেই ভগবানের মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ন্যূনতা প্রাপ্ত হয় নাই, যীশুভক্ত বা শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের ভক্তিও কোনরূপ বাধা বা ন্যূনতাপ্রাপ্ত হয় নাই। তাই, আজ যদি ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধান ও তথ্য ইহাই প্রমাণিত করে যে দুর্নিবার নিয়তির বলে নর-বপু গভবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বাভাবিকভাবে বা অস্বাভাবিকভাবে মাতৃগর্ভজাত নর-বপু ত্যাগ করেছিলেন এবং গোপনে সমাধিনিহিত হয়েছিলেন তথাপি তাঁর আলোক সাধারণ দিব্য মহিমা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে বলে প্রকৃত ভক্তের মনে করা উচিত হবে না, যদিও তাঁদের হৃদয় অব্যক্ত বেদনায় ব্যথিত হয়ে উঠতে পারে। প্রকৃত ভক্তের ভক্তিও তাকে ক্ষুণ্ণ বা ন্যূনতা প্রাপ্ত হবে না। কারণ ভাব-ভক্তির সাধনা চিরদিনই ব্যস্তবকে স্বীকার করেও বাস্তবেই আবদ্ধ থাকে না, বাস্তবকে অতিক্রম করে বাস্তবাতীত ভাবরাজ্যে বিচরণ করে। ভাবরাজ্যে তাঁদের প্রকৃতি নিয়মাধীন প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহও অপ্রাকৃত তনুর রূপ ধারণ করে।

লেখক তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের ফলে এবং শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় বহু প্রাচীন বাংলা ও ওড়িয়া পুঁথি সংগ্রহ ও অনুসন্ধান করে যে সকল মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার দ্বারা আশা করা যায় তিনি অচিরেই তাঁর চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে

পারবেন। প্রকাশিত প্রবন্ধে যে তথ্যগুলি প্রমাণের সহিত তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছেন সেগুলি হল যথাক্রমেঃ—

(১) রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবকে পত্রের দ্বারা সাবধান করেছেন যে অমুক অমুক ভক্তেরা আসলে তাঁর ভক্ত নয়, গোবিন্দ বিদ্যাধরের চর।

(২) শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর তিরোধানের সেই দিবসে বৈকালে কীর্তন করতে করতে মন্দিরে প্রবেশ করলে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করা হয় এবং প্রায় ৬/৭ ঘণ্টা পরে রাত্রিতে খোলা হয় এবং প্রচার করা হয় যে মহাপ্রভুর দেহ প্রভু জগন্নাথের দেহে লীন হয়েছে।

(৩) কিন্তু ' প্রত্যক্ষ জ্ঞানি' বৈষ্ণবদাস লিখেছেন যে তাঁর দেহ গুরুড়স্তম্ভের পাশে মৃত পড়েছিল।

(৪) রাজা প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিয়েছিলেন যে মহাপ্রভুর দেহ যেন হরিনাম সহকারে সমাধিস্থ করা হয়।

(৫) রাজা প্রতাপরুদ্র অচিরেই কটকে পলায়ন করেন এবং পুরীধামে কীর্তন বন্ধ হয়ে যায়।

(৬) রাজার দুই পুত্রকে পর পর সিংহাসনে বসিয়ে এক বৎসরের মধ্যেই দুজনেই ঘাতকের হাতে নিহত হলে গোবিন্দ বিদ্যাধর নিজেই সিংহাসনে বসেন ও দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিত্যস্বরূপের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন শ্রীমান জয়দেবকে পূর্বের মতই তাঁর অবশিষ্ট অনুসন্ধান সমাপ্ত করে প্রকাশিত করবার শক্তি, স্বাস্থ্য ও সুযাগ প্রদান করেন।

শ্রী দীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী তর্কবেদান্ততীর্থ
(রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত)
অতিরিক্তাধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন ইউ, জি. সি. অধ্যাপক গভর্ণমেন্ট
সংস্কৃত কলেজ কলকাতা, প্রাক্তন
সংস্কৃতাধ্যাপক যাদবপুর, বিশ্ববিদ্যালয়।

"শ্রীরাধাকান্ত জয় শ্রীরাধে প্রাণ-গৌর বিশ্বম্ভর"

[শ্রীধ্যানচন্দ্র দাস নিজে অবাঙ্গালী হয়েও স্বহস্তে এই বাংলা বক্তব্য লিখেছেন। ইনি গম্ভীরার একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সংগঠক হিসাবে পুরীতে বিশেষ সম্মানিত]

গবেষক শ্রদ্ধেয় যে. মুখার্জী মহাশয়ের ' সে কোথায় ' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। লেখক মহাশয়ের ভাব ও ভাষা বেশ সরল হওয়ায় ইহা সর্বসাধারণের দ্বারায় আদৃত হইবে সন্দেহ নাই। চতুর্দশ ভাষাবিদ দেশ- বিদেশ পর্য্যটনকারী সত্যসন্ধিৎসু জ্ঞানপিপাসু আকুমার ব্রহ্মচারী এই লেখক মহাশয়ের লেখনীতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপা প্রেরণা যে অন্তর্নিহিত হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অর্ন্তদ্ধান লীলা সম্বন্ধে লেখক মহাশয় শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের পয়ার " তিন প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে।।" উদ্ধার করে থাকায় আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। কারণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অন্তঃলীলা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রচৈতন্য চরিতামৃতকার নীরব রহিয়াছেন। কেবল শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের উপরোক্ত পয়ার শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অন্তর্ধান লীলার দিগ্‌দর্শন দেয়। অধিকাংশ ভক্ত শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অর্ন্তদ্ধান লীলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তাঁহারা লেখক মহাশয়ের এই বইখানা পাঠ করিয়া সন্দেহমুক্ত ও আনন্দিত হইবেন আশা করি।

পরিশেষে নীলাচলবিহারী গম্ভীরানাথ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা করি যেন তিনি বাস্তববাদী উৎসাহী লেখক মহাশয়ের এই সৎ এবং মহৎ বাসনা তথা উত্তরোত্তর উন্নতিপথে সহায়তা করুন। জয়শ্রী গম্বীরাবিহারী গৌরহরি। ইতি—

শ্রীগম্ভীরাবাসৈকনিষ্ঠ
শ্রীধ্যানচন্দ্র দাস

শ্রীরাধাকান্ত মঠ
শ্রীক্ষেত্র-পুরীধাম
৬/৬/৭৮

পঙ্গুং লংঘয়তে শৈলং মূকমা বর্ত্তয়েৎ শ্রুতিং।
যত কৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণ চৈতন্যমীশ্বরম।।

[পণ্ডিত হিমাঙ্গভূষণ দাস পুরীর শ্রেষ্ঠ ভাগবত পাঠকরূপে পরিচিত। তাঁর পাণ্ডিত্য বৈষ্ণব-সাহিত্যে এককথায় তুলনীয়।]

কলিযুগ পাবন শ্রীশচিনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর নিজ শ্যামসুন্দর স্বরূপে যে ভক্তিরস মাধুরীর উৎস ও পরম করুণা নিজ নিত্য পরিকর তথা ভক্ত ছাড়া সর্বজন উপভোগ করিতে পারেন নাই। তাহা কিঞ্চিদুন পাঁচশত বৎসর পূর্বে করিয়া গিয়াছেন। সেই পরোপকার জীবের পরম প্রাপ্য প্রেমধন যে ভাবে এই ধরা ধামে ছড়াইয়া গিয়াছেন তার ইতিহাস তার সমসাময়িক চরিতকারগণ যাহা যেরুপে তাহাদের চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ভাগবত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্রচৈতন্য মঙ্গল শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্য শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত ও শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতুলনীয় হইলেও শ্রীরামায়ণ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণের অর্ন্তদ্ধান লীলা বর্ণনের ন্যায় শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের অর্ন্তদ্ধান লীলার সূচনা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ইহা যেমন এক বিরাট অভাবরূপে দেখা দিয়াছে, তেমনি বড় রহস্যাচ্ছন্নরূপে বোধ হইতেছে। জিজ্ঞাসু ঐতিহাসিকগণের এই অভাব কে মিটাইবে? আমরা কিন্তু এই অনুসন্ধিৎসাকে মোটেই গুরুত্ব দিই না। কারণ নিত্য অব্যক্ত ভগবতৎস্বরূপ তাহার কৃপা বা ইচ্ছাতেই জীবজগতে বা মায়ার রাজ্যে ব্যক্ত হইয়া থাকে সেই ব্যক্ত রূপের অব্যক্ত দৃশ্য শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্ত ও স্বয়ং ভগবত্তার মধ্যেও দেখা গিয়াছে কিন্তু "ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণ জগতি পর তত্তং পরমিহ" চরিতামৃতকারের এই অনুভূতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন কি এই অদৃশ্য অর্ন্তদ্ধান ললিা? অন্যান্য অবতারের নিত্যতা পুরাণ-শাস্ত্রে নিরূপিত হইলেও অনিত্যতার ভ্রম জন্মাইয়া দেয় তাঁদের অর্ন্তদ্ধান লীলার দৃশ্যের বর্ণনায়"। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্ন্তদ্ধান লীলার সেই অনিত্যতার ভেল্কি না থাকায় বোধহয়।

'অতএব শ্রীচৈতন্যগোসাই পরত্ত সীমা'। তবুও জিজ্ঞাসু অনুসন্ধি ৎসুর এই গৌণ জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে বলিষ্ঠ লেখনী ধরিয়াছেন ডক্টর শ্রীমান জয়দেব মুখার্জী মহাশয় তাঁহার সর্বোচ্চ যোগ্যতা ভক্তিভাবের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিতি হওয়ায় তিনি তাহা পারিবেন এই আশা আমাদের আছে। তিনি গৌরসুন্দরের অবদান ও অন্তর্ধান রহস্য আবিষ্কার করিয়া লোকচক্ষুর গোচর করাইবার জন্য শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাকেই সম্বল করিয়াছেন। মনে হয় অনেকটা কৃপা পাইয়াছেন ও আমরাও পূর্ণ কৃপা পাত্র হওয়ার জন্য মহাপ্রভুকে জানাইতেছি।

শুভাশংসন

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বঙ্গভারত তথা বিশ্বের সাংস্কৃতিক জগতের এক মূর্ধন্য পুরুষ। ষোড়শ শতাব্দী হতে আজ বিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত জগতের ধর্মান্দোলনে তাঁর লোকাতিশায়ী প্রভাব অনস্বীকার্য। জীবোদ্ধারে ধরনীর ধূলায় লুটিয়ে পড়ে হরিনামে মাতোয়ারা হয়ে উপনিষদের "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ" বাণীকে তিনি সার্থকতার সহস্রধারায় উচ্ছ্সিত করে তোলেন। তাঁর দিব্য জন্মকর্মের পুংখানুপুংখ সংবাদ পেলেও মহাপ্রয়াণের কোন সুষ্ঠু সর্বজনসম্মত বর্ণনা এখনো পাওয়া যায়নি। গভীর জিজ্ঞাসা হয়ে আছে তাঁর তনুত্যাগের ঘটনা। ইতিহাসের এই রহস্যকে উন্মোচন করার জন্য কোন সক্রিয়, সচেতন, তথ্যনিষ্ঠ প্রয়াস এখনও দেখিনি। ব্যতিক্রম বর্তমান গ্রন্থ। সত্যানুসন্ধানী, ভক্ত মহাসারস্বত ডঃ শ্রীযুক্ত জয়দেব মুখোপাধ্যায় এই রহস্যের উৎসানুসন্ধানে অভিযাত্রী। "কাঁহা গেলে তোমা পাই" গ্রন্থে তাঁর অনুসন্ধিৎসার ফল মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের সকল কিংবদন্তীই তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। কাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত করে নানা পাত্র- পাত্রীর সমাবেশ ঘটিয়ে নীরস ইতিহাসকে তিনি সরস সাহিত্যে উন্নীত করেছেন। কিন্তু, ঐতিহাসিকের সত্য ও তথ্যনিষ্ঠার কোনো বিচ্যুতি তিনি ঘটাননি। সকল মতবাদেরই সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন করেছেন। সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং ভক্তদের দ্বারা তিনি নন্দনীয়। ভক্তের শ্রদ্ধা এবং ঐতিহাসিকের তথ্যনিষ্ঠার গঙ্গাযমুনাসঙ্গম এই সদ্‌গ্রন্থ। এই খণ্ডে তাঁর যাত্রা শেষ হয়নি। বাঞ্ছিত সংবাদ হয়তো দ্বিতীয় খণ্ডে মিলবে। তারই জন্য তিনি আমাদের উৎকণ্ঠিত করে রেখেছেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক সারস্বত অভিযানে বলি "শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ"।

ইতি—

বিমুগ্ধ শুভৈষী
শ্রী ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বিচারপতি পিতা, বিচারপতি দাদামহাশয়ও, তবু
ডক্টর জয়দেব মুখোপাধ্যায় আইন-শিক্ষার পথে
পা না বাড়াইয়া-আশৈশব ধর্ম,সংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্ব
প্রেমী এক সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের পথিক।
বাল্যকাল হইতেই বহির্মুখী মন।
জন্ম তৃতীয় দশকের শেষভাগে--রবীন্দ্র-তীর্থ বোলপুরে।
প্রাচ্যদর্শনের উপর ডক্টরেট হলেও মূলতঃ প্রাচীন
ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতিই তাঁহার লেখনীর প্রধান
বিষয়। ডক্টর মুখোপাধ্যায় মধ্য এশিয়া,জাম্বেসী,তিববত,মঙ্গোলিয়া,
যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শনের অনুসন্ধানে
পরিভ্রমণ করিয়াছেন একাধিকবার।
শিবের ঐতিহাসিকতার উপর গবেষণার জন্য
নানা গীরিবর্ত্ম ধরিয়া কৈলাস মানসসরোবরে যাতায়াত
করিতে হইয়াছে তাঁহাকে (১ম খণ্ডে বর্ণিত) বারংবার নিজের
জীবনকে বিপন্ন করিয়াও। শিব-সংস্কৃতির উপর তাঁহার
অনুসন্ধানের ফল অচিরেই পাঠকসমাজে পরিবেশিত
হইবে বলিয়া আমরা আশা রাখি।
সে এক অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতারঞ্জিত সাহিত্যকর্ম।
পুরীর শ্রী আনন্দময়ীর আশ্রমে শেষ জীবন পর্যন্ত থাকিয়া
তাঁর গোবেষনার কাজ চালাইয়া গিয়াছেন তাঁর লেখার মাধ্যমে।

'কাঁহা গেলে তোমা পাই' প্রবন্ধের দ্বিতীয় খণ্ড আর প্রকাশিত করা গেল না, কারণ দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপী আমার হাতে পৌছানর আগেই লেখক ড. জয়দেব মুখোপাধ্যায় আততায়ীর হাতে নির্মমভাবে দেহত্যাগ করলেন। তাঁর লেখা প্রায় সমাপ্তি হয়ে এসেছিল এবং আমাকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করতে পারলেন না। তাঁর আমাকে লেখা শেষ চিঠিটি আপনাদের কৌতুহল নিবারণের জন্য এখানে প্রকাশ করে দ্বিতীয় খণ্ডের সমাপ্তি ঘটালাম।

প্রকাশক

OM MA

SRI ANANDAMAYEE ASHRAM

SWARGADWAR, PURI–752001 Phone 2925

Date ....

প্রিয় [illegible] —

আপনার পূর্ব্বপত্রের উত্তর আমি যথাসময়ে দিয়েছিলাম। পান নি জেনে দুঃখিত হলাম। আমার দ্বিতীয় খণ্ডটি সম্পর্কে আমি নিশ্চয় কথা দিতে পারবো। [illegible]। আপনি শারীরিক কুশলে আছেন তো? [illegible] প্রায়ই আপনাদের কথা জিজ্ঞেস করেন। [illegible] ভাল আছেন। '[illegible] সন্ধানে' পাঠালাম।

শ্রদ্ধা নমস্কার নেবেন।

বিনয়াবনত
জয়দেব
১৪/৭

শ্রীসুরেশ দাস,
আনন্দ প্রকাশনী,
কলকাতা — ৯

দ্র:— পত্রোত্তরের প্রত্যাশায় রইলাম।

ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে
(দ্বিতীয় খণ্ড)

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাসুকীর সন্ধানে

এক

টাউন স্কুলের ক্লাস এইটে ফার্ষ্ট পিরিয়ড্ সবে শুরু হয়েছে। ক্লাস টীচার ধর্মদাসবাবু ইতিহাসের পাতা খুলে পড়ানো শুরু করতে যাচ্ছেন, এম্‌নি সময় বাইরের করিডোরে দাঁড়িয়ে, নটিবয়-সু মোজা পরা, সাদা হাফ প্যান্ট ও সাদা হাফ সার্ট গায়ে, একটি বছর বারো-তেরোর ছেলে মিষ্টি কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে অনুমতি চাইলো ক্লাসে প্রবেশের...মে আই কাম্ ইন্, স্যার?

ইংরেজীর ক্রটীহীন অ্যাক্সেন্ট শুনে ধর্মদাস সবিস্ময়ে মুখ তুলে চাইলেন ছেলেটার দিকে। বললেন—Yes,You may ছেলেটি এত অল্প বয়সেই চশমা নিয়েছে। মাথার চুলগুলো-কোঁকড়া। উন্নত ললাট। টিকালো নাকের দুই পাশের দুই মস্ত চোখ থেকে বুদ্ধির দীপ্তি যেন ফেটে বেরুতে চাচ্ছে। সদ্য প্রবেশকারী কোন দিকে না তাকিয়ে, মুখে কেবল একবার 'থ্যাংক ইউ স্যার' বলে, সোজা গিয়ে বস্‌লো ফার্ষ্ট বেঞ্চে বসে থাকা ক্লাস মনিটর এবং ক্লসের ফার্ষ্ট বয়—সর্ববিজয় হাজরার পাশে।

ধর্মদাসবাবু বললেন— 'ক্লাসে যে ফার্ষ্ট হয়, ঐ সীটে সেই কেবল বসতে পারবে। সর্ববিজয়ের পাশে এখনই তুমি বসো না। আজ তুমি লাষ্ট বেঞ্চে বসো। কালকে আমি তোমার সীট ঠিক করে দেবো।

ক্লাসে আমিও তো ফার্ষ্ট হয়েই প্রমোশন পেয়েছি স্যার। এই দেখুন আমার প্রগ্রেস রিপোর্ট'। এই বলে ছেলেটি উঠেগিয়ে, বুক পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে— ধর্মদাস বাবুর চোখের সামনে সেটি মেলে ধরলো। ধর্মদাসবাবু দেখলেন— ঢাকার পোগোজ স্কুলের ক্লাস সেভেনের প্রগ্রেস রিপোর্ট। সত্যিই ছেলেটা ফার্ষ্ট হয়ে এসেছে সেখান থেকে। অ্যাভারেজ পঁচাশি পার্সেন্ট মার্কস পেয়ে।

'তোমার নাম দেখছি জয়ন্ত!' ধর্মদাসবাবু বললেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার চারটি নামের মধ্যে একটি নাম হচ্ছে জয়ন্ত।'

অদ্ভুৎ সপ্রতিভ ছেলেটি তো। একটু হেসে শুধালেন ক্লাসটীচার, 'তাই নাকি? আরও তিনটে নাম আছে নাকি তোমার?'

' আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবা বলেন— আমি কেবল জয়ন্তই নই, আমি হচ্ছি Joh de vivre!'

'এ আবার কোন ভাষা?'

'আজ্ঞে ফ্রেঞ্চ। মানে— বাঁচার আনন্দ। আর মা দিয়েছেন যে নামটি সেটিও ফ্রেঞ্চ ভাষাতেই। সেটি হচ্ছে— পাল- এ তোয়ালে। এর মানে কি জানেন, স্যার?'

'না।'

'এর মানে,সন্ধ্যাতারা। মা বললেন— আমার চোখ দুটো নাকি সন্ধ্যাতারার মত জ্বলজ্বলে আর স্নিগ্ধ। আচ্ছা, স্যার, এ কি সত্যি?'

আবার না হেসে পারলেন না ধর্মদাসবাবু। বললেন—' মা যখন বলেন, তখন নিশ্চয়ই সেটা ঠিক। এবার শুনি তোমার চতুর্থ নামটি কি?'

সদ্যাগত কিশোরের কণ্ঠ আবার ধবনিত হল বিস্ময়স্তব্ধ সেই ক্লাসঘরে—' আজ্ঞে, আমাকে ঢাকার পোগোজ স্কুলের সূর্য্য পণ্ডিত ডাক্তেন হনুমান বলে।

' হনুমান? ক্লসের ফার্ষ্টবয়কে পণ্ডিতমশাই হনুমানের আখ্যায় আখ্যায়িত করলেন কেন?'

' আমি রাম আর রামায়ণকে যে বড় ভালবাসি, স্যার। হনুমানও তো খুব রামভক্ত ছিলেন!'

' কেউ হনুমান বলে ডাকলে তোমার রাগ হয় না?'

' একটুও না। শ্রীরামচন্দ্রকে হনুমানের মত যেদিন আমার বুক চিরে আমার বুকের মধ্যে দেখাতে পারবো, সে দিনই তো সার্থক হবে আমার ইহজন্ম।' এবার আশ্চর্য্যের আর সীমা রইল না ধর্মদাসবাবুর। এইটুকু ছেলের মুখে এমন অদ্ভুৎ কথা তিনি কখনও শোনেন নি এর আগে। ছেলেটার পোষাক-আসাক আবভাব দেখলেই বোঝা যায়-এ কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। সুন্দর ইংরেজী উচ্চারণ। পঁচাশি পারসেন্ট নম্বর পেয়ে ফার্ষ্ট হওয়া ছেলে। -অথচ ও বুক চিরে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখাতে চায় সকলকে, রাম আর রামায়ণে ওর এত শ্রদ্ধা, এত ভক্তি। 'তোমার বাবা-মা বুঝি খুব ভাল ফ্রেঞ্চ জানেন?' শিক্ষকের প্রশ্ন।

'বাবা খুব ভাল জানেন। মা বাবার কাছ থেকে শিখেছেন একটু আধটু।' ছাত্রের উত্তর।

'তা ঢাকা ছেড়ে চলে এলে কেন?'

'বাবা যে বদলী হয়ে এলেন।'

'কি কাজ করেন তোমার বাবা? প্রফেসর?'

'আজ্ঞে না। আমার বাবা ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেসনস্ জাজ।' একটু গম্ভীর দেখালো এবার ধর্মদাসবাবুকে। ডিষ্ট্রিক্ট জজের পুত্র জেনেও স্কুলের এক অতি সাধারণ যে পণ্ডিত হনুমান বলে ডাক্‌তে পারেন একে, তিনিও যে কম বড় প্রেমী এবং তেজস্বী পুরুষ নন, সেটা যেন হঠাৎ বুঝতে পারলেন এতক্ষণে ধর্মদাসবাবু। পণ্ডিত নিশ্চয়ই এর রামগত প্রাণকে সম্মানিত করেছিলেন, আরও উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন, একে পরম স্নেহে 'হনুমান' বলে ডেকে।

'আমি তাহলে কোথায় বসবো আজ, স্যার?' জয়ন্ত শুধালো। 'সর্ব্ববিজয়ের পাশেই বোসো'।

জয়ন্ত গিয়ে পাশে বসতেই, সর্ব্ববিজয় একটু ঘেঁসে এলো তার দিকে। খুশি খুশি

মুখ করে বলল—' তুমিও ফার্ষ্ট বয়, আমিও ফার্ষ্ট বয়। সামনের পরীক্ষায় দেখবো এবার কে ফার্ষ্ট হয়।'

ফোর্থ পিরিয়ডে জয়ন্তকে শ্লিপ দিয়ে ডেকে পাঠালেন হেডমাষ্টার। জয়ন্ত তাঁর ঘরের পর্দ্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে নমস্কার করে দাঁড়ালো।

'তোমার নাম জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়?' হেডমাষ্টার জিজ্ঞেসা করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমার বাবা একজন প্রাইভেট টিউটর চেয়েছেন। তুমি কি সব সাবজেক্ট পড়তে চাও এই টিউটরের কাছে। ' আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে বেশী করে পড়তে চাই রামায়ণ যিনি রামায়ণ সবচেয়ে ভাল জানেন, আমাকে, স্যার, তাঁর কাছেই পড়তে দেবেন।'

'সে কি? রামায়ণ? তোমাদের ক্লাসের সিলেবাসে রামায়ণ কোথায়?'

'তবু, স্যার, আমি রামায়ণকে বেশী করে বুঝতে চাই, জান্‌তে চাই।'

'কেন?' বিস্মিত হেডমাষ্টার আবার প্রশ্ন করলেন, ' রামায়ণে তুমি কি পাও?'

'আনন্দ, আবেগ, উদ্দীপনা। সারা পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাস ঘেঁটেও কি আপনি আর একটি মানুষকে দেখাতে পারবেন— যিনি শুধু পিতৃ-প্রতিজ্ঞা পালনের জন্যে, রাজ্য, রাজবিলাস সব ত্যাগ করে চোদ্দ বছরের জন্যে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেন এমনি সহায় সম্পদহীনভাবে?'

হেডমাষ্টার বিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাদ্যায়ের বিস্ময় ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বললেন, 'রামায়ণের কাহিনী তো অল্পবিস্তর সব মাষ্টারমশাইরাই জানেন। তোমার খিদে

মেটাবার শক্তি তাঁদের সকলেরই আছে, মনে হয়। ঠিক আছে। রামায়ণ পড়া আছে, এমন টিউটরই দেবো তোমাকে।'

পাঠক- পাঠিকারা হয়ত অবাক হচ্ছেন এই ভেবে যে, একটি নতুন অ্যাডমিশন নেওয়া ক্লাস এইটের বাচ্চা ছেলেকে এত খাতির করছেন কেন হেডমাষ্টার মশাই! ছাত্রকে জিজ্ঞেসা করে টিউটর ঠিক করেন আবার কোন শিক্ষক?

কিন্তু, যে ঘটনার কথা বিস্তারিতভাবে শোনাতে বসেছি আজ আপনাদের,সেটা তো হালফিলের ঘটনায়। এ ঘটনা ঘটেছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে, বৃটিশ রাজত্বে। তখন সব গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলে, ডিষ্ট্রিক্ট জজ এবং ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পুত্রদের ওপর একটা বিশেষ দৃষ্টি রাখা হত। একজন ডিষ্ট্রিক্ট জজ চিঠিতে অনুরোধ করেছেন হেডমাষ্টার মশাইকে একটি টিউটর ঠিক করে দেবার জন্যে, তাই বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন গভর্ণমেন্ট টাউন স্কুলের হেডমাষ্টার বিষ্ণুপদবাবু।

'কিন্তু, স্যার — জয়ন্ত ইতস্তত করতে লাগলো। বলে! আমি যে রামায়ণের মধ্যে দিয়ে কতগুলো ঐতিহাসিক সত্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। বাবাকে অনেক প্রশ্ন করেছি। বাবা বলেছেন, রামায়ণ পড়ে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তোমার মনে, নিশ্চয়ই সে প্রশ্নের সমাধানও আছে ঐ রামায়ণের মধ্যেই। কিন্তু কে আমাকে খুঁজে বের করে দেবে ঐ সমাধান রামায়ণের মধ্যে থেকে? আমি যে সংস্কৃত ভাল জানি না; বাল্মিকী- রামায়ণ পড়ি, কিন্তু সব বুঝতে পারি না। বাবা বাংলা অনুবাদ কিনে দিয়েছেন, পড়ি। ভয় হয়, যদি অনুবাদ ঠিকমত না হয়ে থাকে?

'তুমি বাল্মিকী-রামায়ণ পড়ো সংস্কৃতে? সংস্কৃত শিখলে কার কাছে?'

'বাবা পণ্ডিত রেখে দিয়েছিলেন ঢাকায়, তাঁর কাছেই শিখেছি। কিন্তু বাল্মিকী-রামায়ণের সব জায়গা বুঝতে পারি কই!'

বিষ্ণুপদবাবু ছোট্ট এই ছেলেটির সামনে হঠাৎ কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। এম্-এতে তাঁর বিষয় ছিল ইংরাজী। একান্ন বছর পার হয়ে গেল, এখনও বাল্মিকী রামায়ণ খুলেও দেখেন নি নিজে কোনদিন। সংস্কৃত পড়তেও পারেন না ভাল করে। আর এই বারো-তেরো বছরের বালক কেবল সংস্কৃত শিখে নিয়ে বাল্মিকী-রামায়ণ পাঠই যে করেছে তাই নয়, সে ঐ রামায়ণের মধ্যে থেকে কতগুলো ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধানেও নাকি লিপ্ত! এ এক অভাবনীয় কাণ্ড! কিন্তু ছেলেটি Interesting, সে বিষয়ে প্রথম পরিচয়েই কোন সন্দেহ রইল না হেডমাষ্টারের মনে।

'ঐ টুলটায় বসতে পার।'

সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত জানালো সবিনয়ে-সে টীচারদের ঘরে কখনও বসে কথা

বলে না। অতএব সে দাঁড়িয়েই রইলো। শান্তস্বরে বিষ্ণুপদ বাবু এবার জানতে চাইলেন—কোন ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধান করছে জয়ন্ত রামায়ণের মধ্যে। রামায়ণ তো একটা পুরাণ-গ্রন্থ, একটি মহাকাব্য মাত্র! তার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যাবে কেন?

মুহূর্ত্তে উত্তেজিত হয়ে উঠল বালক। বেশ তীক্ষ হয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর। বলল-'আপনিও? আপনিও স্যার? আপনিও রাময়ণকে কেবল মহাকাব্য বলে জ্ঞান করেই দূরে সরিয়ে রাখবেন? মানবেন না— রামায়ণের মধ্যেও লুকিয়ে আছে তখনকার কালের অনেক বিস্মৃত ইতিহাস?'

এই বলেই, ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে জয়ন্ত-ঘরের দরজায় ঝুলন্ত নীল পর্দ্দাটাকে সবেগে সরিয়ে।

স্নেহের হাসি ফুটে উঠল এবার হেডমাষ্টারের ওষ্ঠদেশে। পরম শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস করে যে পুরাণগ্রন্থটিতে,সেই রামায়ণকে 'মহাকাব্য মাত্র' বলা সহ্য করতে পারলো না ছেলেটা। এ থেকে এটুকু তো বুঝতে কষ্ট হবে না কারও যে, জয়ন্ত রামচন্দ্র আর রাময়ণকে ভালবাসে মন-প্রাণ দিয়ে। সে ভালবাসায় খাদ নেই কোথাও একটুও।

দুই

পরদিন সকালেই বিষ্ণুপদবাবু দেখা করলেন জয়ন্ত জনকের সঙ্গে তাঁর কোয়ার্টার্সি-এ গিয়ে। বিরল কেশ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, প্রশান্ত কান্তি জজ সাহেব হবে, বোধহয় নিত্যকার পূজো সাঙ্গ করে উঠে এলেন ড্রয়িং রুমে। অঙ্গে গরদের কাপড় ও চাদর। কপালে চন্দনের ফোঁটা। ঢুকেই সহাস্য বদনে বললেন– 'আপনি আমার ছেলের শিক্ষাগুরু, তাই আপনি আমারও নমস্য। আমার নমস্কার গ্রহণ করবেন।' অভিভূত বোধ করলেন হেডমাষ্টার। একজন ডিষ্ট্রিক্ট জজ যে তাঁকে 'শিক্ষাগুরু' সম্বোধনে সম্বোধিত করে এমনভাবে নমস্কার নিবেদন করবেন, এ তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। জেলার প্রধান বিচারপতি যিনি, তাঁর মধ্যে এত বিনয়, এত নম্রতা! এ এক আশ্চর্য্যের ব্যাপার বটে।

করযোড়ে সঙ্কোচ প্রকাশ করলেন হেডমাষ্টার—' সে কি? আমি আপনার নমস্য হবো কেমন করে? আপনি বসে আছেন সারা জেলার বিচার বিভাগের সবার শীর্ষে, আপনিই তো আমাদের সকলের প্রণম্য। আপনার পূজোয় হয়তো ব্যঘাত ঘটালাম, আমি দুঃখিত।'

'না,না, ব্যাঘাত আপনি একটুও ঘটান নি। পূজো আমার শেষ হয়েই গিয়েছিল। আপনি বলুন, কি বলার জন্যে আপনি এসেছেন।'

'আপনি চিঠিতে আপনার ছেলের জন্যে একটি টীউটর ঠিক করার অনুরোধ জানিয়ে—বিষ্ণুবাবুর কথা শেষ হবার আগেই জয়ন্ত জনক বলে উঠলেন—'হ্যাঁ চিঠি আমি দিয়েছিলাম। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আপনার সুবিধামত একজন মাষ্টার মশাইকে ঠিক করে দেবেন, তাহলেই হবে। এই সামান্য ব্যাপারের জন্যে আবার আপনি কষ্ট করে আমার কাছে এসেছেন-'

'কষ্ট আমার একটুও হয়নি মিঃ মুখার্জি। আপনার অমায়িক ব্যবহারে বরং আমি বিস্মিত আর অভিভূত না হয়ে পারছি না। গতকালই প্রথম দেখলাম আপনার পুত্রকে, তাও মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে। কিন্তু ঐ কয়েক মিনিটের মধ্যেই এটুকু বুঝতে কষ্ট হয়নি আমার যে, ছেলেটি আপনার কখনই অন্য দশটা সাধারণ ছেলের মত নয়। ওর কথায় স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ও আপনাকে কতটা গভীরভাবে ভক্তি করে। তাই স্বেচ্ছায় দেখতে এলাম আপনাকে একবার আজ। আপনি তো আপনার পত্রে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেন নি আমাকে।'

'ভক্তি করে গভীরভাবে?' একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো জজ সাহেবের বুক থেকে। চোখ দুটো যেন ছলছল করে উঠল একবার, মনে হল। তারপর পুনশ্চ বললেন, 'হ্যাঁ, ভালোবাসে জয়ন্ত তার বাবা-মাকে, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এই ছেলেই হঠাৎ রাত্রে উঠে একখানি মাত্র প্যান্ট পরে খালি গায়ে খালি পায়ে বেরিয়ে যায় যখন বাড়ী থেকে, নিঃশব্দে যখন দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ-তার কোন চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও, যখন আমার চাপরাশী-আর্দ্দালীরা চারিদিকে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে ফিরে আসে বিষন্নমুখে, তখন সেই ভালোবাসা যে কী ধরণের ভালোবাসা— সে সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন দেখা দেয় নিজে· থেকেই।'

সবিস্ময়ে হেডমাষ্টার শুধালেন—' জয়ন্ত বাড়ী থেকে পালিয়ে যায় বুঝি প্রায়ই?'

'পালিয়ে যায় বলাটা ঠিক হবে না বোধহয়, কারণ অধিকাংশ ছেলের পালিয়ে যাওয়ার পেছনে লুকিয়ে থাকে হয় ক্রোধ, না হয় কোন আশঙ্কা। জয়ন্তের ক্ষেত্রে সেরকম কিছুই থাকে না। ভালোমানুষ, রাত্রে আমার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাওয়া-দাওয়া করলো হাসি মুখে। ওতো খাওয়ার আগে ওর মাকে আর আমাকে প্রণাম করে গেল, সকালে উঠে দেখি জয়ন্ত উধাও। সুতরাং পালিয়ে যাওয়া না বলে, এটাকে বেরিয়ে যাওয়া বলাই বোধহয় ঠিক হবে।'

'কতদিন হল এমনি বেরিয়ে যাচ্ছে?'

'তা অনেকদিন। ঢাকায় থাক্‌তেই প্রথম এ রোগের শুরু। গ্রামোফোন রেকর্ডে' নিমাই সন্ন্যাস'পালা শুনল দুপুরে, আর রাত্রে বেরিয়ে গেল। তখন ওর বয়স কত হবে, খুব জোর নয় কি দশ। সেই থেকে আজ অবধি অন্ততঃ বার আষ্টেক ও এমনিভাবে বিরিয়ে চলে গেছে।'

'ফিরে আসে কি নিজে থেকেই?'

'তেমন শক্তি কি ওর থাকে তখন যে, নিজে থেকে ফিরে আসবে? প্রায় প্রত্যেকবারই কোন সহৃদয় ভদ্রলোক কিংবা ভদ্রমহিলা পত্র পাঠিয়ে খবর দেন আমাদের কাছে। তখন ওর মা লোকজন, গাড়ী নিয়ে গিয়ে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। সে সময় জয়ন্তের অবস্থা দেখলে আমাদের বুক দুরু দুরু করে। অনাহারে, অনিদ্রায় শীর্ণ রুগ্ন হয়ে যায় ওর দেহ, মুখে কিন্তু হাসিটা মিলিয়ে যায় না তখনও,

মুহূর্ত্তের জন্যে নীরব হলেন ডিষ্ট্রিক্ট জজ। চোখে মুখে ফুটে উঠল এক অব্যক্ত বেদনার আভাস। পুনর্বার দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললেন—' আমার ঐ একমাত্র সন্তান মাষ্টারমশাই, কিন্তু মনে হচ্ছে, ওকে বোধহয় ঈশ্বর আমার কাছে পাঠিয়েছেন একটি প্রবলেম-চাইল্ড করেই।

ব্যথিত শুরে হেডমাষ্টার সমবেদনা জ্ঞাপন করলেন—'সত্যিই তো, ঐরকম একটা ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট এমনিভাবে নিজের শরীর স্বাস্থ্য নষ্ট করবে—এটা তো ভাবাই যায় না। এইটটি- ফাইভ পার্সেন্টি মার্ক পেয়ে ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে দেখলাম'।

'কেবল পড়াশুনায় ব্রিলিয়ান্ট নয়, মাষ্টারমশাই। গানে, আবৃত্তিতে, ছবি আঁকতে, সাঁতারে, ঘোড়া চাপাতেও ওর সমকক্ষ খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন ওর সমবয়সীদের মধ্যে।

'ঘোড়াতেও চাপে নাকি? ঘোড়া পায় কোথায়?'

আমার নিজেরই ঘোড়া আছে। রাইডিং- এ আমার খুব ঝোঁক। সহিসের সাহায্যে সেই ঘোড়ারই পিঠে চেপে চেপে জয়ন্তও ঘোড়া চড়া শিখে নিয়েছে। সেদিন লক্ষ্য করলাম, ঘোড়াকেও সম্পূর্ণ ওর বশে এনে ফেলেছে। এখন আবার ঝোঁক চেপেছে— গীটার শিখবে। জানার আর শেখার তৃষ্ণার শেষ নেই ওর।'

হেডমাষ্টার কিছুটা আপন মনেই যেন বলে উঠলেন— 'সত্যিই অসাধারণ!' এই বলে একটু থেমে, আবার বললেন—'কিন্তু, মিঃ মুখার্জি, কেন জয়ন্ত এমনভাবে হঠাৎ হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়— তার কারণ কি কিছু জানতে পেরেছেন? এটা নিশির ডাক নয় তো?'

হতাশার শুরে মুখার্জি জানালেন— ' নাঃ। কোন কারণই আবিষ্কার করতে

পারিনি আজও। প্রতিবার ওর প্রত্যাবর্ত্তনের পর, ওকে বুকের কাছে নিয়ে প্রশ্ন করেছি— এমনভাবে কেন বেরিয়ে যাও, বলো? কিসের অভাব তোমার, কী তোমার দুঃখ? শুনে, ও কেবল কাঁদে আর বলে—আমার তো কোন অভাব দুঃখ নেই, বাবা! তবু কেন যে চলে যাই, তা তো আমি জানিনে। যখন বেরিয়ে যাই, আমার জ্ঞানও থাকে না। জ্ঞান যখন ফিরে আসে, তখন দেখি আমি অনেক দূরে চলে এসেছি।'

হেডমাষ্টার অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন জয়ন্ত জনকের দিকে। তারপর অস্ফুটস্বরে বললেন—'আশ্চর্য্য! এমন ব্যাপার ঘটার কথা কখনো শুনি নি আমি এর আগে।'

মুখার্জি চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে হেডমাষ্টারের হাত চেপে ধরে অনুরোধ জানালেন— আমার এই অসাধারণ, অস্বাভাবিক পুত্রটিকে স্বাভাবিক জীবনের অধিকারী করে তুলতে, আপনি আমার সহায় হোন মাষ্টারমশাই। ওর জন্যে তিনজন টিউটরের আমার এখনই প্রয়োজন। যদিও আপনাকে কাল লিখেছিলাম একজনের কথা। একজন টিউটর ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল আর অঙ্ক শেখাবেন। অপর দুইজনের একজন পড়াবেন আরবী, আর একজন— সংস্কৃত।'

'এইটুকু ছেলেকে পণ্ডিত আর মৌলভী রেখে আরবী- সংস্কৃত শেখাতে চাচ্ছেন কেন বলুন তো? ম্যাট্রিকটা পাশ করার পর ও দুটো শেখালে ভাল হয় না?'

'আমি কি শেখাতে চাইছি, মাষ্টারমশাই? জয়ন্ত নিজেই জেদ ধরেছে এ দুটো ভাষা এখনই শিখবার সুযোগ করে দিতে হবে তাকে। সংস্কৃত শিখতে চায়— বাল্মিকীর রামায়ণ নিজে পড়ে বুঝবার জন্যে, আর অরবী শিখে পাঠ করতে চায় কোরাণশরীফ। কারুর তর্জমা ও বিশ্বাস করে না।'একটু থেমে পুনশ্চ জানতে চাইলেন ডিষ্ট্রিক্ট জজ,'বলুন,কথা দিলেন, এই তিনটি টিউটর ঠিক করে দেবেন তো আপনি।'

কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল বিষ্ণুপদবাবুর। এমন একটি আশ্চর্য্য প্রতিভার সন্ধান পেয়ে আনন্দ যে হচ্ছিল না তাঁর, তা নয়। স্কুলের মৌলভী সাহেব এবং পণ্ডিত মশাইকে না হয় আরবী আর সংস্কৃত পড়াবার দায়িত্ব দেবেন তিনি, কিন্তু অন্যান্য বিষয়গুলির দায়িত্ব দেবেন কোন টিউটরের হাতে? জয়ন্ত গতকাল যে কথাগুলো বলেছিল তাঁকে, তারই উল্লেখ করে তাঁর দ্বিধা জ্ঞাপন করলেন মুখার্জিকে। বললেন—'ও স্পষ্ট করে বলল আমায় কাল, যিনি রামায়ণ সবচেয়ে ভাল জানেন, আমাকে স্যার, পড়তে দেবেন তাঁরই কাছে। আপনার কাছে সব শোনার পর এটুকু বুঝতে পেরেছি, রামায়ণে ওর ঝোঁক ভয়ানক। সে ঝোঁককে

সামাল দিতে পারবেন, এমন টিউটর আমার স্কুলে তো আমি একটিও দেখি না।'

'যা বলেছেন। ওর সাংঘাতিক নেশার জিনিস হচ্ছে ঐ রামায়ণ। রামায়ণ পড়তে বসলে ওর আর খিদে তেষ্টা থাকে না।'

'কেন বলুন তো? কী পায় ও রাময়ণে?'

'তা ঠিক বলতে পারবো না। তবে, ও বলে, ঢাকায় পোগোজ স্কুলের সূর্য্য পণ্ডিত নাকি ওকে বলেছেন— বাল্মিকীর রামায়ণ পড়বি, প্রচীন এই মহান দেশের অনেক ঐতিহাসিক সত্য খুঁজে পাবি।'

এই সময় হঠাৎ কোথা থেকে দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল জয়ন্ত। ঢুকে একবার'বাবা' বলে ডেকেই থমকে থেমে গেল হেডমাষ্টারের মুখের দিকে চেয়ে। পরক্ষণেই প্রথমে হেডমাষ্টারকে,তারপর পিতাকে প্রণাম করলো চরণ স্পর্শ করে। শেষে বড় বড় চোখ করে বলল—'জানেন স্যার, টাউন স্কুলের যে পুকুরটা নতুন করে খোঁড়া হচ্ছে, সেখানে কাল অনেক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম আমি।'

সস্নেহে জয়ন্তের মাথায় হাত বুলিয়ে বিষ্ণুপদবাবু শুধালেন—কেন দাঁড়িয়েছিলে? মাটিকাটা দেখছিলে? বিস্ফারিত লোচনে উত্তেজিত কণ্ঠে জয়ন্ত উত্তর দিল, 'না, স্যার। আমি দেখছিলাম — পুকুর খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ যদি পাতাল বেরিয়ে পড়ে। রামায়ণের সেই পাতাল। যদি পাতালের অধিপতি নাগরাজ বাসুকীকে দেখতে পাই!' এই বলে, পিতার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সে শুধালো—' আচ্ছা, বাবা,পাতাল তো মাটির নীচে, না?

তিন

টিউটর নিযুক্ত হলেন তিনজন।

সকালে সাতটা থেকে আটটা সংস্কৃত পড়াবেন পণ্ডিত মশাই। আটটা থেকে ন'টা পড়াবেন আরবী—মৌলভী সামাদ সাহেব। আর সন্ধ্যায় আসবেন বিজয়বাবু অন্যান্য বিষয় পড়াতে।

কিন্তু চারদিন যেতে না যেতে মাষ্টারদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। ডিষ্ট্রিক্ট জজের বাড়ীতে ট্যুইশনি করার শ্লাঘা কর্পূরের মত উড়ে গেল সব মাষ্টারদের হৃদয় থেকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, কেবল প্রশ্ন। প্রশ্নের উত্তর দেবেন, না, সিলেবাসের পড়া পড়াবেন, এই চিন্তাতেই কন্টকিত হয়ে উঠলেন তাঁরা। এলোপাথারি যা-তা প্রশ্ন একবার সে ছাত্রই যদি করে যায় কেবল, স্কুলের পড়াটা কখন হবে?

বেচারী পণ্ডিতমশাই প্রথম দিন জানতে চেয়েছিলেন—'আচ্ছা, কুলীন বামুনের

ব্যাটা হয়ে তুমি মুসলমানদের ভাষা ঐ আরবী শিখতে যাচ্ছ কেন বলো তো?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো—'কোরাণ শরীফ পড়বো, পড়ে—নিজে তার মানে বুঝবো।'

'মানে বুঝে কি হবে? তোমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে? বেদ-বেদান্ত পড়ে রইল,উনি দৌড়ালেন কোরাণ পড়তে। ম্লেচ্ছদের ঐ কেতাবে আছেটা কি শুনি!'

'আপনি ম্লেচ্ছ বলছেন কেন স্যার। ঢাকায় মৌলভী সাহেব আমায় কোরাণের অনেক আয়েত শুনিয়েছেন—সেগুলো সবই আমাদের ধর্মগ্রন্থের বাণীর মতই চমৎকার। ঢাকার সূর্য্য পণ্ডিত বলেছিলেন— তুই কোরাণ পড়ার চেষ্টা করছিস্, খুব ভাল কাজ করছিস্। পৃথিবীর সব ধর্মই একই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মানুষের মঙ্গল করা। আমি তো কোরাণ পাঠের সুযোগ পাই নি। তুই পড়লে নিশ্চই দেখবি—সেখানেও মানুষের মঙ্গল করতেই বলা হয়েছে সকলকে।'

ক্রোধান্ধ পণ্ডিত দুই হাত নেড়ে ভেঙচি কেটে বলে উঠলেন—'তবে আর কি? ঢাকার পণ্ডিত বলেছে, অম্‌নি সেটা সত্যি হয়ে গেল আর কি! কোরাণ যে পড়লোই না, কোরাণে যে ভাল জিনিস আছে সে' টা সে জানল কেমন করে?' ঢাকায় মৌলভী সাহেব একটা আয়েত শুনিয়েছিলেন—বলেছিলেন—

'কান্নাল্লাহ মাহু শা'য়ন। অর্থাৎ,শুরুতে এক আল্লাহই ছিলেন, আল্লাহ থেকেই সব কিছু সৃষ্টি। এখন আপনিই বলুন স্যার, ঠিক এই একই কথা কি আমাদের শাস্ত্রও বলছে না? আমাদের শাস্ত্রও তো বলছে— সৃষ্টির আরম্ভে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন তাঁর থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি!' একটু কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন পণ্ডিত। তবু বললেন—'আমাদের শাস্ত্রে কি আছে, তা তুমি জানলে কেমন করে? তুমি কি পণ্ডিত বনেছো?'

'আজ্ঞে না,ও সূর্য্য পণ্ডিতের মুখ থেকে সব শুনেছি। আর, আমার মা'ও অনেক শাস্ত্র কথা প্রায়ই শোনান আমাকে।'

শুনে, মুখটা গোঁজ করে অনেকক্ষণ বসেছিলেন সেদিন পণ্ডিত মশাই।

মৌলভী সাহেবের অবস্থা তো আরও সঙ্গীন। তিনি হয়তো মনে মনে ভেবে নিয়েছিলেন যে, যে ছেলে ব্রাহ্মণ হয়েও আরবী শিখে কোরাণ পড়বার জন্যে এমন লাফালাফি করে, তার বাড়ীর সকলেই নিশ্চয় হিন্দুধর্মের ওপর বীতশ্রদ্ধ। তা ছাড়া এটা একটা ইংরেজ-ভাবাপন্ন জজের বাড়ী, এখানে নিশ্চয়ই ধর্মের প্রতি আনুগত্যের বাড়াবাড়ি ঘটে না কখনই। অতএব প্রথম দিনই তিনি অভ্যাসবশে

ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিতে উৎসাহ বোধ করলেন বালককে। বললেন—'ইসলাম হচ্ছে এ পৃথিবীর নবীনতম একটা ধর্ম। এ ধর্মের প্রতিটি কথা বিজ্ঞানসম্মত। তোমাকে সেই ধর্মের মূল গ্রন্থ কোরাণ-শরীফ পড়াবার উদ্যোগ নিয়ে ভালই করেছেন তোমার বাবা। কী আছে অনুদার, বিদ্বেষ ভাবাপন্ন,কুসংস্কারে ভরা ঐ হিন্দুধর্মের মধ্যে।'

প্রায় তৎক্ষনাৎ ফোঁস করে উঠল ছেলেটা—'হিন্দুধর্মকে আপনি অনুদার বিদ্বেষ ভাবাপন্ন বলছেন,স্যার?' বলে,মুহূর্তের জন্যে কি যেন ভেবে নিল সে। তার পর আবার প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা, স্যার, প্রভু যিশুকে যারা মানে না, তাদেরকে খৃষ্টানরা কি বলেন?'

'কেন হিদেন বলে'।

আর, যারা হজরত মোহম্মদের ধর্মের বিশ্বাসী নয়, তাদেরকে মুসলমানরা কি আখ্যা দিয়ে থাকেন।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণায় নাসিকা-পার্শ্ব কুঞ্চিত করে জবাব দিলেন মৌলভী সাহেব—'অবিশ্বাসীদের আমরা কাফের বলি।'

'কিন্তু যারা হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী নয় অথবা নাস্তিক, তাদের কাউকেই কিন্তু কোন হিন্দু হিদেন বা কাফের অথবা ঘৃণ্য বলে মনে করে না। সূর্য্য পণ্ডিত বলেছেন, আমাদের শাস্ত্র নাকি বলছে—'ভ্রাতরো মনুজাঃ সর্বে,স্বদেশো ভূবন ত্রয়ম্'। অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত মানুষ আমার ভাই, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল— আমার স্বদেশ। তবে? এটাকে কি আপনি অনুদারতা কিম্বা বিদ্বেষপরায়ণতা বলতে পারবেন কখোনো?'

ওদিকেবিজয়বাবুপড়েছেনরামায়ণেরপাল্লায়। ইংরেজী,বাংলা,অঙ্ক,ইতিহাস,ভূগোল সব মাথায় উঠল, পড়তে বসলেই কেবল রামায়ণের প্রশ্ন।

'আচ্ছা, স্যার, অহল্যার কাহিনী কি একেবারে বোগাস? ওর মধ্যে সত্য কি কোথাও নেই?' বিপন্ন বিজয়বাবু তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন—'আমি আর কি বলবো অহল্যা সম্বন্ধে? জগৎ বরণ্যে ইউরোপীয় মনীষী অহল্যাকে জ্যোতিষীরূপক বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আর, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অহল্যা-উপাখ্যানকে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক দক্ষিণ ভারতে কৃষি সভ্যতা বিস্তারের রূপক বলে বর্ণনা করেছেন।

ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে উঠল জয়ন্ত। দুই কর্ণমূলে রক্তিম আভা দেখা দিল তার। সে বলল—' পুরাণের সব কিছুকেই একটা রূপক বলে ঘোষণা করাটা আজকাল একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে, না মাষ্টারমশাই? কেউ বলছে শ্রীকৃষ্ণ নামে কেউ ছিলেনই না কোন দিন। কেউ বলছে কৃষ্ণার্জুন হচ্ছে পরমাত্মা আর জীবাত্মার প্রতীক। আবার একদল পণ্ডিত তো বলেই বসেছেন— সমস্ত রামায়ণটাই একটা জোতিষী রূপক ছাড়া আর কিছুই নয়! ওর মধ্যে ইতিহাসের ই-ও নেই

কোথাও'।

'আমার ধারণাও অনেকটা সেই রকমেরই।' বিজয়বাবু রামায়ণ চর্চ্চার পথ বন্ধ করার এই একটি মাত্র পথই খোলা দেখতে পেলেন। ভাবলেন—রামায়ণকে অনৈতিহাসিক বলে বিশ্বাস করাতে পারলে, ছেলেটি হয় তো আর রামায়ণ নিয়ে আলোচনায় উৎসাহ বোধ করবে না। "এই অহল্যার উপাখ্যানটাই ধরো না। রামায়ণ বলেছে— মহর্ষি গৌতম নাকি অহল্যার রূপ দেখে একেবারে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। যিনি মহর্ষি,তিনি নারীর রূপ দেখেই মূর্চ্ছা যাবেন, এও কি সম্ভব? তখন, ব্রহ্মা দয়াপরবশ হয়ে তাঁর কন্যা অহল্যাকে দান করলেন গৌতমকে। মহর্ষি একবার তপস্যা করতে আশ্রমের বাইরে গিয়েছিলেন। তখন আশ্রমের পড়ুয়া-ছাত্র ইন্দ্র গৌতম বেশে গুরুপত্নী হরণ করেন। ঋষি য়থাকালে আশ্রমে ফিরে এসে স্ত্রী শরীরে শৃংগার-লক্ষণ লক্ষ্য করে অহল্যাকে তার কারণ জিজ্ঞেসা করলেন। অহল্যা উত্তর দিলেন—'আপনি করিয়া-কর্ম দোশহ আমারে'। তখন ধ্যানবলে ছাত্রের কুকর্ম জানতে পারলেন মহর্ষি। তিনি ইন্দ্র ইন্দ্র বলে ডাকতে আরম্ভ করলেন, 'পুঁথি কাঁখে করিয়া আসিল পুরন্দর' ক্রুদ্ধ মহর্ষি তখন অভিশাপ দিলেন ইন্দ্রকে—'হউক সহস্র যোনি তোমার শরীরে' দুঃখে আর লজ্জায় ইন্দ্র বনবাসী হলেন। তাঁর সারা দেহে সহস্র যোনির আবির্ভাব ঘটল। এখন তুমিই বলো, একজনের অভিশাপে একটি মানুষের শরীর ভরে যাবে যোনিতে যোনিতে — এটা কি একটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার?"

'কখনোই বিশ্বাসযোগ্য নয়।' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ছেলেটা, 'কিন্তু স্যার, আপনি যে গোড়াতেই একটা ভুল করে বসে আছেন আপনি যা কিছু আমাকে শোনালেন, তার সবটাই আপনি বললেন কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে। রামায়ণের শ্রষ্টা তো আর কৃত্তিবাস নন, আদি- রামায়ণ রচনা করেছিলেন আদি কবি বাল্মিকী। তাঁর রামায়ণ একবার পড়ে দেখবেন— তাতে কিন্তু সহস্রযোনি টহস্রযোনি কিছু নেই।'

'নেই? তুমি বাল্মিকী রামায়ণ পড়েছো নাকি? কার কাছে পড়লে?'

"সূর্য্য পণ্ডিতের কাছে। কৃত্তিবাসতো নিজের কল্পনা দিয়ে রামায়ণ নামে একটা রূপকথা লিখেছেন। আর মহর্ষি বাল্মিকী লিখেছেন ইতিহাস। সেই ইতিহাস পড়ে দেখুন, বাল্মিকী কি বলেছেন অহল্যার উপাখ্যানে।"

বিজয়বাবু আকাশ থেকে পড়লেন বারো তেরো বছরের এই ছেলেটার মুখে অদ্ভুত এক কথা শুনে। যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ করতে শত শত বছর ধরে বাংলার ঘরে ঘরে, তাঁর লেখা রামায়ণকে এই একরত্তি ছেলেটা বলছে কিনা

রূপকথা? বিজয়বাবু প্রতিবাদ জানালেন, 'কী সব যা-তা বলছো মহাকবি কৃত্তিবাস সম্বন্ধে? নিজে পড়ে দেখেছো তুমি কৃত্তিবাসী রামায়ণ'?

'আমি ঐ রামায়ণের অনেক জায়গা মুখস্ত বলতে পারি,স্যার। অনেকবার পড়েছি ঐ রামায়ণ। যতবার পড়েছি ততবারই মনে হয়েছে— আমি বুঝি রূপকথার কোন গল্প পড়ছি।'

'কৃত্তিবাসের রামায়ণের তুমি রূপকথাটা পেলে কোথায়?'

একটু হাসল এবার জয়ন্ত। বলল, 'যে কৃত্তিবাস অপুত্রক রাজা দশরথের অন্তরেব 'দাহ' মেটাবার জন্যে তাঁকে সাড়ে সাতশো বার বিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হন নি, সীতার বিয়েতে বাংলা থেকে মিথিলায় আশীলক্ষ রাজাকে যিনি টেনে নিয়ে যেতে পেরেছেন, সগর-পত্নী যে চামড়ার লাউ প্রসব করলেন তার মধ্যে একটি কম ষাট হাজার ছেলেকে ঠেসে ভর্তি করেছেন যে বিনা দ্বিধায়, তিনিই যদি অহল্যাকে নিয়েও একটা চিত্তাকর্ষক রূপকথার সৃষ্টি করে থাকেন, তাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে, মাষ্টারমশাই?

'বাল্মিকী রামায়ণে তবে কি অন্যরকম কিছু আছে?'

'আছেই তো! বাল্মিকীর লেখা মূল রামায়ণের এসব কিছু খুঁজে পাবেন না। সেখানে অহল্যা কাহিনী সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে। কৃত্তিবাস ইন্দ্রকে বানিয়েছেন ঋষিরআশ্রমে 'পড়ুয়া ছাত্র', বাল্মিকী ইন্দ্রকে বলেছেন দেবরাজ। একবার মহর্ষি গৌতম ব্রতধারী হয়ে তপস্যায় গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্র গৌতম বেশে আশ্রমে এসে অহল্যাকে বললেন, তুমি ঋতুস্নাতা। আমি তোমার সঙ্গলাভ করবার জন্যে এসেছি কামার্তা অহল্যা মুনিবেশী ইন্দ্রকে চিনতে পেরেও তাঁর বাসনা চরিতার্থ করলেন। শেষে অহল্যা ইন্দ্রকে বললেন—হে সুরশ্রেষ্ঠ, তোমার সঙ্গলাভে আমি কৃতার্থ। তুমি এই মুহূর্তে এ স্থান ত্যাগ করো এবং আত্মরক্ষা করো। এই কথা শুনে ইন্দ্র আশ্রম থেকে নির্গত হবার উদ্যেগ করলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময় গৌতম এসে প্রবেশ করলেন আশ্রমে ছদ্মবেশী ইন্দ্রের দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—আমার রূপ অনুকরণ করে যে গর্হিত কাজ তুমি আজ করেছো, তার জন্যে অকর্তব্যমিদং তস্মাদ্ বিফলত্বং ভবিষ্যতি। অর্থাৎ,তুমি বিফলত্ব, মানে Impotency বা পুরুষত্বহীনতা প্রাপ্ত হবে। লক্ষ্য করে দেখুন স্যার, বাল্মিকী রামায়ণে মহর্ষি গৌতম কিন্তু সহস্র যোনিত্ব কথা উচ্চারণও করেন নি একবার। অবাক বিস্ময়ে জয়ন্তের দিকে চেয়ে থেকে কিছুক্ষণ, বিজয়বাবু প্রশ্ন করলেন—'এই যে Impotency বা পুরুষত্ব হীনতার কথা বললে এখনই, একথার মানে জানো?'

'ভালভাবে জানি না। তবে সূর্য্য পণ্ডিত বলেছেন—পুরুষত্ব বর্জিত মানুষ কখনো

পিতা হবার সুযোগ পায় না' 'এটাই কি খুব স্বাভাবিক বলতে চাও তুমি। একজন অভিশাপ দিল; অমনি অন্যজন Impotent হয়ে গেল?' আবার একটু হাসলো ছেলেটা। এমন সুরে কথা বলল এবার, যেন বিশ্বরহস্যের সব কিছুই তার জানা হয়ে গেছে ঢাকার কোন অখ্যাত ঐ সূর্য্য পণ্ডিতের কাছ থেকে। বল্ল, 'ইন্দ্রকে তো ক্লীবত্ব পেতে হবেই, স্যার। সূর্য্য পণ্ডিত বলেছেন, আধুনিক বিজ্ঞানও নাকি স্বীকার করে যে বর্ণবৃদ্ধা, বয়োবৃদ্ধা, গুরুপত্নী বা মাতৃস্থানীয়া কোন নারীর ওপর কেউ যদি কোন অনাচার করে, তবে তার আর রক্ষা নেই এই ক্লীবত্ব থেকে কারও ক্লীবত্ব কিছু বেশী,কারও বা কিছু কম। বিপ্রপত্নী হরণের মধ্যে দিয়ে যে জঘন্য অন্যায় ইন্দ্র করছিলেন, তার জন্য তাকে তো ফল ভোগ করতেই হবে। এবার তাকিয়ে দেখুন,কৃত্তিবাস কী বলছেন ইন্দ্র সম্পর্কে। ইন্দ্র অভিশাপ লাভ করে বনে চলে গেলেন লজ্জায়। পরে, ব্রহ্মার বরে ইন্দ্রের দেহের সহস্র জনি সহস্র চক্ষুতে পরিণত হল। এখানেও আর এক রূপকথা বাল্মিকী কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেছেন তাঁর মহাগ্রন্থে। তিনি বলেছেন—দেবরাজ ইন্দ্র অমরাবতীতে ফিরে গিয়ে অগ্নি প্রমুখ দেবতাদের কাছে নিজের দুর্দশার কথা নিবেদন করলেন। তখন ইন্দ্রের বিফলত্ব দূর করার জন্য অগ্নিদেব মেষ-বৃষণ-জাত অষুধের ব্যবস্থা করলেন। সূর্য্যপণ্ডিত বলেছেন—আজও নাকি আয়ুর্বের্বদ বিশারদবর্গ কোন রোগীর ক্লীবত্ব দূর করার জন্যে—ঐ মেষ-বৃষণ-জাত অষুধের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। অগ্নি দেবতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য; তিনি পুরোহিত, ঋত্বিক,বেদজ্ঞ। তিনি আয়ুর্বের্বদ-চর্চ্চা করে মেষ-বৃষণ প্রয়োগে ক্লীবত্বের প্রতিষেধক অষুধ আবিষ্কার কারেন, এতে তো অস্বাভাবিকতার কিছুই নেই।'

আশ্চর্য্য হওয়ারও একটা সীমা থাকে। সে সীমাও অতিক্রান্ত বিজয়বাবুর,জয়ন্তের রামায়ণ- অভিজ্ঞতার কথা শুনে। এইটুকু বয়সেই রামায়ণের সমস্ত ঘটনাকে এমন ভাবে বিশ্লেষণ করার অমননীয় ইচ্ছাই বা জাগলো কেমন করে?

'আচ্ছা, এই যে তুমি বললে 'ঋতুস্নাতা', এ শব্দের অর্থ জানো?' শিক্ষক প্রশ্ন করলেন। 'না, স্যার। এ শব্দের মানেটা জানতে চেয়েছিলাম সূর্য্য পণ্ডিতের কাছে উনি বলেছিলেন- বড় হ, এ শব্দের অর্থ তখন নিজে থেকেই জানতে পারবি। এখন কেবল শব্দটা মনে রাখ। আমি তাই রেখেছি।' উত্তর দিল ছাত্র।

'কিন্তু; বাল্মিকীর দোহাই দিয়ে না হয় সহস্রযোনির ব্যাপারটা আসলে কি হয়েছিল সেটা বুঝিয়ে দিলে, কিন্তু অভিশাপ দেওয়া মাত্র অহল্যা যে পাথরে পরিণত হলেন, এতবড় অস্বাভাবিক ঘটনার পক্ষে ওকালতি করবে তুমি কেমনভাবে?' 'ওটাও তো আর একটি রূপকথা, স্যার। কৃত্তিবাস ঠাকুরের তৈরী করা রূপকথা।

বাল্মিকী রামায়ণে তো অহল্যার পাষাণ হয়ে যাওয়ার কথা কোথাও নেই।'

'নেই?'

না, স্যার। বাল্মিকী লিখেছেন একেবারে অন্যকথা। রূপকথায় যেমন নাগরাজ বাসুকীর অনুচরের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে রাজকুমার নিমেষে প্রজাপতির আকার ধারণ করেন, কৃত্তিবাসের অহল্যা তেমনি অভিশাপে এক মুহূর্ত্তে পাষাণে পরিণত হন। এইবার শুনুন, স্যার, বাল্মিকী কি লিখেছেন অহল্যা সম্বন্ধে। ব্যভিচারিণী পত্নীকে মহর্ষি কঠোর শাস্তি দিলেন। অহল্যাকে বললেন, 'তুমি বায়ুভক্ষ্যা, নিরাহারা, তপস্যা-পরায়ণা, ভষ্মশায়িনী এবং জীবজগতের অদৃশ্যা হয়ে সুদীর্ঘকাল এই তপোবনে বাস করবে। দশরথ পুত্র রাম যখন তপোবনে আগমন করবেন, তুমি তখন তাঁর আতিথ্য করে লোভমোহাতীতা তপোবিশুদ্ধা হবে। সেই সময় আমি তোমাকে আবার পত্নীরূপে গ্রহণ করবো (বালকাণ্ড,৪৮ সর্গ, ৩২/৩৩) অহল্যাকে প্রায়শ্চিত্তে ব্রতী করিয়ে, মহর্ষি গৌতম মিথিলার আশ্রম ত্যাগ করে হিমালয়ে চলে গেলেন। তাঁর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রম জনহীন হয়ে গেল। সেই নির্জন প্রদেশে লোকচক্ষুর অন্তরালে একাকিনী ব্রতচারিণী অহল্যা তপস্যা-রতা হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। এখন আপনিই বলুন— অহল্যার উপাখ্যানে বাল্মিকী যা বলছেন, তাতে অস্বাভাবিকতার কিছু আছে কি?'

তা তো নেই। কিন্তু তারই সঙ্গে, এই জজ সাহেবের বাড়ীতে ট্যুইশনিটা যে খুব বেশী দিন চালাতে পারবেন বিজয়বাবু, সে ভরসাও তাঁর রইল না। সমস্ত সাবজেক্ট পড়ে থাকছে একধারে। দিনের পর দিন কেবল রামায়ণের খুঁটিনাটি প্রশ্নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন টাউন স্কুলের সবচেয়ে শান্ত, গম্ভীর এবং সৌম্য টিচারটি। আশ্চর্য্য! 'আমাদের ঋষিরা ব্যাভিচারিণী পত্নীকেও প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে আবার পত্নীরূপে সংসারে ফিরিয়ে আনতেন? কত উদার অন্তঃকরণের অধিকারী ছিলেন তাঁরা!

চার

পোষ্ট্যাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হরিহর গাঙ্গুলীর পত্নী মনোরমা দেবী জাজেস বাংলোর সাম্নেকার সুন্দর ফুল বাগানটায় বসে কথা বলছিলেন জজ গৃহিণী হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে। স্কুল জীবন থেকেই দুজনের বন্ধুত্ব। সেই বন্ধুত্বই গভীর থেকে গভীরতর হয়ে আজ প্রায় সহোদরার পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেছে। একই শহরে পোষ্টেডও ছিলেন দুজনের স্বামী দুই তিন জায়গায় এর আগে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। বই এর মত দেখতে রূপোর পানের কৌটো সামনের টী-পয়ের ওপর রাখা। বেতের কেদারায় পাশাপাশি দুজনে উপবিষ্ট। আগামীকাল কার্তিক পূর্ণিমা। আকাশে তাই জ্যোৎস্নার দাপাদাপি শুরু হয়েছে সন্ধ্যার পর থেকেই। চন্দ্রমল্লিকা,দোলনচাঁপা আর শিউলীর ঐকতানে আমোদিত চারিদিক।

কৌটো থেকে দুই খিলি পান বের করে,একটা সখিকে দিয়েঅপরটি হেমাঙ্গি নিজের মুখে ফেলতেই, দামী বারাণসী-জর্দ্দার খুস্‌বুতে ভরে গেল শিশির সিক্ত ভারী বাতাস।

অদূরে আলোকিত বৈঠকখানা ঘরে বসে বিজয়বাবুর কাছে পাঠরত জয়ন্তকে জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। সেইদিকে তাকিয়েই বসেছিলেন হেমাঙ্গিনী এবং মনোরমা। মনোরমা বললেন—'বুদ্ধির দীপ্তিতে জয়ের মুখখানা সব সময় যেন ঝলমল করে, না দিদি?'

'তা তো করে, কিন্তু ওর সব জিনিস জানবার যে দুরন্ত ইচ্ছা— তার ধাক্কা আমরা সামলাই কেমন করে?'

'শুনেছি প্রতিভা যাদের যত বেশী, চঞ্চলতাও তাদের ততই বেশী হয়। প্রতিভাধর তো বটেই, না হলে ক্লাসে ফার্ষ্ট হয় প্রত্যেকবার? গীটারে কী ভালো হাত। কবিতা- আবৃত্তি শুনলে ওর, মন ভরে যায়।'

'সবই তো ঠিক আছে, কিন্তু ওর খামখেয়ালীপনা? বার বার বাড়ী থেকে নিশুতি রাতে উঠে চলে যাওয়া? এগুলোর তাল সাম্‌লাতেই তো আমি আর ওর বাবা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। আমার অক্ষয় কাকার কথা মনে আছে?'

'আচ্ছা। যিনি খুব ভাল জ্যোতিষী ছিলেন তো? পাবনায়, তোমাদের গ্রামেই থাকতেন?'

'হ্যাঁ। তিনি জয়ের ভাগ্য গণনা করে চুপিচুপি একদিন বলেছিলেন— একমাত্র ছেলে তোমার হেমা, কিন্তু একে তো ঘরে ধরে রাখতে পারবে না বেশীদিন। ছিটকে ও বেরিয়ে যাবেই।' এই বলে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেমাঙ্গিনী বিষণ্ণ সুরে পুনশ্চ বললেন—' রাত দিন এখন আমার মাথায় এই একই চিন্তা চেপে বসেছে। রাত্তিরে উঠে যেমন চলে চলে যায়, যদি একদিন আর না ফেরে?'

চিন্তিত স্বরে মনোরমা আশ্বাস দিলেন—' মনে হয়, বয়স বাড়ার সঙ্গে এসব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু এমনভাবে বার বার খালি গায়ে খালি পায়ে বেরিয়েই বা যাবে কেন ও। কিসের দুঃখ ওর, কিসের অভাব? যখন যা করতে চায়, কোনটাতে কখনো তো বাধা দেন না ওর বাবা।'

'আমি কি বলি জানো দিদি, ছেলের তোমার বিয়ে দিয়ে দাও তাড়াতাড়ি। তুমি তো বলো, তোমার অক্ষয়কাকার গণনা কখনো ভুল হয় না। সেসব জেনেও আমি আমার একমাত্র মেয়ে অপর্ণাকে তোমার ঘরে পাঠাতে রাজী। জয়ন্ত-অপর্ণা দুজনকে শিশুবেলা থেকে দেখেছে,জেনেছে। তোমার ছেলের চেয়ে আমার মেয়ে তিন বছরের ছোট, মানাবে ও ভাল।'

'দেখি ভাই, বি-এটাত আগে পাশ করুক। ছেলের যা মতি-গতি, বিয়ে করতে রাজীই হবে কিনা কে জানে। তোমার মেয়ের মত সুন্দরী মেয়েকে ঘরের বৌ. করতে পারাটা তো একটা সৌভাগ্যের কথা।'

'তোমার ছেলেটিও তো একটি হীরের টুকরো,দিদি। উনি প্রায়ই বলেন, এতটুকু ছেলের এত জ্ঞানের পিপাসা, বড় হয়ে ও দশজনের একজন হবেই।'

পাশে রাখা ঢাকা দেওয়া পিকদানের ঢাকা সরিয়ে তাতে পানের পিক্ ফেলে হেমাঙ্গি-নী বললেন—'জয় বলে, প্রায়ই ও নাকি দেবেন মিত্রের ঐ পোড়ো বাড়ীটায় যায়। বিরাট বাগান এখন ঝোপঝাড়ে ভরে গেছে। সঙ্গে নিয়ে যায় তোমার মেয়েকে। আচ্ছা ভাই তোমার মেয়ে ভয় পায় না? সবাই তো বলে মিত্রের ঐ বাড়ীটায় ভূত আছে।'

একটু হাস্‌লেন মনোরমা। তারপর বললেন, 'জয় সঙ্গে থাকলে অপুর ভয় ডর কিছুই থাকে না।' এই পর্যন্ত বলে একবার থামলেন তিনি। কি যেন ভাবলেন একটু পরে বললেন, ' একটা কথা প্রায়ই তোমায় বলব বলে ভাবি দিদি। কিন্তু পাছে তোমার দুশ্চিন্তা বাড়ে ঐ ছেলেটাকে নিয়ে, তাই আর বলি নি।'

কি কথা বলো না। ও ছেলেকে নিয়ে সারা জীবনই ভাবতে হবে আমার, অক্ষয়কাকা তো সেই রকমই বলেছেন।'

'ঐ মিত্তিরদের পোড়ো বাড়ীটাতে একটা খুঁব পুরণো কূয়ো আছে। অপু বলে, তার ভেতরটা নাকি ভীষণ অন্ধকার। কূয়োর তল দেখা যায় না। কত যে গভীর, কেউ জানে না। ঐ কূয়োতে নাকি নামতে চায় তোমার ছেলে। ও নাকি বলে, ঐ কূয়োটা অতগভীর, ওর মধ্যে নামলে নিশ্চয়ই বাসুকীর রাজ্য পাতালকে দেখতে পাওয়া যাবে।'

বিষণ্ণ বদনে হেমাঙ্গিনী বললেন—'ঐটেই তো হয়েছে এখন এক নতুন ব্যাধি। রাত নেই, দিন নেই, কেবল পাতাল কোথায় পাতাল কোথায় করছে। বলে, রামায়ণের বানর রাজ সুগ্রীবের নির্দ্দেশে যখন বানর সৈন্যরা পাতাল রাজ্যে পৌছতে পেরেছে, তখন আমিই বা পারবো না কেন? যাকেই জিজ্ঞেসা করে পাতাল কোথায়? প্রত্যেকেই দেখিয়ে দেয় পায়ের নীচেকার মাটিটা। সেইজন্যে যেখানেই

কোনো পুকুর কাটা হয়, কুয়ো খোঁড়া হয়— সেখানেই ও গিয়ে খিদেতেষ্টা ভুলে ঘন্টার পর ঘন্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। কতবার জানতে চেয়েছি— কি লাভ হয় অমনভাবে দাঁড়িয়ে থেকে। ওর জবাব— পাতাল যখন মাটির নীচে, আর এরা যখন সেই মাটিকে খুঁড়ছে গভীর করে, তখন বলা যায়, কখন কোন গর্তের মধ্যে দিয়ে হয়তো পাতাল পুরীর দেখা পেয়ে যাবো। আবার আমায় প্রবোধ দেয়। বলে তুমি কোন চিন্তা কোরো না, মা। দেখবে, পাতালপুরীর খোঁজ একদিন আমি পাবোই।

পাঁচ

ফার্স্ট- টার্মিনাল, হাফইয়ারলি এবং অ্যানুয়াল পরীক্ষায় সে ফাষ্টই হল জয়ন্ত— পাতাল পাতাল করে মাতালের মত এত মাৎলামি করা সত্ত্বেও, সব বিষয়েই আশি'র উপর নম্বর পেয়ে। হেডমাষ্টার সব টিচারদের ডেকে ডেকে বললেন'এই-ষ্ট্যাণ্ডডের মেরিট আমি এর আগে কখনো দেখিনি। আমার ছেলে অমল, সেও তো ওই একই ক্লাসে পড়ে। এতদিন প্রতি পরীক্ষায় ইংলিশে ফাষ্ট হচ্ছিল সেভেন্টি পার্সেন্ট নম্বর পেয়ে। এবার জয়ন্ত ইংরেজীতে পেলো এইটটি সিক্স। অমলের চেয়ে ষোল নম্বর বেশী। একবার ভেবে দেখুন ছেলেটা কী ষ্টাণ্ডার্ডের। অথচ, আপনাদের সকলের কাছ থেকেই এই এক বছর ধরে কম্‌প্লেনই শুন্‌ছি জয়ন্তের বিরুদ্ধে—ও নাকি ক্লাসে পড়াতে দেয় না আপনাদের, কেবল প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে আপনাদের পিরিয়ডের সময় নষ্ট করে।' 'ও না হয় এক্সট্রা অর্ডিনারী মেরিটের ছেলে, ক্লাসে না পড়েও ও হয় তো পড়াশোনার প্রগ্রেস ঠিক রাখতে পারে। তা ছাড়া, ওর বাড়ীতে পড়াবার জন্যে তিনজন মাষ্টার রেখেছেন ওর বাবা। কিন্তু ক্লাসের সাধারণ ছেলেরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এর ফলে। ক্লাসে পড়াতেই যদি না পারলাম আমরা, তবে সিলেবাস শেষ করবো কেমন করে?' শ্রীচন্দ্রবাবু বললেন। তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিজয়বাবু, পণ্ডিতমশাই এবং মৌলভী সাহেব ঐকতানে বলে উঠলেন-'না, স্যার, বাড়ীতেও একেবারেই পড়তে চায় না। কেবল আবোল তাবোল প্রশ্ন করে। তবে ছেলেটা যে অসাধারণ বুদ্ধিমান—সেটা আমরা বুঝতে পারি ওর প্রশ্নগুলো শুনেই।'খুশীর হাসিতে মুখ ভরিয়ে হেডমাষ্টার জিজ্ঞেসা করলেন—কী ধরণের প্রশ্ন ও করে, দু'একটা বলুন তো?'

পণ্ডিতমশাই, মাথার টিকিতে বাঁধা ফুলটা ঠিক আছে কিনা একবার দেখে নিয়ে বেশ উত্তেজিত ভাবেই বলে উঠলেন—একদিন হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করলো—

আচ্ছা মাষ্টারমশাই আপনি কবীরকে বেশী বিশ্বাস করেন, না, তুলসীদাসকে? আমি বললাম— দুইজন প্রসিদ্ধ দুটি আলাদা আলাদা কারণে কবির প্রসিদ্ধ ভজনের জন্যে, আর,রামায়ণ লিখে প্রসিদ্ধ হয়েছেন তুলসীদাস। এঁদের একজনের সঙ্গে আর একজনের তুলনা করা কি ঠিক হবে। ও বলল না মাষ্টারমশাই—আমি তুলনা করছি না। আমি বলতে চাচ্ছি— ঐ দুজনের মধ্যে কার বলা কথা আপনি বেশী বিশ্বাস করেন? আমি শুধালাম— কোন কথা? জবাব শুনলাম—ঐ যে কবীর বলেছেন— নারী,চুরি আর মিথ্যা— এই তিনটিকে ত্যাগ করতে পারলেই ঈশ্বর লাভ হবে। আমি কিন্তু কবীরের কথা মানি না মাষ্টারমশাই। কেন নারীকে ত্যাগ করতে বলছেন কবীর? মাও কি নারী নন? মাকে কি শাস্ত্রে স্বর্গাদপি গরিয়সী বলে নি। আমি সন্ত তুলসীর কথাকেই বেশী মানি, তাই। তুলসী দাস বলেছেন অন্যকথা উনি নারীকে ত্যাগ করতে বলেন নি, বলেছেন সব নারীকে মায়ের মত দেখতে। বলেছেন,নারীতে মাতৃজ্ঞান এবং সত্যকথা— এই দুইটি অনুসরণ যে করবে, হরিকে সে পাবেই।'

মৌলভী সাহেব মাথার ফেজটা খুলে হাতে নিয়ে বললেন—'ইসলাম শাস্ত্রের কিছু কিছু ওর জানা আছে, স্বীকার করছি। বোধহয় ঢাকার মৌলভী সাহেবের কাছ থেকেই জেনেছে বা শিখেছে। কিন্তু সেদিন হঠাৎ যখন আমায় প্রশ্ন করে বসল, আচ্ছা, স্যার, হিন্দুধর্মকে যে বিদ্বেষভাবাপন্ন ভাবেন, তা আপনি কি জানেন— এই হিন্দুদেরই লেখা ভবিষ্যপুরাণে হজরত মোহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল সুস্পষ্টভাবে? ইচ্ছা করলে আপনি নিজেও পড়ে দেখতে পারেন। আমি তো একেবারে শূণ্য থেকে পড়লাম। আমার এত হিন্দু বন্ধু আছেন, কই, কারুর মুখ থেকে তো আমি এমন কথা শুনি নি কখনও? হিন্দুধর্মগ্রন্থে হজরত নবীর আবির্ভাবের পূর্বাভাস? এও কি হতে পারে কখনো? আমার চোখে বোধহয় আধশ্বাসের ছায়া লক্ষ্য করেই বুদ্ধিমান জয়ন্ত নিজের খাতার ওপর বাংলায় দুইটি লাইন লিখে দিল। পড়ে দেখলাম, বাংলা লিপিতে লিখেছে বটে, কিন্তু ভাষাটা সংস্কৃত। ও লিখেছে—'এতস্মিন্নন্তরে ম্লেচ্ছ আচার্যেন সমন্বিতঃ। মহামদ ইতি খ্যাতঃ শিষ্য সমন্বিতঃ'। আমায় আবার মানেও বুঝিয়ে দিল এই শ্লোকের। বলল এর মানে কি জানেন স্যার? এর মানে, ঠিক এই সময় 'মহামদ' নামে এক ব্যক্তি— যার বাস মরুস্থলে অর্থাৎ আরব দেশে—আপন সাঙ্গোপাঙ্গো- সহ আবির্ভূত হবেন।'

বিষ্ণুপদবাবু বিস্মিত হয়ে পণ্ডিতমশাইকে শুধালেন—'মৌলভী সাহেবের কাছে জয়ন্ত যা বলেছে, সেকথা কি সত্যি পণ্ডিতমশাই?'

'সত্যিই তো। ভবিষ্যপুরাণে এ শ্লোক তো আমি পড়েছি।' পণ্ডিতমশাই উত্তর দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। টিফিন পিরিয়ডে টিচার্স রুমে বসে কথাবার্তা বলছিলেন বিষ্ণুপদবাবু। স্কুলের প্রায় সমস্ত শিক্ষকই যে ক্লাস নাইনের ঐ কচি কিশোরটিকে একটু বেশী সমীহর চক্ষে দেখতে শুরু করেছেন আজকাল, সেটা বেশ বুঝতে পেরেই জয়ন্তকে নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন তিনি। তাঁর বড় আশা— জয়ন্ত এই টাউন স্কুল থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে স্কুলের সুখ্যাতি ছড়িয়ে দেবে আরও দিক্‌বিদিকে—হয় তো প্রথম দশজনের মধ্যে নিজের স্থান করে নিতে পারবে ও। নিত্যবাবু বলে উঠলেন,— আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই, স্যার, ওর জ্ঞানের পরিধি দেখে এমন অনেক বিষয় নিয়ে ছেলেটা প্রশ্ন করে যে বিষয় সম্বন্ধে হয়তো আমার কিছুই জানা নেই।'

ধর্মদাসবাবু হেসে বললেন, 'আমি তো একদিন জয়ন্তের কাছে বেশ জব্দই হয়ে গেছি, স্যার।'

'জব্দ? সেকি? কেমন করে?' হেডমাষ্টার জানতে চাইলেন। 'একদিন ক্লাসে গজনীর মামুদের ভারত লুণ্ঠন সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলে ফেলেছিলাম যে, গজনী-মামুদ, চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লং—এঁরা তিনজনই ছিলেন পরাক্রমশালী পররাজা ললুপ অত্যাচারী মুসলমান অধিপতি। এঁরা বার বার লুণ্ঠন করেছেন পররাজ্যের ধনরত্ন,বিধবস্ত করেছেন জনপদের পর জনপদ আর লাঞ্ছিত করেছেন সহস্র সহস্র নারীর মর্য্যাদা। আমার বলা শেষ না হতেই সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত প্রতিবাদ জানিয়েছিল—না স্যার। চেঙ্গিস্ খাঁ কখনই মুসলমান ছিলেন না। আপনি ঠিক বলছেন না। আমি তো অবাক। চেঙ্গিস্ খাঁ মুসলমান ছিলেন না— এমন কথা তো কেউ বলে না। জিজ্ঞেসা করলাম— কোন ইতিহাসে পেলে তুমি এ কথা? আমরা তো চেঙ্গিসকে মুসলমান বলেই জানি। জয়ন্ত বলল, আপনি যা জানেন, তা বোধহয় ঠিক নয়, স্যার। মুসলমান যে ছিলেন না সে প্রমাণ আমি পরে দিচ্ছি। তার আগে আপনার আর একটা ভুলের দিকেও আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। চেঙ্গিস খাঁকে আপনি কেবল পররাজ্য ললুপ, অত্যাচারী লুঠেরা বলে বর্ণনা করলেন একটু আগে। কিন্তু বাবার মুখে শুনেছি সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। বাবা এম,এ-তে ইতিহাসে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছিলেন, জানেন তো, স্যার! বাবা বলেন—চেঙ্গিস্ খাঁয়ের মত এত বড় সমর সংগঠক আর যোদ্ধা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় জন্মেছে কি না সন্দেহ, নেপোলিয়ন-হিটলার নিয়েছিলেন ট্রাক, আর্মার্ড কার, ওয়োপনকেরিয়ার, ট্রেন, মোটার, এয়রোপ্লেনের অঢেল সাহায্য, আর চেঙ্গিস্ খাঁ? তাঁর সময়ে এসবের একটিও তিনি পেয়েছিলেন কি কাজে লাগাবার জন্যে?

স্রেফ ঘোড়ার পিঠে চড়ে, তরবারির সাহায্যে তখনকার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র খারাশমিয়া এবং তখনকার রাশিয়ার অধিকাংশকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করে যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তিনি, তার তুলনা নেই। চীনের মত পরাক্রমশালী এবং সুসভ্য দেশকে নিজের পদানত করা, এক কথায় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শক্তিধর দেশকে নিজের অধীনে আনা— এ এক অতিমানবীয় ব্যাপার। একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক বলেছেন—Forging ahead in utter cold of higher Asia,a quarter million men endured handships that would have put a modern Division into hospital।

ওর বাবা, মনে হয়, ঠিকই বলেছেন-হেডমাষ্টারের আগ্রহ উত্তেজনার সীমানায় পৌঁছে গেছে প্রায়—তারপর?', হেডমাষ্টার কৌতুহলী কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'তারপর কী বলল জয়ন্ত চেঙ্গিস খাঁ সম্বন্ধে? ও কি প্রমাণ করতে পেরেছিল যে, চেঙ্গিস মুসলমান ছিলেন না?'

পেরেছিল বলেই তো মনে হয়। ও বলেছিল—মুসলমানদের প্রতি চেঙ্গিসখাঁর দুর্ব্যবহারই প্রমাণ করে, উনি মুসলমান ছিলেন না। এই যেমন ধরুন— মিথ্যে আজান দিয়ে, লুকিয়ে থাকা মুসলমানদের বের করে এনে কোতল করা, আইন করে পশু জবাই বন্ধ করা, বোখারায় ঘোড়ার পিঠে চেপে সোজা মস্‌জিদের মধ্যে ঢুকে পড়ে নগরবাসীর সামনে ঘোষণা করা—ঈশ্বর শুধু একস্থানে ঐ মক্কায় থাকেন না, ঈশ্বর বিরাজমান সর্ব্বত্র। এ সবই প্রমাণ করে চেঙ্গিস অমুসলমান ছিলেন। তবে চেঙ্গিস যে কখনই মুসলমান ছিলেন না, তার প্রধান প্রমাণ—পৃথিবীর সব প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিকই চেঙ্গিসকে কাফের আখ্যায় ভূষিত করেছেন তাঁদের রচিত ইতিহাসে।'

'ঐটুকু ছেলে,এমনই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ইতিহাসকে বিচার করে পড়ে— এটা যেন ভাবাই যায় না। বাবার কাছে যা শুনেছে তা যেন ওর কণ্ঠস্থ।' হেডমাষ্টার বললেন, 'অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আজকের এই ছোট্ট ছেলেটির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক অসীম শক্তিমান প্রতিভা, যে প্রতিভা আপনাদের সকলের স্নেহ আর সহানুভূতিতে পুষ্ট হয়ে একদিন বিরাট এক মহীরুহে পরিণত হবেই'

ধর্মদাসবাবু আবার বললেন— ' আমি প্রশ্ন করলাম, তবে চেঙ্গিস খাঁ কোন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন? জয়ন্ত তার উত্তরে বলল—চৈনিক আর উগুরবর্ণে লিখিত মঙ্গোল ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মঙ্গোলিয়ায় তিব্বতীয় বৌদ্ধ লামাদের ধর্মীয় প্রভাব বিশেষভাবে বিস্তারলাভ করেছিল যদিও, যদিও চেঙ্গিসের এক শ্যালক গ্রহণ করেছিলেন বৌদ্ধ-শ্রমণত্ব, তবু, চেঙ্গিস খাঁ স্বয়ং বৌদ্ধ ছিলেন না। মনে হয়, তিনি কোন বিশেষ ধর্মীয় মত বা পথকে অনুসরণ

করতেন না। তবে তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন।'

হেডমাষ্টারের ওষ্ঠাগ্রে আবার দেখা দিল স্নেহস্নিগ্ধ হাসির আভাস। তিনি বললন—'একবার ভেবে দেখুন তো, আমরা বুড়ো হতে চল্‌লাম,আমাদের অধিকাংশেরই কিন্তু ধারণা—চেঙ্গিস মুসলমান ছিলেন। আর,এই বাচ্চা ছেলেটা তার বাবার কাছ থেকে সাগ্রহে চেঙ্গিসের ইতিহাস সংগ্রহ করে— আমাদের সকলের সেই ভুল ভেঙ্গে দিল আজ।'

জয়ন্তের অন্যতম প্রাইভেট টিউটর বিজয়বাবু মানুষটি স্বভাবতঃ স্বল্পবাক্য,শান্ত এবং গম্ভীর। এতক্ষণ তিনি নিরবেই হেডমাষ্টারের পাশের চেয়ারটিতে বসে আলোচনা শুন্‌ছিলেন সবার, হেডমাষ্টারের কথা শেষ হতেই এবার তিনি বলে উঠলেন—'আপনি ঠিকই বলেছেন, ওর বাবার কাছ থেকে ও সারা পৃথিবীর সতিহাস ভুগোলের কত কিছু যে জেনে ফেলেছে এরই মধ্যে, তার হিসেব পাওয়াও কঠিন। একদিন মিশরের পিরামিড এবং মমি (Mummy)-র বিষয়ে বুঝাচ্ছিলাম জয়ন্তকে। লক্ষ্য করলাম,ঘাড় নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা কেবলি মুচকি হাসছে। জিজ্ঞেসা করলাম—ফারাওদের মমির কথা শুনলে তোমার হাসি পায়? ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো, না স্যার। ফারাওদের মধ্যে তুতেন খামেন্ আর তার স্ত্রী অত অল্প বয়সে মারা গিয়েছিল বলে,ওদের কথা ভাবতে কষ্টই হয় আমার মনে। আমি হাস্‌ছিলাম অন্য কারণে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল কিনা—বেড়ালের মমির কথা। আমি জিজ্ঞেসা করলাম—সে কি কথা? বেড়ালের মমির খবর আবার তুমি পেলে কোথা থেকে? ও বলল—আপনি জানেন না স্যার? কেবল বেড়ালের কেন, অনেক পশুপক্ষীরই মমি খুঁজে পাওয়া গেছে মিশরে। মিশরের বুবাস্তিতে বেড়ালদের সমাধিক্ষেত্রে অনেক মমি পাওয়া গেছে বিড়ালের। প্রাচীনকালে মিশরী দেবতা নুট-এর বাহন ছিল কিনা বেড়াল! বলতে লজ্জা নেই, বেড়ালের মামিও যে আবার হয়,একথা আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজানা।'এই বলে মুহূর্তের জন্যে নীরব হলেন বিজয়বাবু। তারপর আবার বললেন—'কিন্তু,আমার সবচেয়ে মুস্কিল হয়েছে ঐ রামায়ণ নিয়ে। আমি সাধারণভাবে বাংলা রামায়ণ পড়েছি কৃত্তিবাসের,ও পড়ে বসে আছে কৃত্তিবাস,বাল্মিকী আর সন্ত তুলসীদাসের রামায়ণ। তাও সে পড়েনি তো কেবল,লাইন ধরে ধরে অর্থ বুঝে বুঝে,ব্যাখা বুঝে নিয়ে পড়েছে। বাল্মিকীর রামায়ণের মধ্যে ও অনেক ঐতিহাসিক সত্য নাকি খুঁজে পেয়েছে, আরও খুঁজছে। ওর বাবা ওকে বলেছেন, যদি রামায়ণ পড়তে পড়তে কোথাও কোন সংশয়ের মধ্যে পড়ে যাও, মনে রেখো,সে সংশয়ের সমাধান নিশ্চয় তুমি খুঁজে পাবে ঐ রামায়ণের মধ্যেই। একথাটা ও বেদ বাক্য বলে গ্রহণ করেছে। এখন ওর প্রধান

সংশয়—পাতালপুরী। যে কোন বিদ্বান বা পণ্ডিত মানুষকে পেলেই ওর জিজ্ঞাসা—রামায়ণে যে পাতালের কথা বলা হয়েছে বারবার, সেই পাতালটা কোথায়? কেমনভাবে যাওয়া যায় সেখানে? সকলের কাছ থেকে ও একই উত্তর পায়-সবাই পাতাল নির্দ্দেশ করে পায়ের তলায় মাটিকে দেখিয়ে। ঐ মাটির নীচেই আছে নাকি পাতালপুরী। জয়ন্তও সেই কারণে যেখানে যখন গভীর গর্ত, কূয়ো বা সুড়ঙ্গ দেখবে, সেখানে তখনই গিয়ে ঢুকে পড়বে কিছু না ভেবেই। ওর ধারণা—গভীর গর্ত বা কূয়োতে নেমে গেলেই হয়তো পাতাল দর্শন সে পেয়ে যাবে একদিন। আমি ওকে কত ভয় দেখিয়েছি—কূয়োতে গর্তে অনেক সময় সাপখোপ থাকে। পুরণো সুরঙ্গে ডাকাত বা দুষ্টু লোকদের আড্ডা দেখতে পাওয়া যায়,একা একা অমনভাবে ওসব জায়গায় ঢুকে যাওয়া ঠিক নয়। ও হেসে বলে—পাতাল তো নাগরাজ বাসুকীর রাজত্ব, স্যার। নাগ মানেই তো সাপ। তাই পাতালে যাওয়ার পথে সাপ না পাওয়া গেলে সেটাই তো একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হবে। আর চোর-ডাকাত? ওদেরকে আমি একটুও ভয় পাই না। আমার কাছে টাকা পয়সা নেই, কোন দামী জিনিস নেই, ওরা আমায় কি করবে?' আবার মুহূর্তের জন্য কথা বন্ধ করে কি যেন ভাবলেন বিজয়বাবু। তারপর কুঞ্চিত কপালে তিনি গাঢ় স্বরে বললেন—'আমার বড় ভয় হয়। এমন একটা প্রতিভা—কবে কোন কূয়োর মধ্যে হয়তো পুরণো পচা বিষাক্ত জলে ডুবে, অথবা কোন দীর্ঘকালের অব্যবহৃত সুড়ঙ্গে বিষধর সাপের কামড়ে শেষ হয়ে যাবে আমরা জানতেও পারবো না।'

বিজয়বাবু নীরব হতেই টিচার্স রুমে একটা অদ্ভুৎ নিস্তব্ধতা থম্ থম্ করতে লাগল। কারুর মুখে কোন কথা নেই। হেডমাষ্টার সম্পূর্ণ অকারণেই নিজের গলার টাইটা টেনে টেনে আল্গা করতে লাগলেন বারবার।

এই সময়, স্কুলের পিওন এসে ঘরে ঢুকে হেডমাষ্টারকে জানালো যে,জজ সাহেবের একটা চিঠি নিয়ে একজন আর্দলী এসেছে হেডমাষ্টারের সঙ্গে দেখা করতে। হেডমাষ্টার আদেশ দিলেন—ঐ আর্দালীকে এই ঘরে পাঠিয়ে দিতে। পিওন বেরিয়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে এসে টিচার্স রুমে প্রবেশ করলো সাদা চাপকান আর সাদা পায়জামা পরিহিত, মাথায় পাগড়ী এবং কাঁধে চারপাশ শোভিত জজ সাহেবের আর্দলী, ভয়ঙ্কর উত্তেজিত তার চোখমুখ। কম্পিত হস্তে চিঠিখানা হেডমাষ্টারের হাতে তুলে দিয়ে, কাঁদো কাঁদো স্বরে আর্দলী বলল—'আপনাকে এখনি একবার জজ সাহেব হাসপাতালে যেতে বলেছেন—মাষ্টার সাহেব।'

কি ব্যাপার তার কোন কিছুই বুঝতে না পেরে—হেডমাষ্টার ব্যস্ত হাতে খাম

খুলে চিঠিটি বের করে তাতে চোখ দিয়েই প্রায় আর্ত্তনাদ করে উঠলেন, 'কী সবর্বনাশ!'

স্তম্ভিত কক্ষের মধ্যে একমাত্র বিজয় বাবুরই কণ্ঠ শোনা গেল—'কি হয়েছে,স্যার!'

'জজ সাহেব লিখেছেন—জয়ন্তের জীবনের অন্তিম মুহূর্ত মনেহয়,ঘনিয়ে আসছে। অক্সিজেন চলছে। যখনই জ্ঞান হচ্ছে—মাষ্টার মশাইদের নাম উচ্চারণ করে কীসব বীড় বীড় করছে। কী যে করবো ভেবে পাচ্ছি না। যদি পারেন,দয়া করে পত্রপাঠ হাসপাতালে এসে একবার মুমূর্ষুর পাশে যদি দাঁড়ান, মনে শান্তি পাবো। আমার একমাত্র সন্তান আজ এমনইভাবে অকালে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, এ আমি কল্পনাও করিনি কোনদিন। মনে হচ্ছে, ও বোধ হয় মাষ্টারমশাইদের একবার দেখতে চাচ্ছে। আপনারা কি একবার শেষ দেখা দিতে আসতে পারবেন না?'

বিজয়বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে বলে উঠলেন—'বলেছেন কি জজসাহেব? জয়ন্ত মারা যাচ্ছে, আর আমরা যাবো না তাকে দেখতে?'

হেডমাষ্টারের সঙ্গে পণ্ডিতমশাই মৌলভী এবং বিজয়বাবুও তড়িৎ পদে গিয়ে উঠে বসলেন ডিষ্ট্রিকক্টজাজ প্রেরিত গাড়ীটিতে।

অ্যাসিষ্টান্ট হেডমাষ্টার নিরঞ্জনবাবু গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে এক হাত তুলে হেডমাষ্টারকে অভয় দিলেন—'এদিকের জন্যে কোন চিন্তা করবেন না,স্যার। এদিকটা আমি সামলাবো।'

ছয়

বিরাট দিঘীর তীরবর্তী হাসপাতালের দোতলার কেবিনটায় শুয়ে,শহরের যত বড় বড় গভর্ণমেন্ট অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন ভীড় করে—ডিষ্ট্রীক্টজজকে ঘিরে। নানা জনের নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন ডিষ্ট্রিক্টজজ সূর্য্যকান্তবাবু। শান্ত চোখ মুখ। কোথাও কোন দুশ্চিন্তার ছায়া কনেই। ওর এই অদ্ভুৎ ধৈর্য আর ঈশ্বর বিশ্বাস দেখে সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করছিলেন। ইংরেজ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ভাঙা বাংলায় শুধালেন—'টুমার ঐ একটি মাট্র পুট্র Is dying,আর টুমি এটো শাণ্টোভাবে কথা কহিটেছো? একটুও Shaky বোট করিটেছো না?' একটু হেসে সূর্য্যকান্ত বললেন—'শোক করে লাভ কি হবে বলুন। যিনি জয়ন্তকে ওর মাকেয়র কোলে পাঠিয়েছেন, তিনি যদি ওকে রক্ষা না করেন, আর কি কারও কিছু করার থাকে তাহলে? ঈশ্বর যদি জয়ন্তকে দিয়ে ভবিষ্যতে কোন কাজ করিয়ে নিতে চান, তবে তিনি তাকে

নিশ্চয় বাঁচিয়ে তুলবেন। আর, সে প্রয়োজন যদি ঈশ্বরের না থাকে, শত চেষ্টা করলেও আমরা জয়ন্তকে ধরে রাখতে পারবো না। শিরদাঁড়ায় চোট লেগেছে, মাথার খুলিতে চিড় দেখা গেছে, বিষাক্ত গ্যাসে ফুসফুস জখম হয়েছে,— মাঝে মাঝেই জ্ঞান হারাচ্ছে, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে বেশ। ডাক্তাররা বলছেন—আটচল্লিশ ঘন্টা পার না হওয়া পর্যন্ত কোন আশ্বাস দেওয়া সম্ভব নয় তাদের পক্ষে। কিন্তু আমি এসব কথার কোনটাই ভাবছি না একবারও। আমি ভাবছি—এখনও হেডমাষ্টারমশাই এলেন না কেন? তাঁকে আনতে গাড়ী পাঠিয়েছি অনেকক্ষণ! তবে কি তিনি আসতে পারবেন না? এদিকে, সজ্ঞানে যখনই থাকছে, জয়ন্ত কেবলই বলছে— আমি হেডমাষ্টারমশাইকে একবার দেখবো। যদি সত্যই হেডমাষ্টার না আসেন, ছেলেটাকে আমি প্রবোধ দেবো কি বলে?'

'ঈশ্বরে টুমার এটো গভীর বিশোয়াস?' ম্যাজিষ্ট্রে শুধালেন। সূর্য্যকান্তবাবুর ঠোঁটে একটু প্রত্যয়দীপ্ত হাসির রেখা ফুটে উঠল এবার মনে হল। তিনি বললেন— 'এসব ক্ষেত্রে মানুষ অসহায়,মিঃ লেদ্‌ব্রিজ! ঈশ্বরে বিশ্বাস না রাখলে, মনেরজোর যে হারিয়ে ফেলবো! জয়ন্তের চিকিৎসা-সেবায় মন দেবো কেমন করে?'

দেখা গেল, কাঠের চওড়া সিঁড়ির ওপর দিয়ে প্রায় দৌড়ে উঠে আসছে আর্দালী দুলাল বর্মণ। হাঁপাতে হাঁপাতে সে জানালো হেডমাষ্টার সাহেব এসে গেছেন।

সূর্য্যকান্ত প্রশান্ত বদনে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন মাষ্টারমশাইদের। হেডমাষ্টারকে বললেন—'আপনি এলেন, মনটা আমার শান্ত হল মাষ্টারমশাই।' জজসাহেবের দুশ্চিন্তার গ্লানিবিহীন মুখের দিকে চেয়ে প্রথমেই বেশ বিস্মিত হয়েছিলেন বিষ্ণুপদবাবু। মমূর্ষু পুত্রের পিতার সাম্নে এত প্রশান্তি আসে কোথা থেকে। এখন সেই জজসাহেবই আবার যখন বললেন—হেডমাষ্টার আসায় মনটা তাঁর শান্ত হল, তখন হেডমাষ্টার না বলে পারলেন না যে, জজসাহেবকে একটুও বিচলিত বা শঙ্কাচ্ছন্ন বলে মনে হয় নি, তাঁর আজকের প্রথম দর্শনেই। সুতরাং নতুন করে তিনি আর কী শান্ত হবেন।

একটু হেসে জজ বললেন—'আমার মনের শান্তিকে আমি নষ্ট হতে দিই নি মাষ্টারমশাই, ঘরে ঢুকে দেখুন ওর মা চোখের জলে ভাসছেন, পোষ্ট্যাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট-এর স্ত্রী-কন্যা হাহাকার করছেন। এই সময় আমিও যদি ভেঙ্গে পড়ি, জয়কে বাঁচাবার চেষ্টা করবো কেমন করে? জয়তো আমার কাছে কেবল জয় নয়, ও আমার বাঁচার আনন্দ, আমার Joe de viver!'

বিজয়বাবু লক্ষ্য করলেন, হাসি মুখেই কথা বলছেন বটে জজ সাহেব, কিন্তু শেষের কথাগুলো বলতে গিয়ে কেমন যেন কেঁপে কেঁপে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বর।

চার মাষ্টারকে নিয়ে সূর্য্যকান্ত সাদা ঝুলন্ত পর্দাটা সরিয়ে কেবিনে প্রবেশ করতে হেমাঙ্গিনী উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনকে সংযত করতে দুই হাত দিয়ে নিজের মুখকে নিজেই চেপে ধরলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে চার শিক্ষকই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, রোগীর মাথার কাছে। কিছুক্ষণ পরে, হঠাৎ একবার চোখ মেলে চাইল জয়ন্ত, হেডমাষ্টার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। সামনে হেড্‌মাষ্টারকে দেখে, জড়িয়ে জড়িয়ে বলে উঠল সে, 'অত গভীর কূয়োর মধ্যে ঢুকেও পাতাল দেখতে পেলাম না,স্যার।' বলেই আবার চোখ বন্ধ করে শ্বাসকষ্টের সঙ্গে সঙ্গে উঁ-উঁ করে কোঁকাতে লাগল। আবার নীরবতা নেমে এলো নাতি-প্রশস্ত কেবিনটায়। অপর্ণারি বেড-এ মুখ গুঁজে দিয়ে কাঁদছিল। হঠাৎ মুখ তুলে সে বলল-'আমি এত মানা করলাম কূয়োতে নামতে, কিছুতেই শুনলো না আমার কথা।' বলতে বলতে সে একটু জোরে কেঁদে উঠতেই, হেডমাষ্টার তার হাত ধরে তাকে কেবিনের বাইরে নিয়ে গেলেন শান্ত করতে। লম্বা বারান্দার এক কোণে গিয়ে তিনি বললেন, 'ছি মা,মরন্ত রোগীর ঘরে কি এত জোরে কাঁদতে আছে?' 'ও বাঁচবে তো মাষ্টারমশাই?'

'চিন্তা করছো কেন? জজ সাহেব স্বয়ং উপস্থিত থেকে জয়ন্তের চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করছেন। ডাক্তাররা তাঁদের চেষ্টার কোন ত্রুটী রাখছেন না। আমরা সবাই তো আশা করছি জয়ন্ত ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠবে।'

দুই চোখে আশার ঝিলিক দেখা দিল অর্পণার। কান্না থামিয়ে হেডমাষ্টারকে প্রণাম করলো সে পায়ে হাত দিয়ে বলল—'আপনি যখন বলছেন,জয়দা তখন নিশ্চয় আবার সুস্থ হয়ে উঠবে, আমি বিশ্বাস করি। আপনাকে জয়দা কত বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা করে, তা তো জয়দার মুখেই শুনেছি। জয়দা বলে, আপনি মস্ত পণ্ডিত মানুষ,অনেকের চেয়ে অনেক বেশী জানেন, কিন্তু আপনার প্রকাশ নেই। আপনি নিজের প্রচার চান না একেবারেই।'

হাসতে গিয়ে চোখে জল এসে গেল প্রবীণ স্কুল শিক্ষকের। ধরা গলায় বললেন—'ঐটুকু ছেলে,আবার এসব কথাও বলে নাকি?'

'হ্যাঁ মাষ্টারমশাই,বলে। ঢাকার সূর্য্য পণ্ডিতের কথা বলতে গেলে তো ওর জ্ঞানই থাকে ন। কিন্তু মুশকিল কি জানেন,বড় একগুঁয়ে, বড় জেদী। যেটা করবে ভাববে, সেটা ও করবেই, কারুর মানা শুনবে না। ওর মা, আমার মা, আমি— কতবার বারণ করেছি ওকে যেখানে সেখানে কূয়োর গর্ত্তে ঢুকে পাতালের খোঁজ করতে, কে শুনছে আমাদের কথা? সেই শেষ পর্য্যন্ত হল তো সর্বনাশ? এখন তো নাকে অক্সিজেনের পাইপ ঢুকিয়েও নিঃশ্বাস নিতে পারছে না ভালো করে!'

'বলতে বলতে বালিকা কণ্ঠ আবার অশ্রুবাষ্পে রুদ্ধ হয়ে এলো।' হেডমাষ্টার

শুধালেন—'কোথাকার কূয়োতে নেমেছিল ও?' 'দেবেন মিত্তিদের বাগানের অনেক পুরণো ভাঙ্গা ভাঙ্গা একটা ইঁদারা আছে। উঁকি দিয়ে কত চেষ্টা করেছি জল দেখতে কতবার, একটুও জল দেখতে পাইনি। সেটা যে কত গভীর তাও বোঝা যায় না। যতদূর দেখা যায়, কেবল অন্ধকার। জয়দা আজ সকালে নেমেছিল সেই কূয়োতে। আমায় গতকালই বলে রেখেছিল মিত্তিদের বাগানে যাওয়ার কথা। আমি বলেছিলাম আমিও যাবো।'

'কেমন করে নামলো ঐ পুরণো ভাঙ্গা কূয়োতে?'

'দুটো নারকেল-দড়ি একসঙ্গে নিয়ে, কূয়োর পাশের একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে,লম্বা দড়ির আর এক দিকটা নিজের কোমরে জড়িয়ে বেশ শক্ত করে গিট দিয়েছিল। বারবার মানা করলাম আমি নামতে। বললাম, তোমাদের পিওন আশুদাকে ডেকে আনি, তারপর নেমো। ও বলল,পাগল হয়েছিস, বাড়ীর কাউকে জানালে আর আমার পাতাল দেখা হয়েছে। তুই এখানে দাঁড়া। যদি দেখিস আমার উঠতে দেরী হচ্ছে, বুঝবি আমি পাতাল পেয়ে গেছি তাই দেরী হচ্ছে। তুই তখন একাই বাড়ীতে ফিরে যাবি। আমর কাজ শেষ হলে, আমি আবার এই দড়ি ধরে ঠিক উঠে আসবো।'

হেডমাষ্টার এত দুঃখের মধ্যেও একটু হাসলেন। এত বুদ্ধিমান ছেলে,অথচ বয়সের দোষে মনে মনে শিশুর মত স্বপ্ন দ্যাখে জয়ন্ত। কোমরে দড়ি বেঁধে কূয়োর মধ্যে দিয়ে পৌঁছাতে চায় পাতালে।

'তারপর কি হল জানেন মাষ্টারমশাই?' উত্তেজিত অপর্ণা বলে চলল,'দড়িটা দুই হাতে চেপে ধরে, ইদারার দুই দিকের গায়ে দুই পা রেখে, আস্তে আস্তে নামতে শুরু করলো সে। নাম্তে নাম্তে বলল, মহাবীর হনুমানের নাম কর,দেখবি কোন বিপদ হবে না। এই কথা বলার পর সবে আরও দুই এক পা নেমেছে,ঝপাৎ করে একটা শব্দ হল কূয়োর মধ্যে। ঝুঁকে পড়ে দেখতে চেষ্টা করলাম জয়দাকে,নীচের অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। কিছুক্ষণ পরে,অন্ধকারে ভেতর থেকে ক্ষীণ স্বর শুনতে পেলাম, অপু আমি পড়ে গেছি পা পিছলে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

বলতে বলতে মেয়েটার দুই চোখ আবার জলে ভরে উঠল। 'তারপর?' হেডমাষ্টার শুধালেন।

'তারপর আমি কি করবো ভেবে না পেয়ে, ওকে ঐ অবস্থাতেই ফেলে রেখে—ছুটে ফিরে গিয়ে এই খবর দিয়েছিলাম ওর মায়ের কাছে।'

'খুব ভাল করেছিলে, খুব বুদ্ধিমতীর কাজ করেছিলে। তুমি খবর দিয়েছিলে বলেই জয়ন্তকে জীবিত অবস্থায় তুলে আনা সম্ভব হয়েছে।'

'দমকলের লোক মুখে মুখোস লাগিয়ে কূয়োয় নেমেছিল। তারা ওকে ওপরে তুলে এনে বলল, কূয়োর ভেতরে বিষাক্ত গ্যাস আছে। তারই ফলে জয়দার নিঃশ্বাসে এত কষ্ট হচ্ছিল। যখন ওপরে উঠিয়ে আনল— তখন কথা বলার শক্তিও ওর ছিল না, একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য।

রূপের ডালি এই ছোট্ট দশ বছরের মেয়েটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল বিষ্ণুপদবাবুর হৃদয়। ভাগ্যে মেয়েটি হতবুদ্ধি না হয়ে গিয়ে, যথাসময় সংবাদটি পৌঁছে দিয়েছিল জজ সাহেবের বাংলোয়, না হলে, জয়ন্তের কপালে কী হতো কে জানে আজ।

দেখা গেল,ডিষ্ট্রিক্টজাজ সূর্য্যকান্তবাবু এদের দেখতে পেয়ে আসতে আসতে এই দিকেই আসছেন। কাছে এসে, অপর্ণার মাথায় হাত রেখে হেডমাষ্টারকে বললেন,আমার এই মা'টিকে একটু বুঝিয়ে শান্ত করে দিন তো মাষ্টারমশাই। সারাদিন কিছু খায় নি, কেবল কান্নাকাটি করছে।'

অপর্ণা চোখ তুলে তাকালো। বলল, 'আর আমি কাঁদবো না মেসোমশাই। মাষ্টারমশাই যখন বলেছেন জয়দা ধীরে ধীরে ভলো হয়ে উঠবে, তখন আর আমার ভাবনা কি? দেখবেন জয়দার নিশ্চয়ই আর কোন বিপদ হবে না।'

'ডাক্তার কি বলছেন, মিঃ মুখার্জী?' হেডমাষ্টারমশাই জানতে চাইলেন।

আটচল্লিশ ঘন্টা না গেলে ওঁরা নিশ্চিত ভরসা কিছু দিতে পারছেন না। বিষাক্ত গ্যাসে ফুসফুস জখম হয়েছে, স্পাইনাল কর্ডে চোট লেগেছে, সন্দেহ করছেন— মাথার খুলিতে চিড়ও ধরেছে। অক্সিজেন চলবে এখন সারারাত। ইন্‌জেকশন ওষুধ সব চলছে। কলকাতা থেকে দুজন স্পেশ্যালিষ্ট এসে পৌঁছবেন কাল সকালে। কিন্তু ততক্ষণ পর্য্যন্ত জয়ন্ত কেমন থাকবে, সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।'

সাত

পুরো দু'সপ্তাহ হাসপাতালে থাকার পর বাড়ী ফিরবার অনুমতি দিলেন ডাক্তারা জয়ন্তকে। যেদিন বাড়ীতে ফিরলো, সেই রাত্রেই খাওয়ার পর সে বাবার পাশে গিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত শুয়ে পড়লো, অন্যান্য দিন জয়ন্ত কিন্তু পাশের ঘরে শোয়, একটি খাটে একাই। সূর্য্যকান্ত হাসলেন মনে মনে। নিশ্চয়ই আজ কিছু বলার আছে ওর। আবার নতুন কিছু একটা ঢুকেছে হয় তো মাথায়।

বাবাকে পাশে পেয়েই জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলো,'আচ্ছা, বাবা, 'বলো Joe de vivre?'খাটে শুয়ে পরম স্নেহে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন সূর্য্যকান্তবাবু।

'দেবেন মিস্ত্তিদের বাগানের অত গভীর কূয়োর মধ্যে নামলাম, তবু, কই, পাতালের দেখা তো পেলাম না! পাতাল তবে কি আরও অনেক নীচে?'

'না'! বাবা বললেন, 'তুমি যে পাতালের কথা রামায়ণে পড়েছো, সেখানে নাগ-সম্প্রদায়ের মানুষদের বাস, যাদের রাজা হলেন বাসুকী। কিন্তু পৃথিবীর মাটির নীচে মানুষ থাকবে কেমন করে? দেখতে পাও না— বিশ-ত্রিশ হাত গর্ত্ত করলেই কেমন জল বেরিয়ে পড়ে? জলের মধ্যে মানুষ থাকতে পারে?'

'তবে বোধহয় আরও অনেক গভীরে রয়েছে পাতাল!'

'তাও না। আরও গভীরে আরও অনেক ভয়ানক অবস্থা। সেখানে দারুণ উত্তাপে ধাতু, পাথর সব গলে জর্লের মত হয়ে টগবগ করে ফুটছে। যে তাপে ধাতু-পাথর সব গলে যায়, সেই তাপে কোনো প্রাণী বাস করবে কেমন করে?' 'তবে যে সবাই পাতাল কোথায় জিজ্ঞেসা করলেই পায়ের নীচের মাটিকে দেখিয়ে দেয়?'

'যুগ যুগ ধরে এইটেই চলছে, এই পাতাল বলতে মাটির নীচটা দেখানো। তাই, আমরাও দেখিয়ে চলেছি আজও। যেমন স্বর্গ বলতেই আমরা দেখিয়ে দিই আকাশকে।'

'তবে কি মহর্ষি বাল্মিকী মিথ্যা বলেছেন? পাতাল বলে কিছুই নেই?'

'হয় তো আছে, কিন্তু সেটা কোথায়-তা আমার জানা নেই।' এই বলে পুত্রকে বুকের আরও কাছে টেনে নিয়ে,স্নেহার্দ্রস্বরে বল্লেন,—'কি হবে পাতালের খোঁজ করে জয়? আমাদের এই নীল আকাশ, সবুজ বনানী,ফেনিল সমুদ্র আর তুষারাবৃত পাহাড় ঘেরা মর্ত্ত্যেতেই অনেক না দেখা জিনিস দেখার আছে, অনেক না জানা জিনিস জানার আছে। তোমার অনুসন্ধিৎসু মনকে তুমি সেইসব জিনিসের দিকে ঘুরিয়ে দাও না।'

হতাশার সুরে বালক জানতে চাইল-'এ পৃথিবীতে তোমার জানা এমন কোন বই কিংবা মানুষ কি নেই, যা পড়ে বা যার কাছে গেলে আমি পাতালের সন্ধান পেতে পারবো?' 'তেমন কোন গ্রন্থের খবর আমি জানি না। তবে আমার এক স্কুলের বন্ধু আছে। নাম দ্বারকানাথ। এনসেন্ট হিষ্ট্রি, আর্কিওলজি,বিশেষ করে ইন্দোলজিতে এত বড় পণ্ডিত আর দ্বিতীয় চোখে পড়েনি আমার। তিঁনটে সাবজেক্টে এম,এ। সব কটি এম,এ,-তেই সে ফার্ষ্ট হয়েছিল। চিরকুমার এখন সন্ন্যাসী।'

'সন্ন্যাসী! শুনেছি সন্ন্যাসীরা নাকি দিব্যদৃষ্টিতে অনেক এমন কিছু দেখতে পান, যা আমাদের দৃষ্টিতে ধরা দেয় না। আমাকে ঐ সন্ন্যাসীর কাছেই নিয়ে চলো না, বাবা। তাঁর দৃব্যদৃষ্টি দিয়ে তিনি নিশ্চয় দেখতে পান পাতালকে। আমার মনে হয়, উনিই দিতে পারবেন আমাকে পাতালের সন্ধান। একটু হাসলেন জজ সাহেব।

শিশুদের মন এমনিতেই কল্পনা-প্রবণ। তার ওপর জয়ন্ত তো এক দুরন্ত প্রতিভাধর শিশু। ওর কল্পনা তো স্বাভাবিকভাবেই আরও উগ্র আরও স্বপ্নঘেষা হবেই। সন্ন্যাসী নামোচ্চারণ মাত্রই ওর কল্পনার প্রেক্ষ্যাপটে তাই ফুটে উঠেছে এক দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহামানবের মুখচ্ছবি—প্রশ্ন করা মাত্র যিনি সন্ধান দেবেন ওকে সেই পাতালের, যে পাতালকে ও খুঁজে বেড়াচ্ছে উন্মাদের মত গত কয়েক বছর ধরে।

পিতাকে নীরব থাকতে দেখে অধৈর্য পুত্র শুধালো—'কই বাবা কিছু বলছো না কেন? আমাকে ঠিক নিয়ে যাবে তো সেই তিন বিষয়ে ফার্ষ্ট হয়ে এম,এ পাশ করা তোমার সন্ন্যাসী বন্ধুর কাছে?'

পরমাদরে জয়ন্তের শিরে হাত বুলোতে বুলোতে সূর্য্যকান্ত বললেন—'সামনের পূজোর ছুটীতে চেষ্টা করবো দ্বারকানাথের সাথে তোমার দেখা করিয়ে দেবার। কিন্তু, কথা দাও, সেই সন্ন্যাসীর দেখা পাওয়ার আগে আর তুমি কোনও কূয়ো বা গভীর গর্তে কখন নামবে না।'

আনন্দের অতিশয্যে বাবার গলাটা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বল্‌ল জয়ন্ত—' কথা দিলাম, বাবা।'

আট

বয়সানুপাতে জয়ন্তকে অনেক ছোট মনে হয়। তেরো বছরেও ওকে মনে হয় বুঝি বা আট-ন বছরের ছেলে। কচি বয়সেই চশমা নিতে হয়েছে বটে, কিন্তু চশমা ওর মুখের শৈশব-কোমলতা এবং চপলতার কোনটাই নষ্ট করতে পারে নি। মাথা ভর্তি কোঁক্‌ড়া চুল আর টানা ভুর নীচে দুই চোখে প্রতিভার স্বাক্ষর ঝল্‌মল্‌ করছে সব সময়।

পূজোর ছুটীর আর বেশী দেরী নেই হাপইয়ার্লি পরীক্ষায় এবছরেও জয়ন্ত সর্ব্ববিষয়ের চেয়ে পঁষট্টি নম্বর বেশী পেয়ে আবার ফার্ষ্ট হয়েছে ক্লাসে। বিষ্ণুপদবাবুর খুশির আর অন্ত নেই। স্কুলের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ক্লাস টেনের ছেলেদের পরাভূত করে জয়ন্ত শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পেয়েছে, তাতেও হেডমাষ্টার ফুলে ফেঁপে উঠছেন মনে মনে। ধর্ম্মদাসবাবুকে কানে কানে বললেন,গত বছর আপনি ক্লাস এইটের ক্লাস টিচার ছিলেন, এবছর জয়ন্ত ক্লাস নাইনে উঠল। তাই আপনাকে আমি এবছর ক্লাস নাইনের ক্লাস টিচার করে রেখেছি, আপনার মত উদার হৃদয় এবং সহানুভূতিশীল শিক্ষকের সদাসতর্ক দৃষ্টির নীচে ছেলেটা থাক,এই আমার ইচ্ছা। আপনাকে এবার একটা কাজ করতে হবে ধর্ম্মদাসবাবু।'

বলুন স্যার!

পনেরোই সেপ্টেম্বর রাজকলেজে যে-বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হবে, সেখানে অমি পাঠাতে চাই জয়ন্তকে প্রতিযোগী হিসেবে।'

হ্যাঁ।'

কিন্তু,স্যার, যদিও প্রতিযোগিতার বিজ্ঞপ্তিতে রাজকলেজ কর্তৃপক্ষ লিখেছেন- এটা Open to all,তবু কলেজের বড় বড় ছেলেদের সঙ্গে বক্তৃতায় জয়ন্ত এঁটে উঠতে পারবে কি? না পারলেও একটা অভিজ্ঞতা তো হবে ওর! ওর প্রতিভাকে সুযোগ দিয়ে সুবিধা দিয়ে আরও ঝকঝকে আরও ধারালো করে তুলতে হবে যে আমাদেরকেই।'

'ক্লাস টেন-এর ছেলেরা যদি হৈচৈ করে? ক্লাস টেন- এর ছেলেদের কাউকে না পাঠিয়ে ক্লাস নাইনের ছেলেকে পাঠানো হচ্ছে দেখে তারা যদি আপত্তি তোলে?'

'তবে ক্লাস টেনের একজন কাউকেও বেছে নিন। কিন্তু আমার লক্ষ্য থাকবে এই আশ্চর্য্য ছেলেটার ওপরেই। যেমন গভীর ওর পড়াশোনা আর বিচার বিশ্লেষণ, তেমনি চমৎকার হচ্ছে বাচনভঙ্গী। ওকে এবার তুলে ধরতেই হবে শহরের বিদগ্ধ সমাজের সামনে। যদি ও সফল হয়, আমাদের স্কুলের মর্য্যাদাও কম বাড়বে না।'

'বক্তৃতার বিষয়টাও বেশ কঠিন স্যার। বস্তুবাদে ভারতের নগণ্যতা। এমন একটা বিষয় নিয়ে ঐটুকু ছেলে আর কতটুকুই বা বলতে পারবে?

একটু দমে গেলেন যেন বিষ্ণুপদবাবু বক্তৃতার সাবজেক্টটা একটা ক্লাস নাইনের ছেলের পক্ষে বেশ কঠিনই বটে। মুহূর্তের চিন্তার শেষে তিনি বললেন, 'বেশ, তবে এখনই ওর নাম পাঠাবার দরকার নেই। ও সেদিন আমাদের সঙ্গে যাবে, ঐ প্রতিযোগিতায়— বক্তৃতা শুনতে। সেখানে যদি ওর কিছু বলার ইচ্ছে হয়, প্রিন্সিপ্যালকে বলে— ওর বলবার অনুমতি আমি করিয়ে নেবো।

ধর্মদাসবাবু পরের দিনই জয়ন্তকে ডেকে জানিয়ে দিলেন পনেরোই সেপ্টেম্বরের বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার কথা। উৎসাহহীন কণ্ঠে জয়ন্ত কেবল বলল—'আপনি যেতে বলছেন, যাবো, স্যার। কিন্তু এসব কিছুই আমার মনে ধরছে না এখন।'

'কেন?'

'সামনের ছাবিবশে সেপ্টেম্বর আমি যে বাবার সঙ্গে যাত্রা করছি উত্তর কাশীতে।'

'তাই নাকি? হিমালয়ের উত্তর কাশীতে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ'। নিমেশে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল ছেলেটা, 'জানেন,স্যার?এতদিন

পাগলের মত যা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, সেই পাতালের সন্ধান হয়তো আমি এবার পাবো।'

হেসে ফেললেন ধর্মদাসবাবু। এত বুদ্ধিমান আর প্রতিভাবান, তবু বয়সে তো বালক ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই ছেলেমানুষি ছাড়তে পারে না যেন কিছুতেই। হাসতে হাসতেই প্রশ্ন করলেন, 'পাতালের খবর আবার কার কাছে পাবে?' বড় বড় চোখ করে জয়ন্ত জানালো—'সে এক মস্ত সন্ন্যাসীর কাছে। বাবার সঙ্গে স্কুলে পড়তেন একই ক্লাসে। তিনটে সাবজেক্টে এম,এ,। বাবা বলেন— ভারততত্ত্বে এতবড় পণ্ডিত খুব কমই আছে। বাবা আরও বলেছেন— পাতালের সন্ধান কেউ যদি দিতে পারেন তো ইনিই পারবেন। তাইতো বাবা নিয়ে যাচ্ছেন এবার আমাকে সেই সন্ন্যাসীর কাছে।'

নয়

রাজ কলেজের প্রাঙ্গণে বড় বড় দেবদারু গাছ। তারই নীচে সুন্দর পরিবেশে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ কতৃক আহূত বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার আসর বসেছে। একপ্রান্তে বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের বসার ব্যবস্থা হয়েছে। তার অদূরে সভাপতি,বিচারক মণ্ডলী এবং প্রধান অতিথির বসার মঞ্চ। বক্তৃতা মঞ্চ ঠিক তার পাশেই। পশ্চাৎ পটে রবীন্দ্রনাথের একটি বিরাট তেলরঙা ছবি শোভা পাচ্ছে। আলোয় উদ্ভাসিত চারিদিক। জনসমাগম হয়েছে আশাতীত। মিউনিসিপ্যাল স্কুল এবং টাউন স্কুলের হেডমাষ্টারদ্বয় পাশাপাশি বসেছেন। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সস্ত্রীক উপস্থিত সভাপতি রূপে। মিঃ লেদব্রিজের পত্নীর আজ পুরস্কার বিতরণের কথা! হেডমাষ্টারের ঠিক পেছনেই একটি চেয়ারে বসেছেন ধর্মদাসবাবু। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে অধীর আগ্রহে চারিধারে চেয়ে চেয়ে দেখছে জয়ন্ত।

বিষ্ণুপদবাবু আসরে প্রবেশ করেই তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু কলেজ প্রিন্সিপ্যালকে বলে রেখেছেন—'সেই যে ছেলেটার কথা বলেছিলাম তোমাকে ভাই, তাকে আজ সঙ্গে এনেছি। যদি অন্যদের বক্তৃতা শুনে ওর মনেও কিছু বলবার উৎসাহ দেখা দেয়, তবে ওকে বলতে দিতে হবে কিন্তু।'

শুনে প্রিন্সিপ্যাল খুব খুশি হয়েই বলেছেন—'কলেজের বড় বড় ছেলেদের বড় বড় বক্তৃতা শোনার পরও যদি স্কুলের কোনও ছোট ছেলে কিছু বলতে সাহসী হয়, সে তো খুব ভাল কথা। নিশ্চয় তাকে বলতে অ্যালাও করা হবে।'

ঠিক সন্ধ্যা ছটায় প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। সভাপতির গলায় মালা দিয়ে

সভাপতি বরণ শেষ হল। ফোর্থ ইয়ারের সুশ্রী সুঠাম যুবক বিধান সিংহ গাইলো। উদ্বোধনী সঙ্গীত। তারপর চললো এক এক করে নাম ডাকা আর এক এক জনের এসে বক্তৃতা দেওয়া। যেহেতু ঘোষণা করা হয়েছিল প্রতিযোগিতা হবে সর্বসাধারণের মধ্যে,অনেক প্রাইমারী স্কুল, মিডল স্কুল,এমন কি গ্রাম্য হাইস্কুলের টিচারও তাই এসেছেন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে। অনেকের বয়সই ত্রিশ- পঁয়ত্রিশের ওপর হবে।

জনা বার বক্তৃতা বলা শেষ হলে মাইকে যাঁর নাম জানানো হল। তিনি হচ্ছেন শক্তিগড়ের নিকটবর্তী কোন এক স্কুলের অ্যাসিন্ট্যান্ট হেডমাষ্টার বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। ধুতী আর গরদের পাঞ্জাবী পরা। জুলপীর কাছে কিছু কিছু চুলে পাক ধরেছে। নাম জটাধর হাটী। ইংরেজ সভাপতিকে সসম্ভ্রমে নমস্কার জানিয়ে তিনি আরম্ভ করলেন—। বললেন—ত্রিশ টাকার ফার্ষ্ট প্রাইজ পাওয়ার লোভে আমি প্রতিযোগিতায় ভাগ নিতে আসি নি। আমি এসেছি—আজকের প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তুটির আকর্ষণে। বক্তৃতার বিষয় দেওয়া হয়েছে। বস্তুবাদে ভারতের নগণ্যতা। এমনি একটি সত্যগর্ভ বিষয় নিবর্বাচন যাঁরা করেছেন তারা অবশ্যই আমাদের সকলের ধন্যবাদের পাত্র। বস্তুবাদে ভারত আজও যে তার শৈশব অতিক্রম করে নি, এ সত্য কার কাছেই বা অজানা? স্বীকার করি— ধর্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি,কাব্য দর্শনে ভারত একদিন বর্হিভারতেব অনেকের কাছেই শ্রদ্ধেয় হতে পেরেছিল, কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক সমৃদ্ধি তার কখনো ছিল না। আর্য সভ্যতা সারা দেশটাকে কেবল ধর্ম ধর্ম করতে শিখিয়েছে। তাই পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যখন জড়বিজ্ঞানে চরম উন্নতি লাভ করে সুখে-সম্ভোগে দিন কাটাচ্ছে, ভারত তখন ভাঙ্গাবাড়ীর ভাঙ্গাছাতের নীচে বসে অনশনে অর্দ্ধাশিনে প্রাণপণে হরিনামের মালা জপে চলেছে হেডমাষ্টারের কানের কাছে মুখ নিয়ে জয়ন্ত নীম্নস্বরে বলল— 'কি সব যাতা বলছে ঐ লোকটা মাষ্টারমশাই আপনি প্রতিবাদ করছেন না?'

হেডমাষ্টার ওর কানে মুখ লাগিয়েই বললেন—'কেবল শুনে যাও। এটা প্রতিযোগিতার আসর। এখানে যে যখন বক্তা,যে যা খুশি তাই বলবেই।'

জটাধর বলে চললেন—'বস্তুবাদে ভারতের নগণ্যতা যে কতখানি, তা আমি বিশদভাবে আপনাদের কাছে বলবো। কিন্তু তার আগে আমার বোধ হয় উচিৎ— জগদ্বরেণ্য ঐ বিশ্বকবি, যাঁর বিরাট আলেখ্যটির সামনে দাঁড়িয়ে আজ আমরা এই বক্তৃতা করার সুযোগ পেয়েছি, তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানানো। সমস্ত পৃথিবীতে অতীতে যত কবি জন্মেছেন এবং বর্তমানে যত কবি জীবিত আছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠেত্বের দাবী করতে পারেন একমাত্র এই রবীন্দ্রনাথই। অন্যান্য সব কবিই তাঁদের

পুর্ববর্তী কোন না কোন কবি বা লেখকের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, একমাত্র এই রবীন্দ্রনাথই হচ্ছেন ব্যাতিক্রম। রবীন্দ্রনাথের রচনা সমস্তই মৌলিক, এতে অন্য কোন কবির রচনার প্রভাব কখনই খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

স্কুলে কিছু বলবার সময় ছাত্ররা যেমন এক হাত তুলে শিক্ষকের অনুমতি চায়, ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে একটি হাত মাথার ওপরে তুলে চিৎকার করে উঠল এবার জয়ন্ত—মে আই কন্‌ট্রাডিক্ট ইউ মিষ্টার হাটী?'

মুহূর্তে সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো টাউন স্কুলের হেডমাষ্টারের পাশে দাঁড়ানো ছোট্টছেলেটার ওপরে। বালকসুলভ কোমল কণ্ঠে এত সুন্দর উচ্চারণ ইংরেজীর—ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট লেদারব্রিজও কম অবাক হলেন না। বিপন্ন বিষ্ণুপদবাবু তাড়াতাড়ি জয়ন্তকে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন হাত ধরে। ওদিকে জটাধর থতমত খেয়ে কথা থামিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন জয়ন্তের দিকে। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রিন্সিপ্যালকে ফিসফিস করে বললেন—'লেট দ্য বয় কন্‌ট্রাডিক্ট।' সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্সিপ্যাল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জয়ন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বললেন—' ইয়েস, আওয়ার প্রেসিডেন্ট অ্যালাউজ ইউ টু কন্‌ট্রাডিক্ট।'

মুখ কাঁচুমাচু করে জটাধরী শুধালেন প্রিন্সিপ্যালকে—' তাহলে আমি এখন কি করবো স্যার?'

'একটু অপেক্ষা করুন। ওর কন্‌ট্রাডিক্‌শন শেষ হয়ে গেলেই আপনি আবার বলবেন।' জয়ন্তের চেয়ারে এতক্ষণ জয়ন্ত বসে নি। ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল হেডমাষ্টারের পাশে কারণ, সে এত ছোট, বসলেই সবার মাথায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল তার দৃষ্টি। প্রিন্সিপ্যাল তাকে কন্‌ট্রাডিক্ট করার অনুমতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো নিজের চেয়ারটার ওপর। প্রথমেই ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের দিকে চেয়ে তাঁকে সুউচ্চারিত ইংরেজীতে ধন্যবাদ জানালো—'থাঙ্ক, ইউ মিঃ প্রেসিডেন্ট ফর অ্যালাউইং মি টু কন্‌ট্রাডিক্ট দিস্ জেন্‌টেল্‌ম্যান।'

লেদব্রিজের কানে কানে নিবেদন করলেন প্রিন্সিপ্যাল—' ছেলেটি ডিষ্টক্টজাজের একমাত্র ছেলে।'

'আচ্ছা!' লেদব্রিজ চেয়ারের হাতলে হাত ঠুকে বললেন —টোবে টো হাম উহাকে হাসাপিট্যালে দেখিয়াছি। হি ওয়াজ সিরিয়সলি ইন্‌জিওড়।'

কচি কোমল কণ্ঠকে যথাসম্ভব উচ্চ গ্রামে তুলে জয়ন্ত শুরু করলো—'বাবা আমাকে দুইবার শান্তিনিকেতনে নিয়ে গেছেন। কবিগুরুর সামনে ওঁরই লেখা কবিতা আমি আবৃত্তি করে ওঁর আশীর্ব্বাদ মাথা পেতে নিয়েছি। আজকের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি যে রবীন্দ্রনাথ, সে বিষয়েও কোন সংশয় নেই আমার মনে। তবু,

আপনার কথার প্রতিবাদ আমাকে করতে হল বলে আমি আন্তরিক দুঃখিত। রবীন্দ্রনাথের লেখায় তাঁর পূর্বর্বসুরীদের কারুর রচনার কোন প্রভাব কোথাও পড়েনি—এ কথাটা বলে আপনি সত্যের অপলাপ করেছেন, ভুল করেছেন। আপনাকে কন্‌ট্রডিক্ট করার একমাত্র উদ্দেশ্য—আপনার সেই ভুলটাকে শুধরে দেওয়া, আপনার অসন্মান করা নয়'। অভ্যস্ত, পরিশীলিত এবং পরিপক্ক এক বক্তার ঢং এ তাকে বক্তৃতা আরম্ভ করতে দেখে প্রতিযোগিতার আসরে সকলেই যেন কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়লো।'

'সারা দুনিয়ার এমন একটি মানুষও অতীতে ছিলেন না, বর্ত্তমানে নেই, এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন না— যিনি তাঁর পূর্ববর্তন পুরুষদের কারও না কারও প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন না, হন নি, বা হবেন না। আমার বাবা যা করেন, আমি সেটা অনুকরণ করবো—এটাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। মা যেমন ভাবে শাড়ী পরেন,যেমনভাবে গৃহস্থালীর কাজকর্ম করেন, তাঁর কন্যাও যে ঠিক সেই রকমটি করার চেষ্টা করবে-এতে অস্বাভাবিকতার কি আছে? ঠিক তেমনি, পূর্বর্বসূরীর রচনার প্রভাব কিছুটা যদি এসে পড়েই অধস্তন কোন লেখক বা কবির মধ্যে, তাতেও 'সব গেলো-সব গেলো' করার তো কিছুই নেই। এই প্রভাবের মধ্যেও দেখা যায়, অধস্তন যিনি, তিনি তাঁর প্রতিভার প্রাখর্য্যে অনন্য হয়ে উঠেছেন নিজস্ব এক ষ্টাইল গড়ে তুলে। হয়তো প্রবর্তন যাঁর প্রভাবে তিনি প্রভাবিত, তাঁর চেয়েও বেশী সুনাম, সুখ্যাতি আর যশের অধিকারী হলেন তিনি নিজস্ব শৈলীতে ভাস্কর হয়ে। রবীন্দ্রনাথও হচ্ছেন ঠিক সেই ধরণের এক কবি। তাঁর কাব্যে অন্যের রচনার যথেষ্ট প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে আজ প্রায় অতুলনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন দেশের সবার কাছে।'

আসরে উপবিষ্ট রাজ কলেজের বেশ কয়েকজন ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র প্রিন্সিপ্যালের দিকে তাকিয়ে প্রতিবাদ জানাতে লাগলো—'স্যার ও বলতে চাচ্ছে রবীন্দ্রনাথও নকল করেছেন অন্যের রচনা থেকে। বিশ্বকবিকে অপমান করছে ক্লাস নাইনের একটা পুচকে ছাত্র। রবীন্দ্রকাব্যের ও কতটুকু পড়েছে?' জয়ন্ত সবার গলার ওপর তার সরু মিহি কণ্ঠ চড়িয়ে চিৎকার করে বলল—'সত্যি কথা। রবীন্দ্রনাথের কিছুই আমি জানি না। কারণ, রবীন্দ্রনাথকে পড়া এবং বোঝা অত সহজ কাজ নয়। তবু, আমি এখনই আপনাদের সামনে রবীবাবুর দুই তিনটে কবিতার দৃষ্টান্ত রাখছি; যেগুলো শুনলেই আপনারা বুঝবেন আমি মিথ্যা বলি নি।'

অ্যাসিষ্ট্যান্ট হেডমাষ্টার জটাধর হাটী তাঁকে থামিয়ে দেওয়ায়প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেলেন মনে হল এতক্ষণ। তিনি হাত মুখ নেড়ে বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়েই

খিঁচিয়ে উঠলেন—'একটা কবিতাও তুই দেখাতে পারবি নে,যেটা নকল করেছেন রবীঠাকুর অন্য কারুর রচনা থেকে।

'আপনারা নকল-নকল করছেন কেন বুঝতে পারছি না। আমি তো প্রভাবের কথা বলেছি—'

'বেশ তো তাই দেখা না কেমন পারিস। রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতায় অন্য কারও প্রভাব পড়েছে, বল শুনি?

ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট প্রিন্সিপ্যালের দিকে একটু হেলে পড়ে শুধালেন— ডিষ্টিক্ জাজের পুট্র কি বলিটে চাহিটেছে— টেগোরের কবিটায় অন্য কোন কবির ইন্‌ফ্লুয়েন্স সে খুঁজিয়া পাইয়াছে?'

প্রিন্সিপ্যাল নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে বোঝালেন— হ্যাঁ।

'ভেরি ইন্টারেষ্টিং! লেট হিম স্পিক্!'

জয়ন্ত বলল— আসুন প্রথমেই আমরা দৃষ্টি দিই মহাকবি কালিকাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলমের দিকে। ঢাকার পোগোজ স্কুলের সূর্যপণ্ডিত সবর্বপ্রথম আমার সামনে এই লাইন দুটি তুলে ধরেছিলেন। তিনিই আমায় দেখিয়ে দিয়েছিলেন — এই দুটি লাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার দুইটি লাইনের কী আশ্চর্য্য মিল। কালিদাস লিখেছেন—

> অভিনব মধু লোলুপপস্তং তথা পরিচুমা চুত মঞ্জরীম।
> কমলবসতিমাত্রনির্বৃতো মধুকর বিস্মিতোহস্যোমাং কথম্।।

এরপর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> নবমধু- লোভী ওগো মধুকর, চ্যুত মঞ্জরী চুমি–
> কমল নিবাসে যে প্রীতি পেয়েছো, কেমনে ভুলিলে তুমি?

এই পর্য্যন্ত বলে, হাটীর দিকে চেয়ে পুনশ্চ বলল জয়ন্ত, 'এখন আপনিই বলুন মাষ্টারমশাই–এই কবিতাটি শোনার পর আপনার কি মনে হচ্ছে না যে, কালিদাসের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের ওপর অবশ্যই পড়েছে? সংস্কৃত আর বাংলা লাইনগুলোকে পাশাপাশি রেখে বিচার করলে মনে হয় নাকি—রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন কালিদাসের ঐ ছত্র দুটিকে?'

লেদব্রিজ প্রিন্সিপ্যালের কাছে জানতে চাইলেন—'ওকি প্রমাণ করিটে পারিয়াছে যে রবীন্দ্রনাথ ইজ ইন্‌ফুয়েন্সড বাই কালিদাস?'

প্রিন্সিপ্যাল উত্তর দিলেন, কেবল পেরেছে বললে ঠিক বলা হবে না। আশ্চর্য্য রকমভাবে ও প্রমাণ করেছে এই প্রভাবের কথা। কালিদাস আর রবি ঠাকুরের লেখার মধ্যে যে এত মিল, এটা তো আমারও অজানা ছিল এতদিন।'

জয়ন্ত কিন্তু থাম্‌ল না।

সে আবার বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান অ্যাসিষ্ট্যান্ট হেডমাষ্টারকে উদ্দেশ্য করে বলে চলল, 'আরও দুটি জায়গায় এবার লক্ষ্য করুন—রবীন্দ্রনাথ আর কালিদাসের কত মিল। ঋতুসংহারে কালিদাস বলেছেন—"পুষ্পাবতংস সুরভীকৃত কেশপাশা। বর্ষামঙ্গলে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—কেতকীশরে কেশপাস করো সুরভি। উত্তর মেঘে আমরা দেখতে পাচ্ছি কালিদাসের বর্ণনা—

অধিক্ষামাং বিরহশয়নে সান্নিধনৈক পার্শ্বাং।
প্রাচীমূলে তনুসিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ।।

এদিকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"চমকে দীপ্তি দামিনী—
শূন্যশয়নে কোথা জাগে পুরকামিনী।"

এইবার প্রিন্সিপ্যাল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন— একটি ক্লাস নাইনের বাচ্চা ছেলে তার তথ্য পরিবেশন করে বিশ্বাস করতে আমাদের বাধ্য করেছে যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ওপর অনেক জায়গাতেই মহাকবি কালিদাসের রচনার প্রভাব রয়েছে। এইবার আমার অনুরোধ—জটাধরবাবু আবার আরম্ভ করুন আমাদের আজকের প্রতিযোগিতার মূল বিষয়টি নিয়ে বলতে।'

মসী-অঙ্কিত মুখে জটাধর পুনরায় শুরু করলেন—'আর্য্যরা ধর্ম কর্মের যতই বড়াই করুন, কাব্যদর্শনে যতই নিজেদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভেবে সুখ পান, বিজ্ঞানে তাঁরা ছিলেন অতি নগণ্য। প্রচীনকালে যন্ত্র বিজ্ঞান বলতে তো ছিল না কিছুই।'

'আপনি আবার ভুল বলছেন মাষ্টারমশাই। আপনি বলছেন যন্ত্রবিজ্ঞান বলে প্রচীন ভারতে কিছু ছিল না। একথা কখনই ঠিক নয়।' আবার তর্কের সঙ্গীন উঁচিয়ে ধরেছে জয়ন্ত। কিন্তু হেডমাষ্টার তাড়াতাড়ি তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে নীচুকণ্ঠে বললেন—'তোমার যদি কিছু বলার থাকে এঁর পরে বোলো। আগে এঁকে শেষ করতে দাও।' জটাধর থামলেন না। বলেই চললেন—'কেবল যন্ত্র বিজ্ঞান নয়। কোন বিজ্ঞানেই ভারত কখনও গ্রীস ইতালী আর চীনের মত উন্নত ছিল না প্রাচীনকালে। আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে ইতালীর গ্যালিলিও আর গ্রীস-এর কোপার্নিকাসই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন যে, পৃথিবীই সূর্য্যের চারপাশে ঘুরছে, সূর্য্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে না। তার আগে পর্য্যন্ত সারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত এই ভারতের মহা মহা পণ্ডিতেরাও ভাবতেন সূর্য্যই পৃথিবীর চার পাশে ঘুরছে। কারণ তাঁরা দেখতেন সকালে সূর্য্য পুবের্ব উদয় হয়ে সন্ধ্যায় পশ্চিমে ঢলে পড়ে। এই তো ছিল ভারতের জ্যোতিবিজ্ঞানের অবস্থা।'

জয়ন্ত আর চুপ করে থাকতে রাজী হল না কিছুতেই। সে আবার তড়াক্ করে

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো নিজের চেয়ারটারই ওপরে। চিৎকার করে বলতে লাগলো—'দয়া করে এবার থামুন মাষ্টারমশাই যার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না আপনি—তা নিয়ে আর কোন কথা বলবেন না। আপনি না স্কুলের শিক্ষক? আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাইব আমার দেশের অতীত গৌরবের কথা। তাতো বলছেনই না, উপরন্তু, ভারতকে সবদিক থেকে হেয় প্রতিপন্ন করার কতই না চেষ্টা করছেন আপনি।'

ক্রোধকম্পিত স্বরে জটাধর পুনশ্চ খিঁচিয়ে উঠলেন—' আমি যে ভুল বলেছি তা প্রমাণ কর। পড়িস তো শুনলাম ক্লাস নাইনে, তাতেই এত ফড়ফড়ানি!' জটাধরের আগে যে বারোজন বক্তা বলেছিল, তাদেরও অধিকাংশ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল যে, ভারত অতীতে বিজ্ঞানে পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের তুলনায় শিশু ছিল। সেই বক্তাদের বক্তৃতার সময়েও জয়ন্ত বারবার উস্‌খুস করেছে, কিন্তু মৌখিক প্রতিবাদ কিছু জানায় নি। কারণ পূর্ববর্তী বক্তারা হাটীর মত এত আক্রমণাত্মক ভাষায় কথা বলে নি। কিন্তু বেচারী অ্যাসিষ্ট্যান্ট হেডমাষ্টার বলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তের মন যেন একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। প্রায় বক্তৃতার আরম্ভ থেকেই তাই সে ফোঁস ফোঁস করছিল। হেডমাষ্টার মশাই-এর অনুরোধে সাড়া দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু এখন সে মরীয়া হয়ে উঠেছে আবার। হেডমাষ্টারের মনে পড়ে গেল—একদিন কথায় কথায় জয়ন্ত বলেছিল তাঁকে– সূর্য্য-পণ্ডিত নাকি শিখিয়েছিলেন-দেশ-মাতৃকার অপমান যারা করার চেষ্টা করবে, তাদের ক্ষমা করবি নে কখনো। আজ, মনে হয়, হাটীর বক্তৃতা শুনে ছেলেটার স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছে তার জীবনের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় মানুষ ঢাকার সেই সূর্য্য পণ্ডিতের কথাগুলো। আর তাই সে এমন রুখে দাঁড়িয়েছে জটাধরবাবুর বিরুদ্ধে।'

'আপনি বললেন—পাঁচশো বছর আগে ইতালীর গ্যালিলিও আর গ্রীসের কোপার্ণিকাসই প্রথম আবিষ্কার করে যে, পৃথিবীই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে। আপনি কি ভারতীয় জ্যোতিবিজ্ঞানী আর্য্যভট্টের নাম শুনেছেন? তিনি জন্মেছিলেন পাটুলীপুত্রে খৃষ্টীয় চারশো ছিয়াত্তর অব্দে। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। তাঁর লেখা গণিতপাদ, কালক্রিয়াপাদ, গোলপাদ আর গীতিকাপাদ পড়েছেন কি? সূর্য্য পণ্ডিত এ সবগুলো গ্রন্থই পড়েছেন। তিনি আমায় বলেছেন– সারা পৃথিবীর মধ্যে আর্য্যভট্টই প্রথম মানুষ যিনি পৃথিবীর আহ্নিকগতি আর বার্ষিক গতির কথা ঘোষণা করেন তাঁর গ্রন্থে। তাহলে? তাহলে এখন তো বুঝতে পারছেন কতবড় ভুল কথা আপনি বলেছেন ভারত সম্বন্ধে। গ্রীস আর ইতালী পৃথিবীর

যে বার্ষিক গতির কথা বলেছে মাত্র পাঁচশো বছর আগে। ভারত তো সে সত্য আবিষ্কার করেছে আরও তার প্রায় এক হাজার বছর আগে। তবে? এখনও কি আপনি বলবেন প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানে অনুন্নত ছিল ভারত অন্য অনেক দেশের তুলনায়?'

মুখটা পেঁচার মতন করে ফ্যালফ্যাল চোখে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন অ্যাসিষ্ট্যোন্ট হেডমাষ্টার। প্রিন্সিপ্যাল তাঁকে জিজ্ঞেসা করলেন—

'আপনি আর কি কিছু বলবেন মিঃ হাটী?'

'আপনারা একটা চ্যাংড়া ছোঁড়াকে আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করছেন— আমি আর কিছু বলবো কিনা? কেমন করে বলবো? বারবার এমনি করে বাধা দিলে কেউ কিছু বলতে পারে? এটা কি একটা প্রতিযোগিতার আসর,না বাঁদরামির আখড়া?'

বিষ্ণুপদবাবু ঝাঁ করে উঠে দাঁড়ালেন এবার। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্টেটের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—'মিষ্টার হাটী নিজে একজন স্কুল শিক্ষক হয়েও যে ভাষা ব্যবহার করছেন আজ এই কলেজ প্রাঙ্গণের অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে, তার জন্য একজন স্কুল শিক্ষক হিসেবে আমি নিজে খুবই লজ্জাবোধ করছি।'

হাটী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—'একজন স্কুল টীচারকে একটা ক্লাস নাইনের ছেলে যে বারবার অপমান করছে, সেদিকে তো, কই, দৃষ্টি পড়ছে না আপনার! আমার অবস্থায় পড়লে আপনিও ঠিক এইরকম ভাষাই ব্যবহার করতে বাধ্য হতেন।' দুই শিক্ষকের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হতে দেখে বিচলিত হলেন প্রিন্সিপ্যাল। হাটীই ছিলেন আজকের প্রতিযোগিতার শেষ বক্তা। সুতরাং এখন আসরের কাজ শেষ বলে ঘোষণা করাই বোধহয় সমীচীন হবে, ভাবলেন কলেজাধ্যক্ষ।

কিন্তু আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি মিঃ লেদ্‌ব্রিজ অন্য কথা বললেন। আঙ্গ ুল দয়ে জয়ন্তকে দেখিয়ে উনি প্রিন্সিপ্যালকে বললেন—'লেট দ্য বয় কন্‌ক্লুড। উহার যদি কিছু বলিবার ঠাকে বলিতে দিন।' প্রিন্সিপ্যাল জয়ন্তকে বলবার জন্যে আহ্বান জানাতেই, সে আবার বলতে শুরু করলো—

'সূর্য্যপণ্ডিত বলেন—আমাদের দেশে যাঁরা ইংরাজী শিখবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশের কাছেই ভারত আজ এক তাচ্ছিল্যের বস্তু। তাঁদের মতে ভারত অতীতে কখনোই রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, শরীরবিদ্যা,জ্যোতিবিজ্ঞান,যন্ত্রবিজ্ঞানে অথবা কারিগরিবিদ্যায় উন্নত ছিল না। যা সমান্য উন্নতির মুখ আজ ভারত দেখছে তা কেবল ঐ ইংরেজদের কৃপায়। শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশাই মিঃ হাটীর মতও অনেকটা

ঐরকমই। একটু আগে উনি এই সভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছেন যে,বস্তু-বাদে ভারত চিরদিনই নগণ্য ছিল, আজও আছে। যন্ত্রবিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞানের কিছুই জানা ছিল না। নাকি প্রচীন ভারতবাসীর, আর্যরা নাকি দেশের লোককে ধর্ম-ধর্ম করে কেবল মালা জপতে শিখিয়েছেন। বিজ্ঞানে তাঁদের কোন জ্ঞানই ছিল না এমন কি প্রাচীন ভারতের মানুষ নাকি এটুকুও জানতেন না যে, পৃথিবী সূর্য্যের চারপাশে ঘুরছে। এ সত্যটাও তাঁদের শিখতে হয়েছে ইতালী আর গ্রীস দেশের কাছ থেকে। কিন্তু আমি একটু আগেই প্রমাণ করে দিয়েছি— মিঃ হাটীর এ-ধারণা ঠিক নয়। গ্যালিলিও এবং কোপার্নিকাসের জন্মের প্রায় এক হাজার বছর আগেই আমার দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্য্যভট্ট লিখে গেছেন যে, নিজের এক্সিস-এর ওপর ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী ৩৬৪দিন কয়েক ঘণ্টায় সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে তাঁর জন্ম লগ্ন থেকেই। তাকেই বলা হয় পৃথিবীর বার্ষিকগতি কেবল এইটুকুই নয়; জ্যোতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের আরও অনেক কিছু অবদান আছে। চন্দ্রের পৃথিবী প্রদক্ষিণ পথ অবলম্বন করে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানীরাই নক্ষত্রপুঞ্জকে সাতাশ ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। চন্দ্রের ভূ প্রদক্ষিণ পথ আবিষ্কার করেছিলেন এদেশের জ্যোতিবিদরা খ্রীষ্টপূর্ব্ব বারোশো অব্দে-একথা লিখে গেছেন সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক কোলব্রুক (Cole brooke)।' 'তুই নিজে পড়েছিস এসব কথা?' জটাধর এখনও বক্তৃতা মঞ্চ থেকে নামেন নি। তাঁর বলায় বাধা দিয়ে যে ছেলে তাঁকে থেমে যেতে বাধ্য করেছে, তাকে অপ্রস্তুত করতেই হবে জনসমক্ষে যেমন করেই হোক. এই তাঁর দৃঢ় সংকল্প মনে হয়।

জয়ন্ত কিন্তু সাধারণ স্বরেই জবাব দিল—'না, টাউনস্কুলের মাষ্টারমশাই ধর্মদাসবাবু আমাকে বলেছেন।'

'তোর সবই তবে অন্যের কাছ থেকে ধার করা বিদ্যা? কখনও বলছিস সূর্য্যপণ্ডিত, কখনও বলছিস ধর্মদাসবাবু,এতে তোর বাহাদুরীটা কোথায়?' 'বাহাদুরী আমি চাচ্ছি না মাষ্টারমশাই। আমি শুধু আপনার বলার মৃধ্যে যে ভুল হয়েছে,সেইটুকুকেই সবার সামনে তুলে ধরতে চাচ্ছি। আপনার মত আজকের অনেক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ও তাঁদের গ্রন্থে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, গ্রীকরাই বিশ্বের সমস্ত বিজ্ঞানের স্রষ্টা। অথচ গ্রীকরা নিজেরা কিন্তু এমন কথা কখনও বলেন না। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক নিয়ারকাস (Nearcaus) বলেন, গ্রীক চিকিৎসকরা সাপে- কামড়ানো মানুষদেরকে চিকিৎসা করে বাঁচাতে পারতেন না। কিন্তু ভারতীয় চিকিৎসকরা বাঁচাতে পারতেন। জগদ্বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসবিদ এরিয়ান (Arian) লিখেছেন—গ্রীকেরা অসুস্থ হলে হিন্দু চিকিৎসকদের শরণাপন্ন

হতেন। ভারতীয় চিকিৎসকরা আশ্চর্য উপায়ে চিকিৎসার দ্বারা সমস্ত রোগই আরোগ্য করতেন। সুতরাং প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানের মত চিকিৎসা- বিজ্ঞানেও যে ভারত কত উন্নত ছিল, তার প্রমাণ তো আপনি এই দুই গ্রীক ঐতিহাসিকের লেখা থেকেই জানতে পারছেন মাষ্টারমশাই'। ভেংচি কেটে বলে উঠলেন জটাধর—'জানতে পারছেন মাষ্টারমশাই! কাঁচকলা জানতে পেরেছি। আমি এসব কি জানতে চেয়েছি তোর কাছ থেকে? আমি জানতে চাই যন্ত্রবিজ্ঞানের কথা। সে ব্যাপারে তো ভারত ছিল ঢু ঢু-একেবারে লবডঙ্কা।'

দৃঢ় স্বরে জয়ন্ত কথা কইল এবার। বলল—' না। যন্ত্র বিজ্ঞানেও ভারত অনুন্নত ছিল না একেবারেই, তার প্রমাণ আমি দেবো এইবার। মণীষী ম্যাক্সমূলর বলেছিলেন—আমাদের উনবিংশ শতাব্দের মানুষেরও বিস্ময় উৎপাদন করতে পারে এমন সব তত্ত্ব বৈদিক যুগের হিন্দুরা আবিস্কার করেছিলেন (Heritage of India,cho.1) আলেকজাণ্ডারের সমসাময়ি একজন সুখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক লিখেছেন—মগধের সেনাপতি বজ্র ও বিদ্যুতের ঘুর্ণি সৃষ্টি করে দূর থেকে গ্রীক সেনাবাহিনীকে পুড়িয়ে মেরেছিলেন বলে আলেকজাণ্ডার ভয় পেয়ে মগধ আক্রমণ না করেই পালিয়ে যান (জ্ঞানেন্দ্রোমোহন দাস রচিত বাংলা ভাষার অভিধানে 'বজ্র' শব্দের টিপ্পনী)। বজ্র বিদ্যুতের ঘূর্ণি সৃষ্টি করতে যন্ত্রের দরকার হয় না মাষ্টারমশাই? ম্যাক্সমূলর, গ্রীক ঐতিহাসিক-সবাই কি বাজে কথা লিখে গিয়েছেন? দিল্লীতে চন্দ্ররাজের যে লৌহস্তম্ভটি রয়েছে,যার থেকে দেড় হাজার বছরেও মরচে কলঙ্ক লাগে নি কোথাও, সেই চল্লিশটন ওজনের,লৌহ পিণ্ডকে ঢালাই করবার এবং বসাবার মত যন্ত্রও নিশ্চয়ই সে যুগেঁ ছিল। কয়েক বছর আগে ভরদ্বাজ প্রণীত 'যন্ত্রসর্বস্বম' গ্রন্থটি আবিস্কৃত হওয়ার পর প্রাচীন ভারতের বিমান-বিদ্যা সম্বন্ধে চাঞ্চল্যকর অনেক তথ্য আমরা জানতে পেরেছি, টাউন স্কুলের পণ্ডিতমশাই আমাকে বলেছেন। বিমান বিদ্যা কি যন্ত্র বিজ্ঞানের উন্নততম একটি বিদ্যা নয় মিঃ হাটী।'

কলেজ প্রাঙ্গণে সমবেত বিরাট শ্রোতৃকুল নীরব, উৎকর্ণ। লেদব্রিজ একটি ভ্রু তুলে, গালে হাত রেখে মন দিয়ে শুনছেন জয়ন্তের কথাগুলো।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জয়ন্ত আবার বলতে আরম্ভ করলো—'এইবার আসুন আমার সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থ বাল্মিকী- রামায়ণের দিকে আমরা একবার তাকাই। সেখানে ভারতীয় যন্ত্র বিজ্ঞান সম্পর্কে কি লেখা হয়েছে দেখা যাক। অযোধ্যাপুরী সম্বন্ধে সেখানে বলা হয়েছে ঐ নগরী সবর্বযন্ত্র এবং আয়ুধে পূর্ণ ছিল। ছিল শত শত শতঘ্নী অস্ত্রে সজ্জিত, বিমান-গৃহ শোভিত। শতঘ্নী অস্ত্র আর বিমান—এই

দুই তো বৈজ্ঞানিক দক্ষতায় সৃষ্ট যন্ত্রেরই বিভিন্ন রূপ। ঋগ্বেদ ভেতরেও বিমানের সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে। ঋগ্বেদ বলছে—হে রথ-নির্মাতৃগণ, আমরা তোমাদের নমস্কার করি। কেন না, তোমরা চক্রশোভিত, অশ্ববল্গা বিরহিত, জলস্থল-অন্তরীক্ষে ভ্রমণকারী রথসমূহ নির্ম্মাণ করছো। রাবণের পুষ্পক আর ইন্দ্রজিতের বিমান সবারই পরিচিত। যন্ত্র-ব্যবহারের আরও বর্ণনা পাবেন, যদি রাবণের লঙ্কাপুরীর দিকে তাকান। রামায়ণ বলছে— লঙ্কাপুরীর প্রাচীরের ওপর মহাশক্তিশালী ইষুপাল-যন্ত্র বসানো ছিল– যা দিয়ে আক্রোমণোদ্যত্ত শত্রুসৈন্যদের অগ্রগমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো। ওদিকে আবার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে লঙ্কার সেতু বাঁধা হল। কেমন করে তা সম্ভব হ'ল? সম্ভব হয়েছিল তা—ঐ সেতু বাঁধার কাজে যন্ত্রের ব্যবহার হয়েছিল বলে। রামায়ণ বর্ণনা দিচ্ছে- সেই মহাকায় বানর সৈন্যরা হাতীর মত আকার বিশিষ্ট প্রস্তর খণ্ড এবং পর্বতসমূহ যন্ত্রের দ্বারা উৎপাটিত করে, যন্ত্রের দ্বারাই পরিবহণ করে আনছে—পবর্বতাঞ্চ সমুৎপাত্য যন্ত্রৈঃপরিবহন্তি চ(লঙ্কা কাণ্ড,২২শ সর্গ)। এর থেকে কি মনে হয় না—আধুনিক ক্রেন যন্ত্রের মত যন্ত্র সেই প্রাচীন যুগেও ছিল। এখন আশাকরি আপনি বুঝতে পারছেন মাষ্টারমশাই, আমাদের ঋষিরা কেবল ধর্ম ধর্ম করতেই শেখান নি দেশের লোককে— তাঁরা বাস্তবাদেও ভারতকে চরম উৎকর্ষের পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবার আমরা বিচার করে দেখবো—রামায়ণের কুম্ভকর্ণ-প্রসঙ্গ থেকে আমরা কোন সূক্ষ্ম যন্ত্রের ইঙ্গিত পাই কিনা। এ বিচার করতে হবে বিশেষ ধৈর্য্য আর খোলা মন নিয়ে। কুম্ভকর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলে বিভীষণ রামচন্দ্রকে বুঝাচ্ছেন— বানররা কুম্ভকর্ণের বিরাট দেহ দেখেই ভয়ে পালাতে শুরু করবে। সুতরাং আপনি আর কালবিলম্ব না করে বানর-সৈন্যদের মধ্যে প্রচার করে দিন যে, কুম্ভকর্ণ মানুষ নয়, ওটা একটা যন্ত্র। এ যন্ত্র বাবিষ্কার করেছে রাবণ আমাদের সৈন্য ধবংস করবার জন্যে- উচ্যতাং বানরাঃ সর্বে যন্ত্র মেতৎ সমুচ্ছিতম্। ইতি বিজ্ঞায় হরয়ো ভবিষ্যন্তীহ নির্ভয়াঃ।। (লঙ্কা কাণ্ড, ৬১সর্গ)। এইবার বিচারের পালা। বানর সেনাপতিরা সকলে যে যন্ত্র পরিচালনা-বিশারদ ছিলেন তার প্রমাণ আমরা বহু জায়গাতেই পাই রামায়ণে। সেই যন্ত্র-বিশারদের যখন বলা হচ্ছে কুম্ভকর্ণ একটা যন্ত্র বিশেষ, তখন এরই থেকে এটা কি ধরে নেওয়া যায় না যে,সে যুগে এমন যন্ত্র ছিল যা সবাক, স্বয়ংক্রিয় এবং মানুষের মত ঘোরা- ফেরা করতে পারতো? যদি সেরকম কোন যন্ত্রের পূবর্বঅভিজ্ঞতা যন্ত্রবিশারদ বানরদের নাই থাকবে,তাহলে কুম্ভকর্ণকে যন্ত্র বলে বিশ্বাস করাবে তাদের কেমন করে?'কলেজপ্রাঙ্গণ স্তব্ধ নিথর। এইটুকু একটা ছেলের থেকে এমন আশ্চর্য্য সব কথা শুনে সবাই স্তম্ভিত। লেদব্রিজ প্রশ্ন করলেন—'তুমি কি বলিটে

চাও, রামায়ণের পিরিয়ডেও রোবোট জাতীয় কিছু আবিস্কৃত হয়েছিল ভারতে বিজ্ঞান তখন এত উন্নত ছিল?' 'সেইরকমই তোমার মনে হয় প্রেসিডেন্ট স্যার। আজকের অত্যাধুনিক যন্ত্র বিদ্যা,24 Chromosomes থেকে মনুষ্যদেহের উৎপত্তি কথা বলছে। প্রাচীন যুগের চিকিৎসাবিজ্ঞানী চরক এবং সশ্রুতার্য তাকেই প্রকারান্তরে তাঁদের চতুর্বির্বংশতি- তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। আচার্য্য জগদীশ বসুর জন্মের অনেক অনেক আগে বিক্ষ এবং উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে লিখে গেছেন মনু— অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্তোতে সুখ-দুঃখ সমন্বিতাঃ। বৃক্ষ এবং উদ্ভিদ্দের ভেতরেও জ্ঞান আছে, সুখ-দুঃখ বোধও আছে। এসব থেকেই কি প্রমাণ হয় না-সুদূর অতীতে আমার দেশ কেবল ধর্মর্চ্চাই করে নি, বিজ্ঞানেও সে শিশু ছিল না। তাই যদি না হবে, তবে রামায়ণের সীতার মুখ থেকে ঐ বিস্ময়কর কথা বের হল কেমন করে? সীতা চিন্তিত হয়ে বলছেন— নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রামচন্দ্র লংকায় উপস্থিত না হলে শলাকৃৎ যেমন ভাবে গর্ভিনী নারীর দেহে অস্ত্রোপ্রচার করে সন্তান প্রসব করায়, তেমনি করে এই অনার্য্য রাক্ষসরাজ আমার দেহ খণ্ড বিখণ্ড করবে (রামায়ণ, সুন্দর কাণ্ড২৮শ সর্গ)। তাহলে রামায়ণের যুগে শল্যবিদ্যার কতটা উন্নতি হয়েছিল ভেবে দেখুন। সীতা জানতেন সীজারিয়ান ডেলিভারীর কথা। ঋগ্বেদ আবার বলছে— ত্বরসেমাং যোনিবত শচকর্থ; হে ইন্দ্র, তুমি অকন্যাকে কন্যা করতে পারো। তার মানে আধুনিক কালের মত সে যুগেও লিঙ্গ পরিবর্তনের পন্থা জানা ছিল ভারতীয় বিজ্ঞান-বিদ্দের। এমনই আরও অজস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় মিঃ হাটী, কিন্তু তাতে এখানকার শ্রোতা যাঁরা তাঁদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতে পারে তাই শেষ করার আগে আর একটিমাত্র বস্তুর উল্লেখ আমি করবো— সেটি হচ্ছে ব্রহ্মাস্ত্র। এই ব্রহ্মাস্ত্রটি কি জাতীয় অস্ত্র? এটা কি আজকের অ্যাটম বম্ জাতীয় একটা অসম্ভব বিধবংসী শক্তি সম্পন্ন কিছু ছিল? তাই যদি না হবে, তবে, যখন মেঘের আড়ল থকে যুদ্ধ-কর। ইন্দ্রজিতের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের কাছে অনুমতি চাইলেন বহ্মাস্ত্র নিক্ষেপের, তখন রামচন্দ্র উত্তরে কেন বললেন—ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলে একা ইন্দ্রজিৎই মরবে না, ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপের ফলে বিশ্ব ধবংস হবে। এক ইন্দ্রজিতের জন্যে তুমি বিশ্ব ধবংস করতে পারো না' এই বলে ক্ষণেকের জন্য নীরব হল জয়ন্ত। পরে, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের দিকে চেয়ে আবার বলল সে, ' আজকের আসরের সভাপতি আমি যেটুকু উত্তেজনা প্রকাশ করে ফেলেছি, তার জন্য ক্ষমা চাইছি। মিঃ হাটী বলেছিলেন— প্রচীনকালে ভারতে কেবল কাব্য, ধর্ম, দর্শনেরই কিছু প্রগতি হয়েছিল। বিজ্ঞানে সে সারা পৃথিবীতে ছিল নাকি একটি শিশু মাত্র। এখন যা কিছু আমি বললাম— তা কেবল মিঃ হাটীর ঐ সত্য ভাষণের

প্রতিবাদ করতেই। তাঁকে অসম্মান করার জন্যে নয়। আশা করি মিঃ হাটীর সস্নেহ ক্ষমা থেকেও আমি বঞ্চিত হবো না। 'তিনি মাষ্টারমশাই তাই তিনি আমার নমস্য।'

দশ

অন্যদিন সন্ধ্যার একটু পরেই ফিরে আসেন জাজেস্ বাংলো থেকে মনোরমা। আজ ফিরলেন প্রায় রাত্রি নটায়। একটু অবাক হলেন পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হরিহরগাঙ্গুলী। অপর্ণার প্রাইভেট টিউটর অনেক্ষণ চলে গেছেন পড়ানো সাঙ্গ করে। মেয়েটা বারবার জিজ্ঞেসা করছে—'মা এত দেরী করছে কেন বাবা?' জবাবটা হরিহরবাবুর জানা ছিল না, তাই তিনি নীরবেই ছিলেন। এখন কন্যা ঘুমে ঢলে পড়েছে টেবিলে মাথা রেখে। পরিচারিকা,পাচিকার সব অনুরোধকে তুচ্ছ করে সে অপেক্ষা করছে মা'র আগমন মুহূর্তের জন্যে। মা এলে তবে খাবে, তার আগে খাবে না কিছুতেই।

নয় দশ বছরের ঐ একটিমাত্র সন্তান হরিহরবাবুর। ওর জন্যে সাধারণ টিচার ছাড়াও গান, এসরাজ আর নাচের মাষ্টারও রেখেছেন তিনি কন্যারই উৎসাহে। গান আর নাচে অর্পণার সুখ্যাতি এখন স্কুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে শহরের নানা প্রতিষ্ঠানে গিয়েও পৌঁছেছে। উৎসব পাবর্বনে ওর নিমন্ত্রণ আসে চারিদিক থেকে, কোথাও গানের, কোথাও বা নাচের জন্যে। কিন্তু রূপের খ্যাতি ছড়িয়েছে বোধহয় তার চেয়েও বেশী। কুচকুচে কালো কোঁকড়া চুল কোমর পর্য্যন্ত ছড়ানো। দুধে আলতায় গায়ের রং চোখ তো নয়, যেন দুটি আকাশপ্রদীপ। উজ্জ্বল, শান্ত, গভীর। ভ্রূ, নাক, থুতনী সবই যেন কুমোরের হাতে তৈরী বলে মনে হয়। কত বড় বড় পরিবারের গৃহিণীরা মেয়ের রূপের ছটায় মুগ্ধ হয়ে— মনোরমার হাত দুখানি চেপে ধরে মিনতি জানিয়েছেন। বলেছেন—'এ মেয়ে যে ঘরে যাবে, সে ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকবেন চিরদিন। একে আমার ছেলের বৌ করতে দেবে দিদি?' শুনে একটু হেসে উত্তর দিয়েছেন মনোরমা—'উপায় নেই ভাই। জজ সাহেবের গিন্নির সঙ্গে অনেক বছর আগে কাশীর গঙ্গায় একবুক জলে দাঁড়িয়ে গঙ্গাজল পাতিয়েছিলাম তো! যদি তার ছেলে রাজী হয়, তবে হেমাঙ্গিনী দিদি বলেছে, নিশ্চয়ই জয়ন্তের সঙ্গে বিয়ে দেবেই অপর্ণার। অপুও তো জয়দা বলতে পাগল। আমাদের দুজনার গঙ্গ লের সম্পর্ক আরও মধুর, আরও সুন্দর হয়ে উঠবে—যদি আমরা এই দুই ছেলেমেয়ের চারহাত এক করতে পারি।' এই পর্য্যন্ত বলে প্রতিবারই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছেন মনোরমা। তারপর চিন্তাবিঘ্নিত কণ্ঠে আবার বলেছেন—

ঈশ্বরের কি যে ইচ্ছে কে জানে। অমন হীরের টুকরো ছেলে- তাকে জামাই করার মত ভাগ্য কি আমার হবে? যেমন মতিগতি—শেষ পর্য্যন্ত হয় তো বিয়েই করবে না জীবনে ছেলেটা। বড় ভয় হয়।

দোতলায় উঠে এসে অপর্ণাকে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোতে দেখে,মনোরমা পাচিকাকে ডেকে বললেন—'আমি একটু আটকে পড়েছিলাম না হয় আজ জজ সাহেবের বাড়ীতে, তোমরা তো ছিলে সবাই মেয়েটা না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো—একবার দেখলেও না।'

মনোরমার গলার স্বর শুনে হরিহরবাবু নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন—'ওরা অনেকবার বলেছিল ওকে খাবার জন্যে। ও যে রাজী হল না। বলল—তুমি ফিরলে তবে খাবে।' পাচিকা প্রস্থান করল, হরিহরবাবু শুধালেন—'তা তোমার আজ এত দেরী হল যে ফিরতে?'

এক গাল হেসে মনোরমা বললেন—'আজ হেমাঙ্গিনী দিদির কাছ থেকে একটা কথা আদায় করতে পেরেছি জানো?' 'কি কথা?'

'হেমাঙ্গিনী দিদি আজ কথা দিয়েছেন— কার্তিক মাসে অপর্ণার জন্মদিনে এবছর জয়ন্ত নিজের হাতে একটা আংটি পরিয়ে দেবে আমাদের অপুর অঙ্গুলে।'

বলে, পরম স্নেহে ঘুমন্ত কন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন অপর্ণার মা। হাসতে হাসতে হরিহর বললেন—'বামুণ হয়ে খৃশ্চান প্রথায় এনগেজমেন্ট' রিং-এর আয়োজন করেছেন নাকি জজগিন্নী তাঁর গঙ্গাজল-সখিকে খুশি করতে?' মেয়ের মুখের ওপর থেকে চোখ না তুলেই মনোরমা বললেন—'বামুন-খ্রীষ্টান প্রথা-টথা আমি কিছু জানিতে চাই নে। মেয়েটার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি কিছু একটা করে রাখতে চাই। এমন প্রতিভাশালী ছেলেকে হাতে পেয়েও রাজী নই আমি হারাতে। জয়ন্ত দশজনের একজন হবেই একদিন। তাছাড়া,লক্ষ্য করে দ্যাখো না—জয়ন্তের সঙ্গ পেলে অপু আর কিছু চায় না? ওদের দুটিকে মানাবেও চমৎকার।' হাসতে হাসতেই পুনশ্চ কথা কইলেন হরিহর—'তোমরা মেয়েরা বিয়ে নিয়ে ভাবতে বড় ভালোবাসো। এক রতি একটা মেয়ের বিয়ের চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছো এখন থেকেই? দাঁড়াও, ওরা পড়াশোনা শেষ করুক, আরও বড় হোক।'

'বিয়ে তো হবে বড় হওয়ার পরেই। এখন থেকে ঠিক করে রাখতে দোষের কি আছে?'

'আমার কিন্তু অন্যরকম মনে হচ্ছে'......ঠোঁটের কোণে লঘুহাসিটুকু লুকোবার চেষ্টা করে হরিহর বললেন—'আমার তো মনে হচ্ছে, পারলে— এখনই তুমি অপু জয়ন্তের বিয়ে দিতে পারো সানাই বাজিয়ে।' বলেই হো হো করে হাসতে

হাসতে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন তিনি।

মনোরমা তাড়াতাড়ি এবার ঘুম ভাঙ্গাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন অপর্ণার। অন্যদিন আটটার মধ্যেই খেয়ে নেয় রাত্রির আহার মেয়েটা। নিশ্চই খিদেতেই ঝিমেয়ে পড়েছে আজ। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতেই ডাকলেন, 'অপু, অপু মা,মামনি! চোখ খুলে মাকে দেখে হাসলো অপর্ণা।

'খাবে না মামনি?' মনোরমা শুধালেন।

অভিমানের সুরে অপর্ণা উত্তর দিল—'না। তুমি আজ এত দেরী করে এলে কেন? আমার বুঝি খিদে পায় না?' ঘুম পায় না?

'আর কখনো দেরী করবো না। আজকের মতো খেয়ে নাও লক্ষ্মী মেয়ে!'

খাওয়া শেষ হলে, মেয়েকে তার শয্যায় শুইয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, কপালে একটা স্নেহ চুম্বন দিয়ে, পুলকোচ্ছল কণ্ঠে মনোরমা বললেন—তোর 'জন্মদিনে এবার একটা মজার কাণ্ড হবে, দেখিস।'

উৎসুক চোখ তুলে অপর্না শুধুল—'কি হবে,মা?'

'পরে বলবো একসময়।'

'না, মা, এখনই বলো।'

মনোরমা হেমাঙ্গিনীদেবীর বলা সমস্ত কথা বিশদভাবে শোনালেন কন্যাকে। সব শুনে, অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো অপর্ণা জননীর মুখের দিকে। তারপর পুনশ্চ জানতে চাইল—' আমার হাতে জয়দা আংটি কেন পরাবে, মা?' মা হাসলেন। বললেন সেই যে তোকে গল্প বলেছিলাম শকুন্তলা আর দুষ্মন্তের। মনে নেই—মুনির আশ্রমে দুষ্মন্ত শকুন্তলার হাতে একটা আংটি পরিয়ে দিয়েছিল। পরে সেই আংটি অভিজ্ঞানের জোরেই শকুন্তলা দুষ্মন্তের রাণী হতে পেরেছিল। তুইও হয়তো এই আংটির দৌলতেই একদিন জয়ন্তের বৌ হতে পারবি।'

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল অপর্ণার কান-মুখ। কিন্তু চোখে যে বিচ্ছুরিত হল খুশির দ্যুতি—সেটা সে লুকোতে পারলো না মায়ের দৃষ্টি থেকে। আনন্দের আবেগে কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মনোরমা বলে উঠলেন, 'দিদির মেয়ে নেই, সে ছেলে দিয়ে আমার এই সুন্দরী অপুমাকে পাবে। আর, আমার ছেলে নেই, আমি দিদিকে আমার মেয়ে দিয়ে অমন সোনার ছেলেকে আপন করে নিতে পারবো। আজ যে আমার কী আনন্দের দিন—তা কেমন করে বুঝাবো।' এর পর দুজনের কারও মুখেই কোন কথা ফুটল না অনেকক্ষণ। শেষে নীরবতা ভঙ্গ করলেন জননীই। বললেন—পূজো তো এসেই গেল। পূজোর ছুটিতে দশ বারো দিনের জন্যে জজ সাহেব জয়ন্তকে নিয়ে যাবেন শুনলাম উত্তর কাশীতে। সেখান

থেকে ফিরতে ফিরতেই কার্তিক মাস পড়ে যাবে। সেই কার্তিকে-ই তোর জন্মদিন। আর ক'দিনই বা বাকী।'

এগারো

হেমাঙ্গিনী দেবীর পিতা জমিদার অম্বিকানাথ পাবনা জেলার পোতাজিয়া থেকে পত্রে সকন্যাকে লিখেছেন—গত বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীর দুর্গোৎসবে মোষ এবং পাঁঠা বলি দেওয়া হইয়াছে। ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম—শ্রীদুর্গা স্বয়ং বলিতেছেন-আমার পূজার নামে সর্বপ্রকার রক্তপাত বন্ধ কর। আমি সেই মাতৃ আদেশ শিররাধার্য করিয়াছি । এই বৎসর হইতে পোতাজিয়ার বাড়ীর দুর্গোৎসবে আর কখনও কোন পশু বলিদান হইবে না এইবারই এই রক্তপাতহীন দুর্গাপূজার প্রথম বর্ষ। অতএব আমার খুবই ইচ্ছা—এবছর তুমি শ্রীমান জামাই বাবাজীবন এবং অপুদিদিমণিকে সঙ্গে লইয়া পূজার সময় পোতাজিয়ায় উপস্থিত থাক। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

স্বামী স্ত্রী বড়ই বিপদে পড়লেন। মহালয়ার পরেরদিন স্ত্রী-পুত্রসহ সূর্য্যকান্তের যাত্রা করার কথা হরিদ্বার অভিমুখে। হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশ হয়ে তাঁরা যাবেন উত্তর কাশী—যেখানে বাস করেন সূর্য্যকান্তের বাল্যবন্ধু মহাপ্রজ্ঞাবান সন্ন্যাসী শ্রীমৎ দ্বারকানাথজী। ফার্ষ্টক্লাসের একটা পুরো কম্পাটমেণ্ট রিজার্ভ করিয়াছেন জজ সাহেব। পত্র পাঠান্তে হেমাঙ্গিনী গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন। সূর্য্যকান্ত বললেন—'দ্বারকার কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি জয়ন্তকে যেদিন, সেদিন থেকেই ও তো পাগলের মত দিন গুনতে শুরু করেছে— কবে যাবে উত্তর কাশীতে। আমায় কথা দিয়েছিলে, যত দিন না দ্বারকার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, ততদিন সে কোন কূয়ো বা গর্তে আর নামবে না সে কথা ও রক্ষাও করে চলেছে। এখন আমার দেওয়া প্রতিশ্রুতি আমি ভাঙ্গবো কেমন করে।

'তোমার সন্ন্যাসী বন্ধু পারবেন তো জয়ের পাতাল-পাগলামি দূর করতে?' মনোরমা জিজ্ঞেসা করলেন স্বামীকে।

'ঠিক এই প্রশ্ন করে আমিও চিঠি লিখেছিলাম দ্বারকাকে। জবাবে দ্বারকা জানিয়েছে—তোমার বাবাগিরির কথা ভুলে তুমি যদি আমায় পূর্ণ স্বাধীনতা দাও, তবে নিশ্চয় আমি তোমার ছেলের এই পাতাল রোগ নিরাময় করতে পারবো। তোমার পত্র পড়ে বুঝতে পারছি—এক অসাধারণ পুত্রের জনক হয়েছো তুমি। এতটুকু বয়সে পাতাল-প্রশ্ন নিয়ে এমন ব্যাকুল হতে কাউকে শুনিনি এর আগে।

অসাধারণ এক প্রতিভার মনের খিদে মেটাতে তোমাকেও অসাধারণ ত্যাগ আর ধৈর্য্যের পরীক্ষা যে দিতেই হবে, ভাই। তারই জন্যে নিজের মনকে তৈরী রাখো।'

মনোরমা অনেক ভেবে শেষে বললেন বাবা এত করে লিখেছেন এবছরেযেতে, আমার অন্ততঃ যাওয়া একান্ত উচিৎ না হলে বাবা মনে কষ্ট পাবেন। রিজার্ভেশন যেমন আছে, থাক। তুমি মহালয়ার পরের দিনই রওনা হও উত্তর কাশীর দিকে। আমি 'গঙ্গাজল' আর অপর্ণাকে নিয়ে পোতাজিয়ায় যাই।'

সূর্য্যকান্ত খুশী হলেন না একেবারেই পত্নীর এ প্রস্তাবে—সেটা তাঁর মুখের ভাব দেখেই বোঝা গেল। মনোরমা লক্ষ্যও করলেন সে-ভাব। স্বামী চিত্তে স্বস্তি আনতে তিনি যুক্তি দেখালেন—'এ ব্যবস্থা ছাড়া আমাদের আর যে কোন উপায় নেই গো! হিমালয়ের অতবড় তীর্থ উত্তর কাশীতে যাবো—সে ইচ্ছে কি আমার মধ্যেই কম? কিন্তু আমি চাই জয়ের মন পাতাল প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজে পাক। ওর কূয়ো আর গর্ত্তে নামা বন্ধ হোক। সবসময় আজকাল ভয়ে কাঠ হয়ে থাকি আমি—কখন ছেলেটা পাগলামি করে আবার কোন গভীর গর্ত্তে নেমে জীবনটাকে বিপন্ন করে তুলবে কে জানে! তাই ওকে নিয়ে তোমায় যেতেই হবে তোমার বন্ধুর কাছে। দ্বারকানাথজীর ঐ কথাটা কিন্তু বিদ্যুতের ঝিলিক এনেছে আমার প্রাণে। উনি তোমায় লিখেছেন—অসাধারণ এক প্রতিভার মনের খিদে মেটাতে তোমাকেও যে অসাধারণ ত্যাগ আর ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতেই হবে। তোমার আমার একসঙ্গে উত্তর কাশী না যেতে পারার মধ্যদিয়েই বোধহয় শুরু হবে আমাদের সেই ত্যাগ আর ধৈর্য্যের পরীক্ষা।

২৬শে সেপ্টেম্বর উত্তরকাশী যাত্রার দিন ধার্য হয়েছে। স্বামী পুত্রকে নির্বিঘ্নে যাত্রা করিয়ে দিয়ে, পরের দিন মনোরমার পিতৃগৃহে রওনা হওয়ার কথা। পোতাজিয়া থেকে লোকও এসে গেছে মনোরমাকে নিয়ে যেতে। তাঁর অক্ষয়কাকার বড় ছেলে অনিল। এই দুর্দ্দান্ত ছেলেকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করতে চান না জজগৃহিণী, কোনদিন করেনও নি তা। আজ পরিস্থিতি তাঁকে বাধ্য করেছে জয়ন্তকে এমনিভাবে ছেড়ে দিতে—কিন্তু বুকের ভেতরটা তাঁর গুমরে গুমরে উঠছে বারবার। সন্ধ্যায় মাষ্টার পড়াতে এসেছিলেন, জয়ন্ত আজ আর পড়ে নি একটুও, পড়বার মত মনের অবস্থাও নেই তার, বাবা, মা, মাষ্টার—সবার সঙ্গে ই এখন কেবল পাতালের গল্প। খাওয়ার টেবিলে বসে জয়ন্ত জিজ্ঞেসা করলো—'অচ্ছা, বাবা,সন্ন্যাসী জ্যেঠু ঠিক পারবেন তো আমায় পাতালের নিয়ে যেতে। আমার বন্ধুবান্ধব সবাইকে কিন্তু আমি জোর গলায় বলেছি,আমি পাতালে যাচ্ছি। শুনে মাষ্টারমশাইরা হাসলেন, ক্লাস টেন-এর ছেলেটা টিট্‌কিরি কাটতে লাগলো।

আমি সবাইকে তবু শুনিয়ে দিয়েছি— পাতালে আমি যাবোই। অত বড় সন্ন্যাসী— তিনি কি মিথ্যে স্তোক বাক্য দিতে পারেন কখনও?'

এ আবার আর এক দুশ্চিন্তা। পাতাল-পাতাল করে একই দিনে ছেলের চোখ মুখের যা অবস্থা হয়েছে, শেষ পর্য্যন্ত দ্বারকানাথ সত্যিই যদি পাতালের নিশ্চিন্ত ঠিকানা কিছু একটা না দিতে পারেন, তাহলে জয়ন্ত যে কী কাণ্ড করে বসবে ফিরে এসে, তা এক ঈশ্বরই জানেন। তবু, পুত্রের প্রশ্নের উত্তরে সূর্য্যকান্ত বললেন—' আশা তো করছি তুমি এবার নিশ্চয় পাবে পাতালের সন্ধান। ভারততত্ত্বে দ্বারকানাথের গভীর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।' 'আচ্ছা বাবা, রামায়ণে আছে বিষ্ণুর বাহন গরুড়দেবের যে পুরী, তার কাছেই নাকি পাতালের রাজধানী। তাহলে গরুড়ও নিশ্চয় পাতালের কাছাকাছি কোথাও থাকতেন?' বিপদে পড়লেন জজসাহেব। বললেন—'আমি বলতে পারবো না।'সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল জয়ন্ত-হ্যাঁ বাবা, রামায়ণে তো সেইরকমই পড়েছি। রামায়ণে লিখছে,গরুড়-পুরীর পরেই বিশালজাত রূপশীল পবর্বত। এই পবর্বতের একেবারে উত্তর পূর্ব অংশে আছে যে দীর্ঘ বনভূমি তারই শেষ প্রান্তে হচ্ছে নাগরাজ বাসুকীর রাজধানী।

কি সবর্বনাস! রামায়ণের যুগের স্থান,পবর্বত মানুষের নাম করে করে ও মিলিয়ে নিতে চায় বাসুকীর রাজ্যকে। আজ দ্বারকানাথ কেমনভাবে সন্তুষ্ট করতে পারবেন এই ছেলেকে?

যাত্রার আগের দিন সন্ধ্যায় মায়ের হাত ধরে জজের বাংলোয় এলো অপর্ণা। লাল টকটকে সিল্কের ফ্রক পরেছে, চুলের দুই বেনীতে ঝুলছে লাল রিবনের ফুল। কপালে লাল টিপ। পায়ে লাল মোজা, লাল জুতো। একে তো আকর্ণ বিস্তৃত আঁখি, তাতে আবার কুচকুচে কালো কাজলের মায়া-টান পরেছে। যে দেখছে তাকে, আর চোখ ফেরাতে পারছে না।

অনেকক্ষণ বুকের মধ্যে চেপে ধরে আদর করলেন হেমাঙ্গিনী অপর্ণাকে, তারপর বললেন—'আজ তোমার হাতের আঙ্গুলের মাপ নেবো,মা। কাল সেঁকরাকে দিতে হবে।'

মুহূর্তে কান দুটো লাল হয়ে উঠল মেয়েটার। চোখ নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল একধারে। একটু হেসে হেমাঙ্গিনী শুধালেন—'কই জিজ্ঞেসা করছো না— কেন সেঁকরাকে তোমার আঙ্গুলের মাপ দিচ্ছি?'

মুখ তুলে অপর্ণা বলল—'আংটি বানাবে বোধ হয়।'

ঠিক ধরেছো। তোমার জন্ম দিনে এবার এই আংটি তোমার আঙ্গুলে পরিয়ে

দেবে তোমার জয়দা। কি? খুশী হবে তো?' মুখে কিছু না বলে,হেমাঙ্গিনীর বুকে মুখটা গুঁজে দিল অপর্ণা। পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে হেমাঙ্গিনী বললেন—'তুমি যে একদিন আমার ঘরের লক্ষ্মী হয়ে আসবে,মা!' ঘরে ফেরার আগে একবার জয়ন্তের পড়ার ঘরে উঁকি দিল অপর্ণা। একটা ইয়া মোটা বই দেখে কি সব যেন লিখে রাখছে তার খাতায় জয়ন্ত। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় মাথার চুলগুলো চকচক করছে তার। কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই,লিখেই চলেছে আপন মনে।

'অত কি লিখছো তুমি জয়দা?' অপর্ণা জিজ্ঞাসা করলো। খাতা থেকে মুখ না তুলেই জয়ন্ত উত্তর দিল—'নোট করছি রে। রামায়ণের পাতালে যাওয়ার পথের যে বর্ণনা আছে— সেটা পুরোটা তুলে নিচ্ছি আমার খাতায়। সন্ন্যাসী জ্যেঠুকে সব বলতে হবে তো!'

'সেই সন্ন্যাসী তোমাকে নাকি পাতালের খোঁজ দেবেনই এবার? তা তুমি কি পাতালে যাবেই?'

'যদি সন্ন্যাসী জ্যেঠু নিয়ে যান, নিশ্চই যাবো।'

'আমাকে সঙ্গে নেবে না? তুমি দেবেন মিত্তিদের বাগানে কূয়োতে পড়ে গিয়েছিলে, আমি তোমার বাড়ীতে খবর দিয়েছিলাম। এবারও আমায় সঙ্গে নিয়ে চলো, দেখবে, বিপদে এবারও আমি তোমার কাজে লাগবো।'

গম্ভীরভাবে জয়ন্ত বলল—'দাঁড়া আগে দেখে আসি পাতালটা কেমন জায়গা। তারপর তোকে তো নিয়ে যাবোই। তোকে আর মাকে পাতালটা না দেখাতে পারলে, আমার মনে আনন্দ আসবে কেমন করে?

বারো

ষ্টেশনে হেমাঙ্গিনী, মনোরমা আর অপর্ণার সঙ্গে হরিহরও গিয়েছিলেন জজ সাহেবকে গাড়ীতে তুলে দিতে। আর্দালী, পিওন, নাজির, সেরেস্তাদার,পেশকারের দৌড়াদৌড়িতে ষ্টেশন সরগরম। এটা জংশন ষ্টেশন। তাই ট্রেন এখানে দাঁড়ায় বেশ কিছুক্ষণ। কমপার্টমেন্টে তখন জয়ন্ত দাঁড়িয়ে মাসিমা এবং অপুর চোখের জলের ত্রিবেণীসঙ্গমে। এরই মধ্যে একান্তে রসিক হরিহরবাবু ফিসফিস করলেন সূর্য্যকান্তের কানে—'ছেলেটা না হয় নাবালক, পাতাল পাতাল করে পাগল হয়েছে, আপনি তো নাবালক নন জজসাহেব। কে না জানে ওসব পাতাল টাতাল কিস্যু নেই কোনও চুলোয়, ওটা কবিদের একটা কল্পনা। আপনিও সেই মরিচীকার পেছনেই ছেলেটাকে দৌড় করাচ্ছেন?'

সূর্য্যকান্ত হাসলেন। বললেন—এমন একটা ছেলের বাবা যে হননি সেটা আপনার সৌভাগ্য গাঙ্গুলী মশাই। হলে বুঝতে পারতেন— আমি ওকে দৌড় করাচ্ছি, না, ও আমাকে দৌড় করাচ্ছে। কূয়োর মধ্যে পড়ে বেঘোরে প্রাণটা দেবে! তার চেয়ে দেখিই না চেষ্টা করে—যদি সন্ন্যাসী ওর মনকে শান্ত করতে পারে।'

'কিন্তু সীতার যখন পাতাল প্রবেশ হল, তিনি তো ঢুকলেন মাটীর নীচে। আর আপনি যাচ্ছেন হিমালয়ের চুড়োয় পাতালের সন্ধানে—এটাও তো একটা অদ্ভুৎ ব্যাপার।

সাহারামপুরের সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার প্রসন্ন ব্যানার্জি জজ সাহেবের প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠী। বন্ধুকে দীর্ঘদিন পরে কাছে পেয়ে বাঁড়ুজ্জে মশায়ের আনন্দ আর ধরে না। স্ত্রী চন্দনাকে নিয়ে তিনি মেতে উঠলেন অতিথি সৎকারে। পনেরো বছর চাক্ষুষ দেখা হয় নি। চিঠিতেই যেটুকু যোগাযোগ। প্রথম দর্শনেই প্রসন্ন চিৎকার করে বলে উঠলেন চন্দনাকে—'আমার মাথায় টাক পড়েছে বলে তুমি দুঃখ করো। দেখছো, আমার বন্ধুটির মাথায় কত বড় টাক। তবু তাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে।'

তারপর জজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন,'তোর কোনো চিন্তা নেই রে সূর্য্য। তোর চিঠি পাওয়ার পরে আমি জীপ নিয়ে নিজে গিয়েছিলাম উত্তর কাশীতে চন্দনাকে সঙ্গে নিয়ে। তোর দেওয়া বর্ণনা মত—গঙ্গার ওপারে এক পাহাড়ী গুম্ফায় দ্বারকানাথজীর সঙ্গে দেখাও করে এসেছি। একটু বাজিয়েও দিখেছি। সত্যি,ইন্দোলজিতে ওঁর দেখলাম দারুণ পড়াশোনা। পাঞ্জাব-সিন্ধু ক্ষেত্রতে আমাদের থাকা ঠিক করে এসেছি।' একটু আশ্চর্য্য হলেন বন্ধুর কথায় সূর্য্যকান্ত।'আমাদের থাকা—মানে? তুইও যাচ্ছিস নাকি আমাদের সঙ্গে?'

'কেন যাবো না?' স্বামীর হয়ে জবাব দিলেন এবার চন্দনা, 'আপনার ছেলের দৌলতে আমাদেরও যদি পাতাল দর্শন হয়ে যায়। এ সুযোগ কি ছাড়তে আছে?'

প্রসন্ন জানালেন, দুটো জীপে আগামী পরশু রওনা হবেন তাঁরা ঋষিকেশ থেকে। একটা জীপে তাঁরা চারজন থাকবেন, অন্যটিতে যাবে মালপত্র এবং তাঁর চাকর, পিওন। ভোরে যাত্রা করলে উত্তর কাশীতে পৌঁছনো যাবে লাগ লাগ সন্ধ্যায়।'

ঠিক তাই হ'ল। নরেন্দ্রনগর,টিহেরী,ধরাসু হয়ে যখন উত্তর কাশীর মাটিতে পা রাখলেন সূর্য্যকান্ত তখন সন্ধ্যার আর খুব বেশী দেরী নেই। চারিদিকে চাপ চাপ সাদা মেঘ অভ্রলেহী কালো পাহাড়গুলোর গায়ে আটকে আছে। জননী যেন ঐ পাহাড় শিশু যেন পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় জননীর কোল পেয়ে দুরন্ত দামাল শিশু যেন তার দুরন্তপনা ভুলে গেছে অতি অকস্মাৎ।

দীর্ঘ দশ-এগারো ঘন্টার রাস্তায়,আশ্চর্য্য,জয়ন্ত কিন্তু একটা কথাও বলে নি। বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে চারিদিকের নিসর্গ-দৃশ্যাবলী সে কেবল দেখেছে অফুরন্ত ঐৎসুক্য নিয়ে। নিঃসন্তান চন্দনা ছেলেটাকে নিজের ঠিক পাশটিতে বসিয়ে, আপত্যস্নেহে একটি হাত জয়ন্তের পিঠে রেখে এসেছেন এতটা পথ।

আনন্দময়ী আশ্রমের ঠিক পরেই যে দোতালা বাড়ী, পাঞ্জাব সিন্ধ ক্ষেত্রর সেই অংশেই প্রবেশ করলেন ইউ-পি গভর্ণমেন্টের ডাকসাইটে সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার প্রসন্নকুমার ব্যানার্জি-সদলে। ক্ষেত্রর গাড়োয়ালী ম্যানেজার এসে স্বাগত জানালেন তাঁদের। ঠিক হল, পরদিন প্রত্যুষেই তাঁরা যাত্রা করবেন দ্বারকানাথের গুম্ফার উদ্দেশ্যে।

রাত্রের ঘুমোনোর আগে জয়ন্ত জিজ্ঞেসা করলো—'আচ্ছা বাবা যে পথ দিয়ে আমরা এলাম, সেটাই কি পাতালে যাওয়ার পথ?'

পুত্রের মাথার চুলগুলো নাড়তে নাড়তে সূর্য্যকান্ত বললেন-আমি তো তা জানি না, বাবা। কাল যাচ্ছই তো সন্ন্যাসী জ্যেঠুর কাছে, তাকেই জিজ্ঞেসা কোরো এ-প্রশ্ন।

এ যেন এক অন্য রাজ্য, না বাবা? এমন সুন্দর দেশ আমি কখনো দেখি নি।'

পরদিন কিন্তু হতাস হয়েই ফিরে আসতে হ'ল সূর্য্যকান্তবাবুকে। গঙ্গার ওপারে যে বাল্‌খিল পর্বত,তারই একটি গুম্পায় নিয়ে গিয়েছিলেন প্রসন্ন সকলকে। একটি অল্পবয়সী ব্রহ্মচারী জানালেন-দ্বারকানাথ গেছেন নচিকেতা-তাল-এ আর এক অসুস্থ সন্ন্যাসীকে দেখতে। ফিরবেন দুই দিন পরে। অতএব ফিরে আসতেই হল চার জনের দলটিকে। সূর্য্যকান্ত ব্রহ্মচারীকে বললেন—'নচিকেতা-তাল কতদূর? আমরা তো সেখানে গিয়েও দেখা করতে পারি দ্বারকাজীর সঙ্গে।'

পারবেন না। এটা বাল্‌খিল পর্বত। এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে নচিকেতা পর্বত। তার একেবারে ওপরে নচিকেতা তাল। অত চড়াই-এর পথে আপনারা যেতে পারবেন না।'

ফিরবার পথে প্রসন্ন বললেন—'যখন সাধুবাবার দর্শণ পাওয়া গেলই না, তখন চলো,আজ উত্তর কাশীটাই ভাল করে দেখে নেওয়া যাক। এই নিয়ে আমার তো চারবার আসা হল—উত্তরকাশীতে।' 'সেই ভাল,' সূর্য্যকান্ত বললেন,'তুমিই তাহলে গাইড-এর কাজটা করো।'

গঙ্গার এপারে ফিরে এসে প্রথমেই দেখালেন প্রসন্ন কালীকম্‌লীওয়ালার ধর্মশালাটা। তারপর নিয়ে গেলেন গঙ্গা তীরবর্তী একটি প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত প্রস্থর গৃহে। পাথরের ইঁটগুলো খসে ধবসে পড়ে আছে চারিদিকে। চারিধারে

ভাঙগাছের জঙ্গল। ছাত ভেঙ্গে পড়েছে। জানালা-দরজা সব উধাও। একটা অতি নীচু ঘরে কিছুটা চালার মত করে নিয়ে সেখানে বাস করছেন এক জরাজীর্ণ সাধু। বাড়ীটার মত তাঁরও মুমূর্ষ অবস্থা। প্রসন্ন জানালেন এখানকার বাসিন্দারা বলে, এইখানেই জড়ভরত তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

পথে চলতে চলতে একটা বেশ উঁচু মন্দির দেখতে পেয়ে জয়ন্ত শুধালো- 'ঐ মন্দিরে কোন ঠাকুরের পূজো হয় কাকু?' 'মহাদেবের। কাশীতে বিশ্বনাথ আছেন। এটা উত্তরের কাশী—উত্তর কাশী, এখানেও মহাদেব পূজিত হন তাই বিশ্বনাথ রূপেই। পুরাণতত্ত্ববিদ আর ঐতিহাসিক,যাঁরা শিবকে কেবলমাত্র দেবতা হিসেবে গ্রহণ না করে কৈলাস বা তিববতের এক মহাপ্রতিভাধর শক্তিমান মহাপুরুষ রূপে গণ্য করেন, তাঁরা বছরের পর বছর অনুসন্ধান চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মহাদেব কৈলাস থেকে যখন ভারতে নেমে আসতেন, তখন আসতেন তিনি কখনো ঘানাঘাটের পথে বদরী-কেদার হয়ে, কখনো নিতির পথে বদরী নারায়ণ হয়ে অলকানন্দার গতিপথ ধরে, আবার কখনো বা নে লাং-এর পথে এই গঙ্গোত্তরী উত্তর কাশী হয়ে। আর্য্যাবর্তে কাশীই ছিল শিব ভক্তদের প্রধান কেন্দ্র। শীতের অধিকাংশ সময় শিব অতিবাহিত করতেন ঐ কাশীতেই। তারপর বসন্তের শেষে আবার যখন ফিরে যেতেন স্বস্থান কৈলাসে,তখন অনেকবারই তিনি নাকি এসে আসন গ্রহণ করতেন হিমালয়ের এই দুর্গম উত্তর কাশীতে বেশ কিছুদিনের জন্যে। ভক্ত-শিষ্যদের উপদেশ দিতেন, ওষধি দিতেন, নানাজনের ব্যাধি নিরাময় করতেন। এসব ইতিহাস এখনও এখানকার জনশ্রুতিতে নাকি স্পষ্ট হয়ে আছে।'

ইঞ্জিনীয়ার সাহেব আবার পুরাণে পণ্ডিত হলো কবে হে?' জজসাহেব লঘুসুরে কথা কইলেন তাঁর প্রেসিডেন্সি কলেজের বন্ধুর উদ্দেশে।

'পুরাণ না জেনে আর উপায় কোথায় ভাই? পুরাণের দুই প্রধান নায়ক শ্রীরামচন্দ্র আর শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন এই ইউ পিতে। পুরাণ রচিত হয় যেখানে, সেই নৈমিষারণ্যও পড়েছে এই উত্তর প্রদেশের মধ্যেই। ইউ-পিতে চাকরী করতে এসে যদি পুরাণকে একটুও বুঝবার চেষ্টা না করি, তাহলে লোকে বলবে কি?'

হো হো করে হেসে উঠলেন সূর্য্যকান্তর সহপাঠীর যুক্তি প্রদর্শনে। বললেন,'বেশ করেছিস পুরাণ নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করেছিস। তোর জানা আছে বলেই তো আমরা জানতে পারছি কিছু উত্তর কাশী সম্বন্ধে তোর মুখ থেকে। এখন বলতো—ঐ যে মন্দিরের চূড়োয় ত্রিশূলের মত দেখতে পাচ্ছি, ওটাও কি শিবেরই মন্দির?'

না। ওটা শক্তি শূলের মন্দির। মহাদেবের হাতের ত্রিশূলের পূজো হয় ও

মন্দিরে। এখানকার বাসিন্দারা বলে, ঐ ত্রিশূল দিয়ে নাকি মহাদেব বধ করেছিলেন এক অসুরকে।'

জয়ন্ত এতক্ষণ কাকুর কথাগুলো যেন গোগ্রাসে গিলছিলো। প্রসন্ন নীরব হতেই, জুতো যোড়া খুলে রেখে দৌড়ে গিয়ে সে ঢুকে পড়লো শক্তি শূলের মন্দিরে। মিনিট কয়েক পরে ফিরে এসে শুধালো—শিব ঠাকুরের ত্রিশূল অতবড় ছিল কাকু? আচ্ছা কাকু, ত্রিশূলের নীচের দিকটা লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা যেখানটায়, কাপড় তুলে দেখলাম—কতকি সব লেখা আছে সেখানে। ওগুলো কোন ভাষায় লেখা কাকু?'

প্রসন্ন প্রমাদ গুণলেন। ছেলেটা তাঁকে পণ্ডিত ভেবে বসে আছে। তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, ' আমি ঠিক করে বলতে পারবো না তো! তবে,অনেকটা বাংলার মত অক্ষরে যেগুলি লেখা, সেগুলো সম্বন্ধে ভাষাবিদ ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলাম—ওগুলো কি বাংলা অক্ষর? চোখের ছানিতে তখন কষ্ট পাচ্ছিলেন সুনীতিবাবু। তিনি তাঁর সহকারী কাঞ্জিলালকে দিয়ে উত্তরে জানিয়েছিলেন, ঐ অক্ষরগুলো সিদ্ধ মাতৃকা হতে পারে।' উচ্ছ্বাসিত আবেগে জয়ন্ত বলল—'ছুঁয়ে এলাম বাবা সেই ত্রিশূল—একদিন দেবাদিদেব মহাদেবের হাতে যেটা শোভা পেত।'

উত্তর কাশীর প্রধান যে রাস্তাটি উজেলি হয়ে সোজা চলে গেছে ভাটোয়ারীর দিকে, নানা পথ ঘুরে সে রাস্তায় উঠে প্রসন্ন সামনের পর্বত শ্রেণীকে দেখিয়ে জয়ন্তকে জিজ্ঞেসা করলেন—'ঐ যে জঙ্গলে ভরা পর্বতশ্রেণী দেখছো— ওটার নাম জানো?'

'আমি কেমন করে জানবো?'

'নিশ্চয়ই জানো। রামায়ণ-মহাভারত এতবার পড়েছো যখন!'

'ওটা কোন পর্বত, কাকু?'

'বারণাবত।'

'বারণাবত পর্বত? মহাভারতে পড়েছি—এই বারণাবত পর্বতের কাছেই কোথায় যেন জতুগৃহদাহ হয়েছিল?'

'ঠিক বলেছো। উত্তরকাশীই হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে জতু অর্থাৎ গালার ঘর বানিয়ে পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তীকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল।' সেই জতুগৃহের ভগ্নাবশেষ আজও আছে। 'আছে?' মুহূর্তে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল ছেলেটা,'কোথায় আছে কাকু? চলো না, নিয়ে যাবে আমাকে সেখানে !'

'মাটি খুঁড়ে অনেক গালা মাখানো পাথরের ইট পাওয়া গেছে এ জতুগৃহে

ধ্বংসাবশেষ থেকে। এখন ওখানে দেখবার মত আছে একটি মন্দিরের মধ্যে একটি শিবলিঙ্গ। এই শিবকে পূজো কারতেন কুন্তীদেবী। এখানকার লোকেরা এই লিঙ্গ কে বলে লাক্সেশ্বর। হিন্দীতে আর সংস্কৃতে লাক্ষা উচ্চরণ লাক্সা। লাক্ষা মানেও গালা। জতু বা লাক্ষা দিয়ে তৈরী ঘরে এই শিবলিঙ্গ পূজিত হতেন, তাই তাঁর নাম আজও লাক্সেশ্বর মহাদেব। এই শিবলিঙ্গ কালের অমোঘ পরিণতিতে এখন ক্রমেই দেবে বসে যাচ্ছে নীচের দিকে। লিঙ্গটি সেই কারণেই বর্তমানে জলে ভরা। সেই জল স্যাঁৎসেতে ছোট্ট ভগ্নপ্রায় মন্দিরের গর্ভগৃহে,শিবলিঙ্গে মাথা রেখে রাত্রে নিদ্রা যান এমন আশ্চর্য্য এক মানুষ—যিনি সিপাহী যুদ্ধের সময় তেইশ বছর বয়সে লড়াই করেছিলেন বন্দুক নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে,হিমালয়ের এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও উলঙ্গ থাকেন যিনি।'

'গায়ে জামা কাপড় কিছু পরেন না? শীতকালেও?'

'কোন কালেই ওঁর দেহে কাপড় থাকে না। কারও সঙ্গে কথাও বলেন না।'

'আর খাওয়া দাওয়া? কে রেঁধে দেয় ওঁকে?'

'কেউ নয়। মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন উনি কিছুই খান না। তবু গভর্ণমেন্ট থেকে ওঁর জন্যে রোজ দুইসের দুধের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে, একজন সেবককে রাখা হয়েছে ওঁকে দেখাশোনার জন্যে। এত অর্দ্ধাশন–অনশনে থাকার পরও অবধূতের শরীর কিন্তু হয়েছে ভীমের মতন।'

সূর্য্যকান্ত বললেন—'বলিস কিরে? রাত্রে আমরা যখন তিন খানা কম্বল চাপা দিয়েও শীতে কাঁপি থরথর করে,ঐ বৃদ্ধ অবধূত তখন উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থাকেন ঐ জলে প্রায় ঢাকা শিবলিঙ্গে মাথা রেখে? এ তো চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা কঠিন। চল ভাই,ইনি নিশ্চই কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ। এঁকে দর্শন করতেই হবে আজ।'

'এঁর নাম রমানন্দ অবধূত। জতুগৃহে গেলেই এঁকে দেখতে পাবি। আমরা এখন সেই দিকেই চলেছি। তবে পথে উজেলিতে একবার থামবো। তোমাদের কৈলাসাশ্রমে নিয়ে যাবো একবার। ঐখানে উনবিংশ শতাব্দীর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্বামী বিবেকানন্দ এসে বাস করে গিয়েছেন কয়েকবার।

তেরো

'নচিকেতা তাল আবার কেমন জায়গা জেঠু? এ কেমন নাম?'দ্বারকানাথের দেওয়া তিলের খাজায় কামড় দিতে দিতে জয়ন্ত জিজ্ঞেসা করলো।

উত্তরে দ্বারকা বুঝিয়ে দিলেন, 'এ দেশে বড় দীঘি কিম্বা হ্রদকে বলে তাল। তাল শব্দ থেকেই হিন্দীর তালাও শব্দটির উদ্ভব। এই যে পাহাড় দেখছো,এটা ছাড়িয়ে বেশ কয়েক ঘন্টা হাঁটলে পাবে নচিকেতা পর্ব্বত। সেই পর্ব্বতের অনেক উপরে আছে নচিকেতা তাল। বড় মনোরম জায়গা পাহাড়ের অত উঁচুতে এতবড় একটা হ্রদের সৃষ্টি হল কেমন করে, ভাবতে বিস্ময় জাগে। যমদেবের সঙ্গে নচিকেতার কথাবার্তা হয়েছিল নাকি ঐ তালেরই ধারে,তাই ঐ তালের নাম রেখেছে প্রচীন যুগের এই অঞ্চলের অধিবাসীরা—'নচিকেতা তাল।'

সকাল আটটার মধ্যেই পৌঁছে গিয়েছিলেন সদলবলে সূর্যকান্ত সন্ন্যাসী বন্ধুর গুম্ফায়। বাল্য বয়সের দুই বন্ধু পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। প্রসন্ন এবং চন্দনাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন সন্ন্যাসী। আর,জয়ন্তকে অনায়াসে নিজের বুকের ওপর তুলে নিয়ে সস্নেহে চেপে ধরলেন তাকে বুকের মধ্যে। তারপর সূর্য্যকান্তের দিকে তাকিয়ে বললেন—'আজকের এই মুহূর্ত্তটির জন্যে আমি দিন গুণছিলামযে তোর পর পর কতগুলো চিঠি পাওয়ার পর এমন একটা আকর্ষণ অনুভব করছিলাম তোর ছেলেটার প্রতি যে, একবার ভেবেছিলাম—আমিই চলে যাই তোর কাছে। আজ সেই ছেলেকে পেলাম নিজের বুকে। বড় আনন্দের দিন রে আমার আজ। আজ তোরা সকলে এখানে খিচুরী ভোগ খেয়ে যাবি। কিরে? রাজী তো? কেউ জজ, কেউ ইঞ্জিনীয়ার—তোদের মুখে আবার আমাদের রান্না রুচলে হয়।' বলে হাসতে লাগলেন- দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পেশীবহুল দ্বারকানাথ। চন্দনা ফস করে বলে বসল,'যদি অনুমতি দেন, আজকে ভোগটা নাহয় আমিই রাঁধবো। আমি তো ব্রাহ্মণ।'

'আমার কাছে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ নেই। শিখা-সূত্র ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছি,আর এই সংস্কারটুকু ত্যাগ করতে পারবো না? আপনি ব্রাহ্মণ কিনা তা জেনে আমার কি হবে? অপনি মা। মায়ের আবার জাত আছে নাকি? মা তো ছেলেকে খাওয়াতে চাইবেই। বেশ তো, ইচ্ছা যখন হয়েছে, আপনিই রান্না করবেন। চন্দনার চোখ মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। খুশীতে ডগমগ হয়ে তিনি লেগে গেলেন ভোগের আয়োজন করতে। ব্রহ্মচারী যুবকটি বললেন, 'আমায় একটু সাহায্য করবেন, বাবা' হরিণের ছালের ওপরে কম্বলাসনে বসলেন দ্বারকানাথ-জয়ন্তকে পাশে নিয়ে, বললেন-'আমার ডেরাটা তোর কেমন লাগছে রে সূর্য্য? গুম্ফার চারিদিকে একবার ভালভাবে চোখ বুলালেন সূর্য্যকান্ত। পর্ব্বত কন্দরটি বেশ প্রসস্ত। ঢোকার মুখে বড় বড় পাথর এমন করে ঢেকে রেখেছে গুম্ফাকে যে,বাইরে থেকে ভেতরের কিছুই দেখা যায় না প্রায়। এক কোণে রান্না-খাওয়াদাওয়া সরঞ্জাম। কম্বলাসনে

অদূরেই একটি মোটা কাঠের আগুন ধিকি ধিকি জ্বল্ছে। গুম্ফার একেবারে শেষ প্রান্তে পুরু করে বিছানো খড়ের ওপর চারটে কম্বল পাতা। মনে হয়,ঐটাই সন্ন্যাসীর শয্যা। কন্দরের গায়ে পাথরের ফাঁকগুলো তাক-এর ব্যবহার করা হয়। সেই তাকের ওপর থাক্ থাক্ করে সাজানো। শয্যার পাশে এক কোণে-একটা বেহালা দাঁড় করানো। জজসাহেবের মনে পড়ে গেল-বেহালার ওপর দ্বারকার আশ্চর্য্য দখলের কথা। ছাত্রজীবনে দ্বারকানাথের বেহালা শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতেন শিক্ষকরা। সখ আজও অপরিবর্তিত রয়েছে দেখে খুশি হলেন মনে মনে সূর্য্যকান্ত।

জয়ন্তর দিকে চোখ বুলানো শেষ হলে বন্ধুর প্রশ্নের জবাব দিলেন তিনি-'আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোর ডেরায় দুই-তিন দিন থাকতে।'

পারবি নে-হাসতে হাসতে দ্বারকা বললেন, 'পারবি নে এখানে থাকতে জজসাহেব। এখান থেকে তিন মিনিটের-একটা ঝর্ণা। স্নান করতে,মুখহাত ধুতে-সেই ঝর্ণায় যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। পায়খানা যেতে হবে পাহাড়ের জঙ্গলে। খড়ের বিছানায় শুতে হবে কনকনে ঠাণ্ডায় রাত্রিতে,খেতে হবে-যা জুটবে তাই। তুই পারবি নে এত ধকল সইতে।' এই বলে একটু থেমে , জয়ন্তের দিকে চাইলেন দ্বারকা। তারপর বললেন, 'তার চেয়ে তুই বরং আজ রাতের মত রেখে যা তোর এই ঘর-পালানো ছেলেটাকে। পালিয়ে বেড়িয়ে গিয়ে অনেক ধকল সহ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ও। ও মনে হয় পারবে।'

বেশ তো থাকুক না জয়ন্ত আজ তোর কাছে। কাল আমরা আবার যখন আসবো,ওকে নিয়ে যাবো।

হঠাৎ বোধহয় চোখ পড়ে গেল জয়ন্তের,শয্যার পাশে রাখা বেহালাটার দিকে। সে বলে উঠল-'ঐ বেহালাটা কার জেঠু?'

' যখন যে বাজায় তার।'

'গীটার নেই? আমি একটু একটু গীটার বাজাতে পারি।'

'তাই নাকি? তবে তো দুদিনেই শিখে নিতে পারবে বেহালা। যাও না, একবার বাজাবার চেষ্টা করে দ্যাখো।'

এক লম্ফে উঠে গেল জয়ন্ত বেহালা বাজাবার চেষ্টা করতে। খড়ের শয্যার পাশে বসল সে বেহালাটা হাতে নিয়ে। স্কুলের ড্রিলমাষ্টার সুচাঁদবাবু একবার একটা বেহালা দিয়েছিলেন জয়ন্তকে। বলেছিলেন-গীটার তো শিখছিস,বেহালা বড় মিষ্টি বাজনা, এটাতেও একটু হাত লাগা না। তুই ঠিক পারবি। সেই দিন সুচাঁদবাবু একবারমাত্র দেখিয়েছিলেন-কেমনভাবে বেহালা ধরতে হয়, কেমনভাবে ছড় চালাতে হয়। কিন্তু,তারপর আর বেহালা বাজানোর সুযোগ পায় নি সে কোথাও।

আজ দ্বারকানাথ দিলেন আবার সেই সুযোগ। উৎসাহ আর পুলকে টগবগ করে করে ফুটে উঠতে লাগলো যেন জয়ন্ত।

ও উঠে যেতেই, সূর্য্যকান্ত সন্ন্যাসীকে চোখের ইসারায় ডেকে নিয়ে বাইরে চলে এলেন গুম্ফায়। শুধালেন তুই পারবি তো ভাই, ওর এই পাতাল রোগ সারাতে? রামায়ণে যেমন বর্ণনা আছে পাতালের পথের,ঠিক সেই বর্ণনা মিলেয়ে নিয়ে ও পাতালের সন্ধান চায়। পারবি তুই ওকে সন্তুষ্ট করতে?

'যদি না পারি?'

'সে এক ভীষণ কাণ্ড হবে। স্কুলে ক্লাস টেনের ছাত্রদের ও বলেছে,বলেছে মাষ্টারমশাইদের যে,ও পাতালের খোঁজ এবার পাবেই। এখন যদি হতাশ হয়,ও যে কী কাণ্ড বাধিয়ে বসবে,ভাবতেও ভয় হয়।'

বন্ধুর দুটো হাত চেপে ধরে মিনতির সুরে বললেন সূর্য্যকান্ত-'আমার এই একটিমাত্র সন্তান, ভাই। পাতাল দেখবার আশায়-যখন তখন গভীর গর্ত্তে,পুকুরে, কূয়োয় ও নেমে পড়ে। একবার তো এক কূয়োয় নেমে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। তুই চিঠিতে ভরসা দিয়েছিলি-ওর এই পাতাল-ব্যাধি তুই নিশ্চয় দূর করতে পারবি। আমার স্ত্রী অনেক আশা নিয়ে ওকে পাঠিয়েছে তোর কাছে। এই কচি প্রাণটা তুই বাঁচা ভাই।'

'মুখে যা বলবো সে কথায় বিশ্বাস না করে জয়ন্ত যদি দেখতে চায় পাতালপুরী, তখন তোরা,বাবা-মা-রা,ছাড়বি তো তোদের ছেলেকে আমার সঙ্গে।'

'তুই কি সত্যিই ওকে পাতালে নিয়ে যাবি?'

'যদি জয়ন্তের মনের ব্যাধি দূর করার জন্য যেতেই হয়,তাহলে যেতে হবে বৈকি!'

'সত্যিই কি পাতাল বলে তাহলে আছে কোথাও কিছু?' 'আছে। জানবি-রামায়ণে বাল্মিকী অলীক বর্ণনা দেন নি।'এই বলে,একটু থেমে,পুনশ্চ শুধালেন সন্ন্যাসী-'কই,আমার প্রশ্নের জবাব দিলি নে তো? যদি সত্যিই ওকে পাতালপুরী নিয়েযেতেই হয়,তখন আমায় বাবাগিরি ফলিয়ে বাধা দিবি নে তো?'

'জয়ন্তের ব্যাধি দূর করতে,তুই যা বলবি, আমরা তাই করবো।'

'আজ তোর ছেলেকে নিয়ে যা ওকে বেহালাটা বাজাতে দেবো। নিয়ে যাক, আমার হাতের বেহালা ওর কচি হাতের স্পর্শ পেলো। আমাদের পরিচয় পর্ব্ব সাঙ্গ হল। কাল বিকাল চারটেতে আয়। সোয়েটার,অলেষ্টার পরিয়ে আনবি, রাত্রে ও এখানে থাকবে। পাতালের সন্ধানটা আগে দিই জয়ন্তকে। তারপর,ও যদি নিজে থেকে দেখতে চায় পাতালপুরী,তখন নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে।'

'পাতাল পুরীতে নিয়ে যাবি বলছিস,পাতালপুরীটা যে কোথায় তা তো আমিই জানি না রে! সেখানে মানুষ যেতে পারে?'

বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন ছয়ফুটের ওপর লম্বা আর তেমনি চওড়া বুকের অধিকারী দ্বারকানাথ, 'পারে রে পারে। মানুষ যেতে না পারলে সেখানে তোর পুত্রটিকে নিয়ে যাবো কেমন করে। কাল তো তুইও আসছিস জয়ন্তের সঙ্গে, তুই তো কাল জানতে পারবিই-রামায়ণে বর্ণিত পাতাল পুরীটা কোথায়।'

পাঞ্জাব-সিন্ধু ছত্রের দোতলার কাঠের বারান্দায় একটা দড়ির খাটীয়ার ওপর বসে অনেক রাত পর্য্যন্ত চলল জয়ন্তের বেহালা বাজাবার চেষ্টা। সারেগামাটা কিছুটা মনে হয় তুলতে পেরেছে। কিন্তু অনভ্যস্ত হাতের ছড় থেমে যাচ্ছে বারবার। তবু চেষ্টার বিরাম নেই। জ্যোৎস্না প্লাবিত রজনী। পাঞ্জাব সিন্ধু ছত্র একেবারে গঙ্গার তীরেই প্রায় অবস্থিত। গঙ্গার ওপারে বালখিল পর্ব্বতের সবুজ গাছগাছালির ওপর নেমেছে সেই জ্যোৎস্নারই ঢল ঐ বালখিল পর্ব্বতেরই কোন এক কন্দরে বসে আছেন এখন শালপ্রাংশু মহাভুজ দ্বারকানাথ। হয়ত তিনি নিমগ্ন তাঁর সাধনায়। ভাবতেও বুকের ভেতরটা শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে উঠল জয়ন্তের।

বাবা এসে ছড়াটা চেপে ধরলেন হঠাৎ।

চমকে উঠে তাকালো জয়ন্ত পিতার দিকে। 'আর নয়। রাত এখন একটা। এবার চলো, ঘুমোতে যাবে। এত ঠাণ্ডায় বসে থাকলে, অসুখবিসুখ হতে পারে কোন। তখন দ্বারকার কাছে যাবে কেমন করে? তার কাছে না গেলে পাতালপুরীর খবর তো জান্তেই পারবে না তুমি।' ভাবালু চোখ জীবন্ত হয়ে উঠল জয়ন্তের। সে বলল-'তাই তো! এখন অসুখে পড়লে পাতালের সন্ধান তো পাওয়া যাবে না। আমি এখনই যাচ্ছি,বাবা,শুতে।' বেহালাটা খাটীয়ায় রেখে,তার ওপর সযত্নে একটা কাপড় চাপা দিয়ে সে আবার তার আবেগ প্রকাশ করলো-'জানো,বাবা,সন্ন্যাসী জ্যেঠুর বেহালার সুরটা না,ভারী মিষ্টি! ওঁর কথার মতই মিষ্টি। একবার শুন্লেই আবার শুনতে ইচ্ছা হয়।

চোদ্দ

পরদিন বেলা চারটেয় প্রসন্ন, চন্দনা এবং জয়ন্তকে নিয়ে জজসাহেব যখন হাজির হলেন বন্ধুর ডেরায়, তখন একটু বিস্মিত হলেন সকলেই-গুম্ফার সামনে বেশ কিছু পাহড়িয়ার ভীড় দেখে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল-আট মাইল দূর থেকে

এক রোগীকে ডুলীতে করে নিয়ে আসা হয়েছে সন্ন্যাসীর কাছে চিকিৎসার জন্যে। 'সে কি? তোমাদের সাধুবাবা আবার চিকিৎসাও করেন নাকি?' সূর্য্যকান্ত শুধালেন। উত্তর দিল পাহাড়িয়া এক যুবক, বলল-সাধু মহারাজ স্বয়ং ধন্বন্তরী। কত কঠিন কঠিন বেমারীকে যে মহারাজজী জঙ্গলী গাছ-গাছড়ার রস খাইয়ে সারিয়ে তুলেছেন-তার হিসাব করা ত সহজ নয়। আসপাশের পাহাড়ের দেহাতিরা সাধুমহারাজের দাক্ষিণ্যেই তো বেঁচে আছে।

জজসাহেবের এবার মনে পড়ে গেল প্রথম দিন যখন দ্বারকার সন্ধানে এসেছিলেন তাঁরা, তখন ব্রহ্মচারী বলেছিলেন যে,দ্বারকা গিয়েছিলেন নচিকেতা তালে আর এক অসুস্থ সন্ন্যাসীকে দেখতে। তবে কি সেখানেও দ্বারকা গিয়েছিলেন সেই রুগ্ন সন্ন্যাসীকে ওষুধ আর পথ্য দিতেই?

পাহাড়িয়া যুবক জানালো-'তারই বয়সী যোয়ান ছেলে ঐ সিপাল সিং। ক্ষেতে কাজ করছিল। হঠাৎ রক্তবমি শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডুলীতে করে নিয়ে আসা হল স্বামিজীর কাছে। দুই দফায় দুই খোরাক দাওয়াই দিয়েছেন মহারাজ। রক্তবমি বন্ধ হয়েছে। এবার আরো চার খোরাক দাওয়া নিয়ে আমরা মরীজের সঙ্গে দেহাতে ফিরে যাবো।'

পাহাড়ের পাকদণ্ডীতে অচিরে অদৃশ্য হন মরীজ নিয়ে প্রত্যাবর্তনরত দেহাতীর দলটি। তারপরেই বোধকরি দ্বারকানাথের নজর পড়ে গেল জয়ন্তের দিকে। জয়ন্তের হাতে বেহালা দেখে চিৎকার করে বলে উঠলেন-'এসে গেছো দেখছি তোমরা। হাতে আবার বেহালা কেন? যে ক'দিন উত্তর কাশীতে থাকবে,ও বেহালাটা তোমার কাছেই রাখবে। কেমন? বেহালা তোমার কথা শুনছে না?'

একটু একটু বাজাতে পারছি কেবল। আজ আপনার হাতের বাজনা শুনবো।' জয়ন্ত বলল।

না। আজ আর অন্য কোন কাজ বা কথা নয়। আজ কেবল পাতালপুরীর সন্ধান করা। কি বল?'

আগ্রহে ঘাড় নেড়ে নিজের সম্মতি জ্ঞাপন করলো ছেলেটা। আবার হরিণের ছালের ওপর কম্বলাসনে বসলেন সন্ন্যাসী। চীর গাছের মোটা ডাল কেটে গুম্ফার গায়ের গর্ত্তে গুঁজে, তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। চীর গাছের ডালে তেল থাকে। সেই তেল সারা রাত জ্বলবে মশালের মত। পবর্বতকন্দরটি বেশ আলোকিত হয়ে আছে ঐ চীর ডালের আলোতে।

অদূরে কুণ্ডের জ্বালানি কাঠে আগুন জ্বলছে-গণ গণ করে তারই ফলে ঘরটি বেশ আরামপ্রদ রকমের উত্তপ্ত। সন্ধ্যার আর দেরী নাই। সূর্য্যকান্ত তাঁর সঙ্গীদের

নিয়ে ঘরে বসলেন সন্ন্যাসীর চারিধারে।

তুই তাহলে ডাক্তারীও করিস? জজসাহেব লঘুস্বরে শুধালেন।'

'ডাক্তারী কোথায়? এ তো গুণিনের কাজ। হিমালয়ে শিব যেসব ওষুধ দিতেন এখানকার হত দরিদ্র অবহেলিত পাহাড়ীদের, সেই সব ভেষজ এখানে পাওয়া যায় প্রচুর পরিমানে। সেই সব গাছগাছড়ার পাতা, ছাল বা মূলের রস খাওয়াই এদের অসুখেবিসুখে, অবাক হয়ে দেখি- এরা সেরে যায়।'

'তা শিব যে এই ওষধিগুলো এখানকার মানুষদের দিতেন, সে কথা তুই জানলি কোত্থেকে? তুই তো আর শিবকে দেখিস নি।'

'দেখি নি বটে, কিন্তু গুণিনদের মুখে শুনেছি। মহাদেবের যুগ থেকে শিষ্য পরম্পরায় এ অঞ্চলের গুণিনরা এই সব ভেষজ বিদ্যানাথ শিবের দেওয়া ওষধি হিসেবেই ব্যবহার করে চলেছে। তুমি ওষুধ শিখতে চাও,লাখটাকার বিনিময়েও ওরা তা শেখাবে না। যে গুণিদের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ করবে না জীবনে- তেমন মানুষকে ওরা কেবল ওদের শিবোষধির কথা বলবে প্রথমে চেলা বানিয়ে নিয়ে। চেলা হবার সময় গঙ্গাজল হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা নিতে হবে মন্ত্রগুপ্তির। কেবলমাত্র যে গুণিন হবে,তারই কানে। প্রবীণ গুণিন শুনাবে সেই ভেষজ মন্ত্র। এটাই হচ্ছে গুণিনদের প্রথা এখানে।'

'তুই তো গুণিন নস, তবে তোকে ভেষজ শেখালো কেন?' একটু হেসে উত্তর দিলেন দ্বারকা-' আমি যে ঘর বিরাগী সন্ন্যাসী! আমি এখানকার পাহাড়িয়াদের মঙ্গলের জন্যে এ-ওষধি কেবল ব্যবহার করব, কোন ব্যবসায়ের জন্যে নয়, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে তবেই আমাকে শিখিয়েছে এক গুণিন এইসব ওষুধ। আমাকেও শপথ নিতে হয়েছে মন্ত্রগুপ্তির, আমিও ছাড়া পাইনি।

'হিমালয়ের জঙ্গলে বুঝি প্রচুর ভেষজ লাতাগুল্ম পাওয়া যায়?'প্রসন্ন জিজ্ঞেসা করলেন।

'প্রচুর। এখানকার জলের দোষে এ অঞ্চলের মেয়েদের গলগণ্ড অর্থাৎ ঘ্যাঘ খুব বেশী হয়। আমি নিজের চোখে দেখেছি, যে গলগণ্ড চার বছর চিকিৎসা করেও ডাক্তাররা সারাতে পারেনি, সেই রোগ তিনদিন ওষুধ খাইয়ে সম্পূর্ণ নিরাময় করেছে এক গুণিন। স্রেফ একরকমের পাতার রস খাইয়ে। কিন্তু এসব আলোচনা আর নয়। চা খাবার সময় তোরা এলি সূর্য্যি, একটু চা খা। চায়ে দুধ পাবিনে কিন্তু। আমার সব দুধ আজ ঐ পাহাড়িয়া রোগীটাকে খাইয়ে দিয়েছি। দুধ তো পাহাড়িয়ারাই দিয়ে যায় দয়া করে রোজ সকালে। না নিলে দুঃখ পায় মনে, কাঁদাকাটি করে।'

সূর্যকান্ত বললেন, 'জয়ন্ত চা খায় না, আমাদের তিনজনের। র'চায়ে আপত্তি নেই। বেশ কন্‌কনে ঠাণ্ডা পড়েছে আজ, দুধ ছাড়া চা ভালই লাগবে।' 'হল তো মুস্কিল! তোর ছেলে বুঝি আবার চা খায় না? কি দিই ওকে বলতো?' বলে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন সন্ন্যাসী। তারপর,জয়ন্তের পানে চেয়ে প্রশ্ন করলেন— 'কি বাবু, তুমি একটা নতুন জিনিস খাবে?'

'কি নতুন জিনিস জ্যেঠু?'

'বাসকফুলের চচ্চরি।'

'সেটা আবার কি?' জজসাহেব জানতে চাইলেন।

'সকালে দেহাতিরা এসেছিল তো মরীজকে নিয়ে। এরাই এখানে ভাণ্ডারা চড়িয়েছিল। নিজেরাই রান্নাবান্না করে, প্রথমে আমাকে খাইয়ে, তারপর নিজেরা খেলো। সেই ভাণ্ডারার খিচুরী-শব্জী-ভাজি কিছু রেখে দিয়েছি, রাত্রে জয়ন্ত খাবে বলে। ওরাই বানিয়েছে এই বাসকফুলের চচ্চরি। তোরাও একটু চেখে দেখ না।'

জজসাহেবের সঙ্গে সঙ্গীরাও সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন সন্ন্যাসীর প্রস্তাবে। চা-এর পালা শেষ হলে দ্বারকা বললেন—' এবার,জয়ন্ত, তোমায় বলবো আমাকে প্রশ্ন করতে। শুনেছি, বছরের পর বছর তুমি পাতাল-পুরীর খোঁজ করছো পাগলের মত। পাতাল দেখবার জন্যে তুমি কূয়োতে নেমেছো,বড় গর্তে ঢুকেছো, যেখানে কোন দীঘি কাটা হচ্ছে, সেখানে হন্যে হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছো ঘন্টার পর ঘন্টা। আজ তোমার জীবনের সেই শুভমুহূর্ত খুব কাছে এসে গেছে-যখন তোমার এত দিনের এত বড় জিজ্ঞাসার উত্তর তুমি পাবে।'

'পাবো? জানতে পারবো আমি পাতালের কথা? আর, পারবো তা আজই?'

'হ্যাঁ,পারবে। আগে ঠিক করে বলো ঠিক কি জিনিসটা তুমি জানতে চাও?'

'পাতাল কোথায়?'

সন্ন্যাসী নিজের পায়ের নীচেকার মাটী দেখিয়ে দিলেন।

'আপনিও? আপনি সেই মাটীই দেখাচ্ছেন জ্যেঠু? কিন্তু বাবা বলেন, মাটির ভেতরে কেবল ফুটন্তলাভা, জল আর জ্বলন্ত গ্যাস আছে। ওখানে মানুষের বাস অসম্ভব। অথচ, রামায়ণে দেখতে পাচ্ছি দাক্ষিণাত্যের রাক্ষস, বানর প্রভৃতি মানুষের সম্প্রদায় প্রায়ই যাচ্ছে পাতালে, সেখানে তারা বসবাস করছে। তবে কি বাল্মিক বর্ণনা ভুল?'

'একটু ও ভুল নয়। বাল্মিকী মহর্ষি ছিলেন। তিনি ভুল লিখতে যাবেন কেন? তবে,আমি যে পায়ের তলার মাটি দেখিয়েছি-এটার মধ্যেও কোন ভুল আছে বলে যেন ভেবো না। এটাও ঠিক। কেন ঠিক,তা পরে বলবো।

এখন বলো-তোমার অন্য কি প্রশ্ন আছে।'

'আমি পাতালে যেতে পারি?' জয়ন্তের প্রশ্ন।

'নিশ্চয় পারো। তুমি,আমি,তোমার বাবা-সবাই যেতে পারে পাতালে।' সাধুর উত্তর।

'পারে?' বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে চন্দনা বললেন লোকে,এত জায়গায় যাচ্ছে শুনতে পাই,এমন কি চাঁদে যাবারও চেষ্টা করছে মানুষ। কিন্তু, কই, কোন মানুষ পাতালে গিয়াছে বলে তো শুনিনি আমি কখনো।'

সন্ন্যাসী হাস্‌লেন-'আর অল্পক্ষণ ধৈর্য্য ধরে থাকো মা,একটু পরেই সব জানতে পারবে, সব বুঝতে পারবে।'

এরপর,জয়ন্তের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন-'এইবার বল তো বাবু,বাল্মিকীর রামায়ণে কী বর্ণনা দেওয়া আছে পাতালের পথের।'

জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে কি যেন ভেবে নিল। তারপর ধীরে ধীরে শুরু করলো—'রামায়ণে লিখিত আছে যে, সলিল সম্ভব প্রজাপতি জলময় দেশে বাস করবার জন্য প্রজা সৃষ্টি করলেন। এই জলময় দেশ কোথায় জ্যেঠু?' 'এখনকার ওশেনিয়া আর আমেরিকা মহাদেশ।'

'সেখানে প্রজা সৃষ্টি করে প্রজাপতি নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা মনুষ্য জাতিকে রক্ষা কর। এই শুনে একদল প্রজা উত্তর দিল-'রক্ষাম',অপর দল বলল-'যক্ষাম'। যেদল বলল—রক্ষাম,সেদল রক্ষ, এবং যেদল বলল যক্ষাম, সেদল যক্ষ বলে পরিচিত হল (রামায়ণ,উত্তরকাণ্ড,৪র্থ সর্গ,৯,১১,১২,১৩)। এই উপাখ্যান থেকে এটুকু আমি বুঝতে পেরেছি যে, যক্ষ এবং রক্ষ দ্বীপময় ভারতের মানব গোষ্ঠীর দুইটি পৃথক পৃথক শাখা। হিমাচল থেকে সুমেরু পর্য্যন্ত দেবজাতি এবং মিহালয় থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত অধ্যুসিত মানবজাতি থেকে এরা ভিন্ন। রক্ষ বা রাক্ষস বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আমরা রামায়ণে নাম পাচ্ছি হেতি আর প্রেহেতি নামের দুই-ভাই-এর। হেতির পুত্র বিদ্যুৎকেশ,তাঁর পুত্র সুকেশ। সুকেশের গন্ধর্বী-স্ত্রী দেববতীর গর্ভে জন্মায় তিনটি পুত্র সন্তান-মাল্যবান,সুমালী আর মালী। কালক্রমে এই তিন ভাই মহা প্রতাপশালী হয়ে ওঠে সমস্ত দ্বীপময় ভারতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে শেষপর্য্যন্ত ভারতের দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হন। তাঁরা ত্রিকূট পর্ব্বতের ওপরে লঙ্কাপুরী প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই রাক্ষস জাতি মায়াবী, ছলনাময় আর ভয়ানক কামাচারী ছিল (রামায়ণ,উত্তরকাণ্ড,৪র্থ সর্গ,২৪)। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মাল্যবান,সুমালী এবং মালী ভয়ঙ্কর অত্যাচারী হয়ে উঠলে বিষ্ণু তাঁদের দমন করতে যুদ্ধ করেন। কর্নিষ্ঠ ভাই মালী নিহত হন।

মাল্যবান আর সুমালী পাতালে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। রামায়ণ প্রথম যখন পড়ি,তখন এই ঘটনাই আমাকে সবচেয়ে বেশী ভাবিয়ে তুলেছিল। রক্ষ বা রাক্ষস তো মানুষেরই একটা গোষ্ঠী ছাড়া আর কিছুই নয়, তাদেরই দুইজন সপরিবারে পাতালে পালিয়ে গেলেন,—আসলে তাঁরা গেলেন কোথায়? পাতাল বলতে রামায়ণকার কি বুঝাতে চেয়েছেন।'

'চমৎকার প্রশ্ন চমৎকার বিশ্লেষণ।' দ্বারকা বললেন, 'তারপর থেকেই বুঝি তুমি আরম্ভ করলে পাতালের সন্ধান?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু যাঁকেই জিজ্ঞেসা করেছি--পাতাল কোথায়? আপনার মত,তাঁরা সকলেই দেখিয়ে দিয়েছেন কেবল পায়ের নীচের মাটীকে। এর বেশী কেউ আর কিছু বলতে পারেন নি। কেবল সূর্য্য পণ্ডিত আমায় একদিন বলেছিলেন,কতবড় ঋষি ছিলেন বাল্মিকী, তিনি কি অলীক জিনিস লিখে গেছেন সব? নিশ্চয় পাতাল কোথাও আছে, যার ঠিক ঠিকানাটা তুই-আমি আজও পাই নি।' হাসতে হাসতে সন্ন্যাসী বললেন–'সবার মত আমিও পাতাল বলতে পায়ের নীচের মাটিকেই দেখিয়েছি সত্যি,কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে–আমি একটুও ভুল বলি নি। এইবার তুমি শোনাও–রামায়ণে পাতালের যাত্রাপথের কি বর্ণনা আছে'

বানররাজ সুগ্রীব সীতার খোঁজে পূর্বদিকগামী বানরদেরকে বাসুকীর রাজ্যের সন্ধান দিতে গিয়ে রামায়ণে বলেছেন–হে বানর সৈন্যগণ,তোমরা বিদেহ,মালব। কাশী, কৌশল, মগধ, পৌণ্ড্র এবং অংসদেশ অতিক্রম করে যাবে। (কিস্কিন্ধা কাণ্ড ৪০শ সর্গ) পরে সমুদ্রের মধ্যস্থ পবর্বত, সমুদ্র দ্বীপস্থ নগর প্রভৃতি অতিক্রম করে--কৃষ্ণবর্ণ নরমাংসাশী রাক্ষসদের এবং আমসৎস্যাশী কিরাতদের দ্বীপাবলী অতিক্রম করবে। পরে,তোমরা সপ্তরাজ্যময় যবদ্বীপে এবং স্বর্ণকারসমূহ পরিবেষ্ঠিত সুবর্ণ দ্বীপে গমন করবে।'

এই পর্য্যন্ত বলা হয়েছে, সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়ালেন। গেলেন গুম্ফার এক কোণে রাখা মস্ত এক কাঠের বাক্সের কাছে। বাক্স খুলে একটি গ্লোব এবং একটি মানচিত্র-বই বের করে নিয়ে এলেন। বললেন-তোমাকে বুঝাবার জন্যেই এগুলো আনিয়ে রেখেছি, বাবুজী। এবার এই অ্যাটলাসটার ওপর চোখ ফ্যালো রামায়ণে লিখিত পাতাল যাত্রা পথের যে বিবরণ তুমি দিলে, সেই যাত্রপথ দ্যাখো তো এই ম্যাপে খুঁজে পাও কিনা।' বলে, একটু থামলেন সন্ন্যাসী। হয় তো ভাবলেন ছেলেটা কিছু বলবে, কিন্তু জয়ন্ত যখন মানচিত্রের ওপর চোখ নামিয়ে নীরবেই একটি আঙ্গ দিয়ে খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে লাগলো রামায়ণে বলা নামগুলো, তখন তিনি আবার বললেন, 'বিদেহ, মালব, কাশী, কৌশল,মগধ, পৌন্ড্র-এ সবই ছিল তখনকার

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য। সুগ্রীব বানরদের বলছেন—এই সব রাজ্য পার হয়ে সপ্তরাজ্যময় যবদ্বীপ এবং স্বর্ণকারসমূহ-পরিবেষ্টিত সুবর্ণ দ্বীপে যাবে। সপ্তরাজ্য পরিশোভিত যবদ্বীপ বলতে সুমাত্রা, যবদ্বীপ,বলীদ্বীপ প্রভৃতি দীপগুলিকে বুঝানো হয়েছে কিনা সেটা ভেবে দেখার বিষয়। সুগ্রীব বলেছেন, এর পরেই স্বর্ণকার-পরিবেষ্টিত সুবর্ণ দ্বীপ পাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—স্বর্ণকার এবং স্বর্ণে ভরা সুবর্ণ দ্বীপ তা হলে কোনটি? অনেকে সুবর্ণদ্বীপ বলতে সুমাত্রাকে বুঝে থাকেন। কিন্তু রামায়ণে যবদ্বীপ অতিক্রম করে যে শিশির পর্ব্বতে অবস্থিতির কথা বলা হয়েছে, সুমাত্রা দ্বীপে তেমন পর্ব্বত কোথায়? অতএব,এখন নিশ্চিত করে বলা যায় যে সুবর্ণ দ্বীপ বলতে রামায়ণকার স্বর্ণখনি-পরিবেষ্টিত অষ্ট্রেলিয়াকেই বুঝাতে চেয়েছেন। সুবর্ণ মানে সোনা। প্রচুর সোনা ঐ অষ্ট্রেলিয়ার গর্ভদেশে, তাই অষ্ট্রেলিয়াকে নাম দিয়েছেন রামায়ণ রচয়িতা সুবর্ণদ্বীপ, এবং তার সঙ্গে এটাও বলেছেন যে ঐ দ্বীপ স্বর্ণকার-পরিবেষ্টিত। এ সবই মিলে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। এখন অষ্ট্রেলিয়টা খুঁজে বের করো।' 'এই তো অষ্ট্রেলিয়া জ্যেঠু। তাহলে,অষ্ট্রেলিয়াকেই সুবর্ণ দ্বীপ বলা হয়েছে রামায়ণে? পাতালে যেতে গেলে অষ্ট্রেলিয়া যেতে হয়?'—'তুমি আরও বল, রামায়ণে কি আছে। পাতালে যেতে গেলে সুবর্ণদ্বীপ ছাড়িয়ে তার পর কোন পথে যেতে হবে? নিজের বর্ণনা থেকেই বুঝতে পারবে —সোনা আর স্বর্ণকারে ভরা অষ্ট্রেলিয়াকে সুবর্ণদ্বীপ বলেছেন রামায়ণকার। অষ্ট্রেলিয়াতে যে প্রাচীনকালেও ভারবর্ষের লোক গিয়ে বসবাস করতো,তার প্রমাণও আজকের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় আমরা পেয়েছি।'

'কি প্রমাণ?'

'আজকের নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, প্রাচীন ভারতের আদিম মানব গোষ্ঠী এবং প্রাচীন অষ্ট্রেলিয়ার আদিম মানব গোষ্ঠীর মধ্যে সাজুজ্য রয়েছে সুস্পষ্টভাবে।'

পাতালের দিকে যতই অগ্রসর হচ্ছেন দ্বারকানাথ, ততই উদগ্র হয়ে উঠছে বালকের কৌতূহল। সে শুধালো-'সুবর্ণদ্বীপ ছাড়িয়ে বানর সৈন্যেরা কোন পথে গিয়েছিল, এবার বলবো?'

'বলো। তবে এটা জেনে রাখো-যে পর্ব্বত, নদী বা দেশের নাম রামায়ণে আছে, সেই পর্ব্বত, নদী বা দেশ কিন্তু আজ অন্যনামে পরিচিত সকলের কাছে, কয়েক হাজার বছরের ব্যবধানে-এই নামের পরিবর্তন হবেই, হতে বাধ্য।' জয়ন্ত পুনশ্চ আরম্ভ করলো রামায়ণের পথ ধরে বাসুকীর রাজ্যের দিকে এগুতে। সে বলল, 'এর পর, নানা দ্বীপ ও পর্ব্বত অতিক্রম করে, বানররা যে বিশাল ভু-খণ্ডে গিয়ে

পড়বে সেখানে দ্রুতগামী রক্তবৎ জলবিশিষ্ট শোন নদী দেখতে পাবে তারা।' এই নদী আসলে এখানকার কোন নদী, আমি বলছি তোমাকে একটু পরে। তুমি শেষকরো আগে প্রথম পর্বের বর্ণনা।

'সেই শোন নদের তীরভূমিতে বিরাট বিরাট পার্ব্বত্য গুহা আছে। সেখানে ভয়ানক যবনগণের বাস।'

'এইবার শোনো। ঐ ভয়ঙ্কর গর্জনকারী শোন নদ হচ্ছে আজকের আমাজন নদী। একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর তীরভূমিতেই দেখতে পাবে বিরাট বিরাট পার্ব্বত্য গুহা। আর, শোন নদের জলকে রক্তবৎ বলা হয়েছে। আজকের আমাজনও লাল গিরিমাটি মিশ্রিত রক্তাভ বর্ণের জলই বহন করে চলেছে দুরন্ত বেগে। আচ্ছা, এবার বলো, এরপর রামায়ণ রচয়িতা কি লিখেছেন?'

'এর পরেই বলা হয়েছে ইক্ষু-সাগরের কথা। ইক্ষু সমুদ্রের সমীপবর্তী সুপ্রশস্ত একটি দ্বীপ আছে। তার পরেই লোহিত সাগর। এই সাগরে যে বিরাট দ্বীপটি পাওয়া যাবে, তার নাম শাল্মলী দ্বীপ। এ দ্বীপ নাকি বসুন্ধরার সাতটি দ্বীপের একটি? রামায়ণ বলছে-এই শাল্মলী দ্বীপেই বিশ্বকর্মা বিষ্ণুবাহন গরুড়ের জন্যে কৈলাসতুল্য এক পুরী নির্মাণ করেছিলেন? এই দ্বীপে মন্দেহ-নামা রাক্ষসদের বাস। এখানে সূর্য্যের তেজে এত উত্তাপ যে মনে হয় যেন সূর্য্যঅগ্নি উদগীরণ করছে সবসময়। (রামায়ণ, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪০সর্গ, ৪২এবং৪৩শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এরপর জলদ সাগর। এই সাগরের উত্তর তীরে ত্রয়োদশ-যোজন-ব্যাপী জাতরূপ শিল পর্ব্বতেও অগ্রভাগে নাকি নাগরাজ বাসুকী অবস্তান করেন' অর্থাৎ, রামায়ণ বর্ণিত পথে তুমি এমনিভাবে পৌঁছে গেলে পাতালপুরীতে। এখন দেখতে হবে, রামায়ণে যে সমুদ্রপর্ব্বত-নদী এবং স্থানের যে নাম দিয়েছে, এখানকার ভূগোল মানচিত্রে তাদের সেই নামই আছে কিনা। তোমার দেওয়া বর্ণনা অনুসরণ করেই 'আমরা পূর্ব্ব দেশগামী বানরদের গতিপথ এবার ভালোভাবে নির্ণয় করবার চেষ্টা করবো। দ্বীপ থেকে সামান্য পূর্ব-দক্ষিণে ঘুরে অষ্ট্রেলিয়াকে চক্রাকারে পরিভ্রমণ করে তাকে দক্ষিণে রেখে এবং সুমাত্রা ও যবদ্বীপকে সূত্রে ধরে নিয়ে বানরবৃন্দ ক্রমাগত পূর্বদিকে চলতে চলতে শেষে দক্ষিণ আমেরিকার শীর্ষভাগে অবস্থিত পানামা উপসাগরের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবে। এইখান থেকেই পৃথিবীর দীর্ঘতম আণ্ডিজ পর্ব্বতমালার আরম্ভ। এই আণ্ডিজ পর্ব্বত থেকে সম্পন্ন হয়ে পৃথিবীর প্রশস্ততমা এবং সর্বশ্রেষ্ঠা গর্জনকারী আমাজন ভীম বেগে পার্ব্বত্য রক্তবর্ণ (অর্থাৎ গিরিমাটী মিশ্রিত) জল বহন করে অতলান্তিক মহাসাগরে গিয়ে পড়েছে। আমাজনইকে রামায়ণকার শোন বলেছেন। বানরা প্রথমে আমাজনের উৎসমুখে গিয়েই উপস্থিত

হয়েছিল বলে মনে হয়। এর পরেই ইক্ষু-সমুদ্র। রামায়ণের ইক্ষু-সমুদ্র বর্তমানের প্রশান্ত মহাসাগর। প্রশান্ত মহাসাগরকে রামায়ণ দুইভাগে ভাগ করে এক অংশের নাম দেওয়া হয়েছে ইক্ষুসমুদ্র, অপর অংশের নাম জলদ-সমুদ্র। মাঝখানের উপসাগরকে রামায়ণে বলা হয়েছে লোহিত সাগর। রামায়ণের বর্ণনানুসারে প্রশান্ত সাগরের দুই বিশাল দ্বীপ দেখতে পাবে বানর সৈন্যরা। একটি দক্ষিণ আমেরিকা এবং অন্যটি উত্তর আমেরিকা। রামায়ণের কথাই যদি মানা যায়, তাহলে উত্তর আমেরিকা হচ্ছে শাল্মলী দ্বীপ। রামায়ণে আছে-শাল্মলী দ্বীপের কিছু অংশ প্রচণ্ড গ্রীষ্মপ্রধান উষ্ণ-উষ্ণবর্তী। আমরা সকলেই জানি মধ্য আমেরিকা উষ্ণমণ্ডল এবং সেখানকার সূর্য্যের প্রচণ্ড দাবদাহ প্রায় দুঃসহ এখানকার অধিবাসীদের কাছে। জয়ন্ত জিজ্ঞেসা করলো-জাতরূপশিল পর্ব্বত? যে পর্ব্বতের সবচেয়ে উত্তর পূর্ব ছিল নাগরাজ বাসুকীর রাজধানী?'

আজকের রকি পর্ব্বতমালা। রামায়ণে আছে-উপশিল পর্ব্বত নাকি ত্রয়োদশ-যোজন ব্যাপী বিস্তৃত ছিল। এই রকি পর্ব্বতমালার বিসতৃতিও প্রায় ততখানিই। মেক্সিকো থেকে আলাস্কা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে আজও। তার মানে,বর্তমান আলাস্কা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল অনন্তদেব অর্থাৎ বাসুকীর রাজধানী।'

'তাহলে ঐ অঞ্চলটাই প্রাচীন যুগে পাতাল বলে পরিচিত ছিল?-যে পাতালে রাক্ষসরা প্রায়ই গিয়ে আশ্রয় নিত? বিষ্ণুর আক্রমণের ভয়ে যেখানে পালিয়ে গিয়েছিল রাক্ষস মালাবান আর সুমালী?'

'হ্যাঁ। আজকের মধ্যআমেরিকাতেই যে রামায়ণ বর্ণিত পাতাল তার প্রমাণও পেয়েছেন এখানকার প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদরা নানারকমভাবে। রামায়ণ যুগের ভারতীয় বণিকরা যে আমেরিকার ভু-খণ্ডে গিয়ে নিজেদের ধর্ম,শিল্প আর সংস্কৃতি প্রচার করেছিল তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। রামায়ণেই তো বলা হয়েছে—শাল্মলী দ্বীপের অর্থাৎ উত্তর আমেরিকার প্রচণ্ড উষ্ণমণ্ডলে,অর্থাৎ মধ্য আমেরিকায় দেবসভ্যতা অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছে। সেখানে বিষ্ণুর বাহন গরুড়দেবের জন্যে পুরী নির্মিত হয়েছে।' 'এ তো রামায়ণে পড়েইছি। আপনি এবার বলুন, এখানকার পুরাতত্ত্ববিদরা কি প্রমাণ পেয়েছেন। তাঁরা কি জোর দিয়েই ঘোষণা করতে পারছেন যে,মধ্য আমেরিকাতে সুদূর প্রাচীনকালে সত্যি সত্যিই ভারতের লোকেরা যাতায়াত করতো,স্থায়ীভাবে বসবাস করতো, সেখানে তারা তাদের ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রচার করেছিল?'

'নিশ্চই পারছেন। মেক্সিকোর মিউজিয়ামে সাজানো আছে টিটিকাকা হ্রদের তীর, পেরু,বলিভিয়া প্রভৃতি জায়গায় মাটীর নীচ থেকে খুঁড়ে বের করে আনা

ইন্দ্র, ব্রহ্মা,শ্রী আর গনপতি মূর্তি। যে-দেশে প্রাচীনকালে হাতীই পাওয়া যেত না, সেই দেশে গনপতি মূর্তি নিশ্চয়ই তৈরী করে নি সে দেশের মানুষ। এই গনপতি মূর্তি নির্মাণ করেছিল বহিরাগতরা। আর সেই বহিরাগতরা ছিল গনপতি মূর্তিপূজক ভারতের পৌরাণিক যুগের অধিবাসী। মেক্সিকোর ষ্টেট-ডায়রীতে লেখা আছে- ফার বিফোর কলম্বাস,সাম ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স,ড্রিভন্ বাই দি ইষ্টার্ণ ওয়েভস্ কেম অ্যাণ্ড কলোনাইজড দেমসেল্ভস অন্ দিস্ সয়েল অফ আমেরিকা। এটা আমি পড়েছি প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক দেওয়ান চমন্‌লাল-এর লেখা Hindu America গ্রন্থে। চমনলালজী নিজে মেক্সিকো, পেরু অঞ্চলে গিয়ে দীর্ঘ দিন থেকে গবেষণা করে এসেছেন 'মায়া' আর 'আজটেক'-সভ্যতাকে নিয়ে। তাহলে এখন কি দাঁড়াচ্ছে? মেক্সিকান ষ্টেট ডায়রীও স্বীকার করছে যে,কলম্বাসের অনেক আগেই পূবর্বদেশের অর্থাৎ প্রাচ্যের বণিকসম্প্রদায় আমেরিকার বুকে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এই প্রাচ্য-বণিকরা যে ভারত এবং দ্বীপময় ভারতের লোক ছাড়া আর কেউ ছিল না, তার প্রমাণ রয়ে গেছে Exeavatiou-এ পাওয়া অজস্র প্রত্নবস্তুর মধ্যে! দেওয়ান চমনলাল লিখেছেন,পেরু শব্দটার অর্থই হচ্ছে সূর্য্য। ওখানকার আদিবাসীরা এখনও নিজেদের সূর্য্যবংশীয় বলে ঘোষণা করতে গর্ব বোধ করে। ঐ অঞ্চলে সীতানবমীর কাছাকাছি কোন এক সময়ে প্রতিবৎসর আদিবাসীদের জাতীও উৎসব হয়। বিরাট উঁচু দোলায় একটি যুবককে রাজা এবং একটি তরুণীকে রাণী সাজিয়ে-বিরাট মিছিল করে নিয়ে যাওয়া হয় শহরের প্রধান রাস্তা দিয়ে। সহস্র সহস্র আদিবাসী এই মিছিলের সঙ্গে পদযাত্রা করে। ঐ রাজা আর রাণী সাজা যুবক-যুবতী সেদিন সকলের কাছে বিশেষ সম্মান এবং শ্রদ্ধার পাত্র। গবেষকদের সিদ্ধান্ত বলছে-জাতীয় মহোৎসবের ঐ রাজা আর রাণী কেউ নন, ওঁরা শ্রীরামচন্দ্র আর সীতা। এবং এই কারণেই উৎসবরে দিন হিসাবে আদিবাসীরা বেছে নেয় রামনবমী ও সীতানবমীর মধ্যবর্তী কোন এক তিথিকে।

জয়ন্তের বিস্ময় বাড়তে বাড়তে চরম সীমায় পৌছেছে প্রায়। সে শুধালো- 'পাতালে তাহলে রাক্ষসরাই ভারতীয় সভ্যতা প্রচার করেছিল?

'শুধু অনার্য্য রাক্ষসরা কেন, আর্য্যসভ্যতাও যে সেখানে পৌছেছিল তার ইঙ্গি তো আছেই রামায়ণে। শাল্মলী দ্বীপে, মানে উত্তর আমেরিকায় বিষ্ণুবাহন গরুড়ের জন্য পুরী নির্মিত হওয়ার সংবাদ আছে রামায়ণে। রাক্ষস,যক্ষ,অপসর,গন্ধর্ব এবং দৈত্যরা একই পর্য্যায়ের আর্য্যেতর জাতি। এদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহের প্রচলন ছিল। রাবণের পত্নী মন্দোদরী দানবকন্যা। মন্দোদরীর মা হেমা অপ্সরা। বিভীষণ পত্নী সরমা গন্ধর্বরাজ শৈলুষের মেয়ে। সুন্দাসুর সুকেতু যক্ষ কন্যাকে বিবাহ

করেছিলেন,সেই স্ত্রীর নাম তাড়কা। এইসব জাতিগুলির একটা নিজস্ব সভ্যতা ছিল। রামায়ণে যে স্থানকে পাতাল বলা হচ্ছে,সেখানে অর্থাৎ আমেরিকায় আর্য্যেতর এই জাতিগুলি তাদের বিরাট বিরাট উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তবে ভারতের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ যে একটা ছিল, তারা যে প্রায়ই তাদের পিতৃভূমি ভারত এবং দীপময় ভারতে আসা যাওয়া করতো—তার প্রমাণ তো আছে ঐ রামায়ণের মধ্যেই।

দেশবরেণ্য প্রত্নতত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র (বিবিধার্থ সংগ্রহ,৫ম পর্ব,৫৮খণ্ড) লিখেছেন—ভারতীয় বণিককুল বাণিজ্য ব্যপদেশে আমেরিকায় গিয়া হিন্দুসভ্যতায় বিস্তার ও ইন্দ্রপূজা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। মধ্য আমেরিকায় যে সকল প্রাচীন মন্দিরাদির ধবংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে, সে সকলের গঠন প্রণালী সর্বাংশেই দক্ষিণ ভারত ও ভারত মহাসাগরীয় অনুদ্বীপস্থ হিন্দু মন্দিরের অনুরূপ।

এইখানে আমি একটু বলে রাখি জয়ন্ত, নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে যে, বানর রাজা বালি আর রাক্ষস মহীরাবণ যারা পাতালে যেতো মাঝে মাঝে, তারা দুজনেই ছিলেন দক্ষিণের মানুষ। সুবিখ্যাত প্রত্নবস্তু সংগ্রাহক কুমারস্বামী আমেরিকার বোষ্টনে যে নিজস্ব সংগ্রহশালাটি গড়ে তুলেছেন, তাতে টিটিকাকা হ্রদের তীর, পেরু,বলিভিয়া প্রভৃতি জায়গার অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে।—সেগুলি দেখলে মনে হয় বুঝিবা আমেরিকার বুকে দাঁড়িয়ে আমরা দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন মন্দির, বিগ্রহ আর নাট মণ্ডপ দেখছি।' মুহূর্তের বিরতির পর আবার আরম্ভ করলেন প্রজ্ঞাপ্রবীণ সন্ন্যাসী—'এবার শোন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র আরও কি লিখেছেন প্রাচীন আমেরিকায় ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে। উনি 'লিখেছেন—ভারতবর্ষের পাহাড় কাটিয়া যেরূপ মন্দিরাদি নির্মিত হইয়াছে,মেক্সিকোর শিৎল নামক তদনুরূপ প্রস্তর মন্দির সকল দর্শন করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, হিন্দুগণ সমুদ্র-পারস্থ সেই অতিদূরবর্তী মহাদেশে যাইয়া ভারতীয় ভাস্কর বিদ্যার বিরাট নিদর্শন রাখিয়া আসিয়াছেন। তথায় প্রস্তর খোদিত বহুতর দেবদেবীর মূর্তিও বাহির হইয়াছে, তাহা অবস্থায় সর্বাংশেই এদেশীয় হিন্দুর দেবদেবীর মতো। দক্ষিণ আমেরিকার টিটিকাকা হ্রদের তীরেও ভারতীয় শিল্প চাতুর্য রহিয়াছে। মেক্সিকোর অধিবাসীরা গণেশের চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকে। যে দেশে পূর্বে হস্তী পাওয়া যাইত না, সে দেশে কখনও এরূপ মূর্তি কল্পিত হইতে পারে না। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রাচীন-কালের হিন্দু বণিকগণের নিকট হইতেই মেক্সিকোবাসীরা সিদ্ধিদাতা গণেশ মূর্তি পাইয়াছিল। এখনও কম্বোজ,শ্যাম,বালি প্রভৃতি ভারত মহাসাগরীয় ক্ষুদ্র-বৃহৎ দ্বীপ সমূহে নানাবিধ গণেশ মূর্তি ও গণেশ মন্দির দৃষ্ট হয়।

এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হিন্দুরা কম্বোজ, ভারত বা যবদ্বীপাদি হইতে সুদূর পৌরাণিক যুগেও আমেরিকায় গমনাগমন করিত।' জয়ন্ত মুগ্ধ নয়নে এতক্ষণ তাকিয়েছিল সন্ন্যাসীর প্রশান্তিতে ভরা মুখের দিকে। সন্ন্যাসী নীরব হতেই এইবার সে শুধালো-রামায়ণের বর্ণনার সঙ্গে আপনার দেওয়া পাতাল পথের বর্ণনা চমৎকার ভাবে মিলে গেছে। ভারত আর দ্বীপময় ভারতের রাক্ষস, বানর,যক্ষ এইসব মানবসম্প্রদায় যে পাতাল অর্থাৎ আমেরিকায় পৌরাণিক কালেই যাতায়াত করতো, তারা যে সেখানে তাদের উপনিবেশেরও পত্তন করেছিল, এ সবের প্রমান এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমার মনে। নাগরাজ বাসুকীও যে ভারতের নাগসম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি যিনি মধ্য আমেরিকার ঐ অঞ্চলে তাঁর শক্তি, প্রভাব এবং প্রতিপত্তির জোরে নিজের অধিকার বিস্তার করেছিলেন,সে বিষয়ে এখন আমার মনে আর সংশয় নাই একটুও। কিন্তু,জ্যেঠু,একটা জিনিস আমার কাছে এখনও পরিস্কার হচ্ছে না কিছুতেই।'

'কোন জিনিস পরিস্কার হচ্ছে না, সেটা বলো।'

'এই পাতাল বলতেই কেন সবাই পায়ের তলার মাটীকে দেখিয়ে দেয়? আপনিও তো মাটীকেই দেখিয়েছিলেন যখন আমি পাতালের কথা জিজ্ঞেসা করেছিলাম। বলেছিলেন--আমি বুঝতে পারবো--পাতাল বলতে আপনি পায়ের নীচটা দেখিয়ে ভুল কিছু বলেন নি।'

একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল এবার সন্ন্যাসীর ওষ্ঠপ্রান্তে। তিনি তাড়াতাড়ি গ্লোবটা জয়ন্তের সামনে বসিয়ে দিয়ে বললেন--'এক্ষুনি তোমার মনের সংশয় দূর করছি বাবুজী।' এই বলে,আঙ্গুল দিয়ে গ্লোবটাকে আসতে আসতে ঘুরতে ঘোরাতে--ভারতকে নিয়ে এলেন একেবারে মাথায়। তারপর গ্লোবটা দেখিয়ে বললেন--'এই বার দ্যাখো। ভারতবর্ষ যখন রয়েছে গ্লোবের মথায়, তখন আমেরিকা রয়েছে গ্লোবের ঠিক উল্ট দিকে,গ্লোবের একেবারে নীচে। এখন আমরা ভারতের বুকে যখন দাঁড়াবো, তখন আমেরিকা অর্থাৎ পাতাল বলতে তো আমরা আমাদের পায়ের নীচটাই দেখাবো, তাই নয় কি? জয়ন্ত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'ও, এই ব্যাপার? এইবার বুঝেছি 'তারপর উঠে গিয়ে সন্ন্যাসীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সে আবার বলল, 'আমাকে একবার নিয়ে চলুন না জ্যেঠু নাগরাজ বাসুকীর রাজ্য সেই পাতালে।'

সন্ন্যাসী জয়ন্তকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন-'কেবল বাসুকীর রাজ্য নয়,তোমাকে নিয়ে যাবো পাতালরাজ বলি'রও রাজ্য,যে-রাজ্যের বর্তমান নাম বলিভিয়া, সেও ঐ আমেরিকাতেই। লক্ষ্য করছো, বলি রাজার নামটা পর্য্যন্ত পাচ্ছি

আমরা বলিভিয়ার মধ্যে। বামন অবতারের সময়কার সেই বলিরাজা।'

দুই হাতে তালি দিয়ে আনন্দের আবেগ প্রকাশ করলো এবার ছেলেটা—' কী আশ্চর্য্য! বলিভিয়া যে বলিরাজার রাজ্য ছিল, একথাও কি প্রত্নতাত্ত্বিকদেরই?'

হ্যাঁ। অনেক প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদই এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন।'

'আমায় কবে নিয়ে যাবেন জ্যেঠু—পাতালে?'

এতক্ষণের নির্বাক বসে থাকা সূর্য্যকান্ত এবার হঠাৎই সরব হলেন। বললেন--'তুই যদি ওকে মেক্সিকো-পেরু এইসব জায়গায় নিয়ে যেতে চাস, আমার কোন আপত্তি নেই। তোদের দুইজনের যাতায়াতের খরচ আমিই বহন করবো। হাস্‌তে হাস্‌তে দ্বারকা বললেন—'তা তো করতেই হবে। আমি সাধু সেজে বসে আছি, টাকা পাবো কোথায়? আমার এক ভাইপো রিসার্চ্চ-স্কলারশিপ নিয়ে মেক্সিকোতে গিয়েছে। সে ওখানে থাকতে থাকতেই আমি আমেরিকায় যেতে চাই। তাহলে ওর সাহায্যে পাতালে অর্থাৎ আমেরিকাতে ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শনগুলো দেখা আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হবে।'

'তাই যাবি'—স্বচ্ছন্দ করে বললেন সূর্য্যকান্ত, 'সামনের ডিসেম্বরে জয়ের অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গেলেই ওকে নিয়েই তুই যাত্রা করবি তোর দয়ায় ওর কূঁয়োয় নামা আর গর্তে ঢোকা তো বন্ধ হল। এ যে আমার আর ওর মার কাছে এক কত বড় স্বস্তি—তা তোকে আমি কেমন করে বুঝাবো।'

উঠে, ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো বাবাকে জয়ন্ত--'আমায় যাওয়ার অনুমতি দিলে তুমি বাবা এত সহজে?' বলে মুখ ঘুরিয়ে দ্বারকানাথের দিকে তাকিয়ে সে আবেগ-উদ্বেল স্বরেবলে উঠল, জানেন জ্যেঠু, আমার জীবন দুই সূর্য্যের আলোতে উদ্ভাসিত। এক সূর্য্য হচ্ছে আমার বাবা সূর্য্যকান্ত, আর এক সূর্য্য হচ্ছে-ঢাকার সূর্য্যপণ্ডিত। এঁদের আলোতে পথ চলেই আজ আমি আপনার কাছে আসতে পেরেছি, পাতালকে জানতে পেরেছি।' কথা শেষ হওয়ার পর জ্বলন্ত চিড়ডালের আলোয় উপস্থিত সকলেই দেখতে পেল কিশোর জয়ন্তের সারা মুখ শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে উঠেছে। তার আঁখির রেখায় জল চিক্ চিক্ করছে।

ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে

(দ্বিতীয় খণ্ড)

তৃতীয় অধ্যায়

সঙ্গম

বই সকলের অধিকার

Scanned by CamScanner

এক

প্রায় দশ বছর আগে আশা মায়িকে যেমন দেখেছিল জয়ন্ত প্রথম দর্শনের দিনে, আজও তেমনটিই আছেন তিনি। তারুণ্যে ঢলঢল, লাবণ্যে ঝলমল। আশ্চর্য্য! সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে একটা দীপ্তি যেন ফেটে বেরুতে চাচ্ছে। গেরুয়া আলখেল্লার আবরণেও সে দীপ্তিকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। চোখে মুখে স্বর্গীয় আনন্দের আভা সর্ব্বদাই সুস্পষ্ট।

সেই মাই-ই গত দুই দিন কথা বলছেন না ভাল করে, মুখখানা কেমন যেন গম্ভীর। কোন কথা জিজ্ঞেসা করলে হুঁ-হাঁ করে জবাব দিচ্ছেন। কণ্ঠে তাঁর সেই সুমধুর গান নেই, নেই প্রত্যুষের সেই সুললিত স্তোত্র পাঠ সুরু করে। মায়ির এমন ভাব এর আগে আর কখনও দেখে নি জয়ন্ত। অথচ মায়িরই পত্রে আমন্ত্রণ পেয়ে জয়ন্ত এসেছে এলাহাবাদে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। পনেরো দিন মায়ির সঙ্গলাভ হবে-জয়ন্তের প্রত্যাশা এইটুকুই।

প্রয়াগে মাঘী মেলার প্রস্তুতি পর্ব্ব চলেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সাধু-সন্তরা আসতে শুরু করেছেন এই সঙ্গমতীর্থে। মঠ, মিশন, আশ্রম, ক্যাম্প্ বসিয়েছে মেলা । প্রাঙ্গণে। এরই সঙ্গে বইছে আবার নির্ব্বাচনের হাওয়া। লোকসভার ভোট হবে সামনের মাসে। আজ এখানে জনসভা, কাল ওখানে বিখ্যাত নেতাদের বক্তৃতা। লেগেই আছে একটা না একটা। গত পরশু দিল্লীতে জগদ্‌বরেন্য এক ভারত নেতা ভাষণ দিয়েছিলেন সহস্র সহস্র লোকের উপস্থিতিতে। সেই ভাষণের কিছুটা পড়ে শুনিয়েছিল জয়ন্ত মায়িকে খবরের কাগজ থেকে। আর, ঠিক তারপর থেকেই মায়ির এমন অবস্থা।

যাঁর বক্তৃতার অংশ বিশেষ জয়ন্ত শুনিয়েছিল মায়িকে, সেই বিশ্ব বিশ্রুত নেতার বিরুদ্ধে সেবার নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে নেমেছিলেন এক ব্রহ্মচারী মহারাজ। বোধ করি সেই কারণেই অর্থাৎ ভোটের লড়াই এর তাগিদেই সেই বরেন্য নেতা

Scanned by CamScanner

তাঁর ভাষণে বলেছিলেন-'এইসব সাধু-সন্তরা সমাজের জন্যে, দেশের জন্যে কোনও কাজ করে না। এরা ধর্মের নাম করে জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আলস্যে সুখ-সম্ভোগে দিন কাটায়।' ব্যস, এইটুকুই শুনিয়েছিল জয়ন্ত কেবল। কিন্তু,তার প্রতিক্রিয়া যে এমন হবে- একথা ভাবতেও পারে নি সে। কান, চোখ, মুখ লাল হয়ে উঠেছিল মায়ির মুহূর্তে। ক্ষোভকম্পিত স্বরে তিনি বলে উঠেছিলেন-'দেশের ঐ নেতাকেই আমি সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি। তাঁর মুখেই এমন কথা? সব সন্ত-সাধুরাই লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কেবল আলস্যে সুখ সম্ভোগে দিন কাটায়? তারা দেশের জন্যে সমাজের জন্যে কিছু করে না?

'কথাগুলোর কিছুটা যে ঠিক, সেটা কিন্তু আমারও মনে হয় মায়ি।'

বিস্মিত কণ্ঠে মায়ি বললেন—'তোমারও মনে হয়?'

'হ্যাঁ। চারিদিকে দেখছি তো সব-গেরুয়া পরে ধর্মের নামে কতজন কত কাণ্ড করছে। প্রতিটি ধর্মই হচ্ছে এক একটা স্কুল। ভক্তশিষ্যরা হচ্ছে সেই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে সাধু-ব্রহ্ম চারীরাও পড়ে। একটা স্কুলের ক্লাসে এক সঙ্গে সব ছাত্র কি ফার্ষ্ট হয়? ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড-থার্ড-ফোর্থ হয় গুটি কয়েক ছেলে, বাকীদের কেউবা মাঝারি, কেউবা খারাপ, ধর্ম স্কুলেও ঠিক অমনটিই। কেউ ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড হয়ে সাধন-ভজন-ত্যাগ তিতিক্ষায় সকলের সামনে আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে সংযমে আর সৎ পথে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। সারা পৃথিবীর পক্ষে যা কল্যাণকর, সেই সব কাজ করতে লোককে অনুপ্রাণিত করে। আর কেউবা অর্থাৎ এ স্কুলের মন্দ যারা,তারা সুযোগ সন্ধানী,লোভী, মৎলব-বাজ। সাধু কিম্বা ব্রহ্মচারী সেজে নিজেদের স্বার্থের কথাই কেবল ভাবে তারা। নানা কুকীর্তি করে বেড়ায় ধর্মের ভেক চড়িয়ে শরীরে। অন্য একটি দলও আছে। এরা মাঝারি। এরা এদের শক্তি অনুযায়ী চেষ্টা করে চলেছে আপ্রাণ-সিদ্ধি পাওয়ার জন্যে, কিন্তু মানষিক প্রস্তুতির অভাবে এরা পারছে না এগুতে ততটা। এখন,ঐ ধর্ম স্কুলের খারাপ ছাত্রদের দেখেই যদি কেউ সারা ধর্মস্কুলটাকেই খারাপ বলে চিৎকার করতে থাকে,আর তুমিও যদি সেই চিৎকারে গলা মেলাও, তাহলে চলবে কেমন করে বলো তো?'

'গেরুয়া না পরেও তো সাধন-ভজন-ত্যাগ তিতিক্ষার পথে মানুষ চলতে পারে। গেরুয়া, পীত, লাল, সাদা-এগুলো হচ্ছে ইউনিফর্ম। আজকালকার স্কুলে সব দ্যাখো না-ইউনিফর্ম পরে স্কুল যায় ছাত্র-ছাত্রীরা। গেরুয়া, পীত, লাল বা সাদা পরে সাধু-ব্রহ্মচারী হলে হঠাৎ কোন নোংরা কাজ করতে গেলে নিজের মনেই খটকা লাগবে। সাধারণের চোখে ছোট হওয়ার ভয়েই হয়ত অনেক গেরুয়াধারী অনেক গর্হিত

Scanned by CamScanner

কাজ থেকে বিরত থাকবে। আমার মনে হয়, এইসব ভেবেই সাধু-ব্রহ্মচারীদের এই রকম ইউনিফর্ম পরার নির্দ্দেশ আমাদের প্রজ্ঞাবান পূর্ব্বপুরুষরা দিয়েছিলেন। এই পর্য্যন্ত বলে হঠাৎ গলার স্বরকে গাঢ়তর করে আশামায়ি বললেন,—'দিল্লীতে ঐ নেতা যা বলেছে,তা সে অনভিজ্ঞ বলেই বলেছে। কিন্তু তুমি? তুমি তো সেই ছেলেবেলা থেকেই সাধু-সঙ্গ করছো, আমার সঙ্গে ঘুরছো কত সাধুদের আড্ডায়। সেই তুমিও আজ বলছো-ঐ নেতার কথাই ঠিক? সব সাধু-সন্তরাই কেবল ধর্ম্মের নামে লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আলস্যে সুখ সম্ভোগে দিন কাটায়?

থতমত খেয়ে জয়ন্ত বলতে চাইল-'না, ঠিক তা বলতে চাই নি, তবে কিছু লোক যে ভেক ধরে নানা অন্যায় কাজ করে।' কিন্তু ধমকে তাকে থামিয়ে দিয়ে আশামায়ি বলে উঠলেন 'দিল্লীর সেই নেতা তো 'কিছুলোক' বলেনি! সে বলেছে-সব সাধুসন্তরাই সম্ভোগে দিন কাটায়। আর সেই কথায় সায় দিয়েছো তুমি। তাহলে তো তোমার মনেও সংশয়ের বিষ ঢুকেছে মিন্‌সা, এ বিষ তো নামাতে হবে আমাকেই।' জয়ন্ত কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো-মায়ির ক্ষোভ কিছুটা হাল্‌কা হয়ে এসেছে তবে। না হলে, মিন্‌সা সম্বোধন করবেন কেন।

তেরো বছর বয়সে হরিদ্বারের হর-কী পেরী ঘাটে যে দিন প্রথম দেখা হয়েছিলএই মা-টির সঙ্গে, সেদিনই ইনি সস্নেহে ডেকেছিলেন তাকে মিন্‌সা বলে। শব্দটা ভাল লাগে নি কানে; কিন্তু স্নেহসিক্ত সেই ডাকে একটা মিষ্টতা কোথায় ছিল যেন জড়িয়ে। সেই থেকে এই দশ বছরে যতবার দর্শন পেয়েছে জয়ন্ত মায়ির ততবারই শুনেছে-এই মিন্‌সা ডাক। আজ সকাল থেকে-আশামায়ির ওষ্ঠে একবারও উচ্চারিত হয়নি মিন্‌সা শব্দটি। যতক্ষণ ক্ষুব্ধ থাকেন, ততক্ষণ উনি মিন্‌সা সম্বোধন করেন না কখনও।

'আমার মধ্যে সংশয়ের বিষ?' জয়ন্ত জিজ্ঞেসা করলো।

'হ্যাঁ তো। তোমার কথা শুনেই আমি বুঝতে ;পেরেছি সাধু-সন্তদের সম্বন্ধে তোমার মনেও সংশয় আছে। এ সংশয় দূর করতে না পারলে তুমিও যে ভুলের সমুদ্রেই হাবু-ডুবু খাবে; আসল মুক্তার খোঁজ পাবে না কোনদিন। আমিও তো সাধু-সন্তেরই একজন। আমার সঙ্গেই বা মিশ্‌বে কেমন করে প্রাণ খুলে?'

লজ্জায় সংকোচে রক্তিম হয়ে উঠল জয়ন্তের কান। বলল-'একি বল্‌ছেন মায়ি! আপনার সঙ্গে ঐ সব সাধুদের তুলনা করবো আমি?'

'আজ না করলেও একদিন এমন সময় আসতে পারে যখন আমার ওপরেও তোমার আর শ্রদ্ধা থাকবে না। সংশয় বিষ বড় খারাপ বিষ মিন্‌সা। ওটাকে যত তাড়াতাড়ি মন থেকে তাড়াতে পারবে, ততই ভাল।'এই বলে,একটু থেমে,পুনশ্চ

Scanned by CamScanner

বললেন মায়ি—'তুমি একটা কাজ করো মিন্‌সা। পনেরোদিন আমার কাছে থাকবে বলে তো এসেছো, কালই চিঠি লিখে দাও বাড়ীতে—ফিরতে তোমার একমাস হবে। কেমন, লিখবে তো?' নিশ্চয় লিখবো। কিন্তু কেন মায়ি? আরও পনেরোদিন বেশী থাকতে বলছেন কেন?' আমার সঙ্গে ঘুরবে তুমি কয়েক জায়গায়। তোমার মনের সংশয় ঘোচাতে হবে না?'মুহূর্তে উৎসাহ আর পুলকে প্লাবিত হয়ে গেল জয়ন্তের মন। আশ্চর্য্য রহস্যময়ী তেজোদৃপ্তা পবিত্রা যে মহিয়সী মাতাজীর সঙ্গ পাওয়ার জন্যে সবর্বদাই তৃষিত থাকে জয়ন্ত, তিনি স্বয়ং স্বেচ্ছায় তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন বলছেন কয়েক জায়গায়—সাধু-সন্তদের সম্পর্কে তার মনের সংশয় দূর করার জন্যে। এরচেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে। কিন্তু পারবেন কি তিনি শেষ পর্য্যন্ত—সাধারণ গেরুয়াধারীদের সম্বন্ধে জয়ন্তের মনের ধারণা বদলাতে? পারবেন কি দিল্লীর ঐ সবর্বজনমান্য নেতাটির উক্তি যে সম্পূর্ণ ভুল—তা প্রমাণ করতে?

আশামায়ি আলখেল্লা-পাগড়ীর পুরুষালি সাজ পরেই বসে ছিলেন তখনও। সকালে উঠে সঙ্গমঘাটে গিয়েছিলেন কোন এক সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে দেখা করতে। ফিরে এসে পোষাক ছাড়েন নি। এই রকম সাজ যখন মায়ি করেন,তাঁকে দেখায় এক উঠতি বয়সী তরুণের মত—যার দাঁড়ি-গোঁফ বেরোয় নি এখনও। তবে এ তরুণ যে পরম রূপবান এবং সবর্বজয়ী দুই নয়নের অধিকারী—সেটা তাঁর দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায়।

ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল। তাতে কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

'দ্যাখো মিন্‌সা, কে আবার দরজা ধাক্কায়' মায়ি বললেন।

জয়ন্ত উচ্চ কণ্ঠে বলল—'ভেতরে আসুন, দরজা তো খোলাই আছে।' জয়ন্তের কথা ভালভাবে শেষ হওয়ার আগেই মাথায় থাক্ থাক্ টেরী কাটা এক ফুলবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। গলায় সোনার সরু হার, আর্দ্দির পাঞ্জাবীতে সোনার চেন দেওয়া সোনার বোতাম, হাতের আঙ্গুলে আঙ্গুলে সোনার আংটি। ফুলের মতন করে কোঁচানো কাঁছটা পাঞ্জাবীর বাঁ পকেটে ঢোকানো। গা দিয়ে ভুর ভুর করে বেরোচ্ছে আতরের খুস্‌বু। ঘরে ঢুকে মাকে দেখেই,জুতো খুলে ষষ্টাঙ্গে মাটিতে শুয়ে প্রণিপাত জানালেন প্রথমে। তারপর উঠে হাত কচলাতে কচলাতে বললেন—'আপনি প্রয়াগে আছেন জানতে পেরে সোজা চলে এলাম এখানে আপনার দর্শন লাভের আশায়। আপনি স্বয়ং ব্রহ্মময়ী,আপনার দর্শন পাওয়া মানেই—'

লোকটা ভেতরে ঢুক্‌তেই মায়ির দৃষ্টিটা যে একবার চম্‌কে উঠেছিল, সেটা লক্ষ্য করেছিল জয়ন্ত, এখন, লোকটাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই হঠাৎ অসম্ভব

Scanned by CamScanner

গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি, 'আরে,অগ্রবালজী যে, কি খবর?' বিশেষ খবর একটা আছে, মা। কিন্তু সে খবরটা জানাবার আগে—আপনার শ্রীচরণে কিছু প্রণামী রাখতে চাই। অতি সামান্য প্রণামী। তবু গরীব ভক্ত অগ্রবাল তার অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা নিয়ে এটি আপনাকে দিচ্ছে। দয়া করে পাঁচ হাজার টাকা গ্রহণ করুন।'

'অগ্রবালজী যে গরীব নয়,আর; পাঁচ হাজার টাকা যে সামান্য নয়, আমার মত ভিক্ষুনী সন্ন্যাসিনীর কাছে এটা যে একটা বেশ বড় অঙ্ক—সেটা আমার চেয়ে তুমি অনেক ভাল জানো, আমি জানি। কিন্তু সে কথা এখন থাক। প্রণামীর কথা পরে হবে। আগে শুনি তোমার সেই বিশেষ খবরটা কি।'

'আমাদের চক্রে এবার নেপাল থেকে দুই মস্ত তান্ত্রিক আস্ছেন। বক্রেশ্বরের এক গোপন স্থানে চক্র বস্বে। তান্ত্রিক তান্ত্রিকাদের ভীড় হবে বেশ। সেখানে সবাই চায় আপনার মত একজন শক্তিমতী তন্ত্রপূজারিনীর উপস্থিতি। আমার তান্ত্রিক গুরু দুর্গাদাস বাবার আদেশে আমিই চক্রের সব আয়োজন করছি। ওঁরই ইচ্ছানুযায়ী আজ আপনার কাছে এসেছি।'

সারা শরীরের রক্ত মুখে এসে জমেছে যেন আশামায়ির, তাঁর মুখ দেখে তাই মনে হল। অত্যন্ত আস্তে আস্তে কথা বললেন তিনি এবার। কিন্তু কণ্ঠস্বরের প্রতিটি যতিতে যেন ছুরির ফলা চক্ চক্ করছে। টেনে টেনে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন তিনি—'হরিদ্বারে আরোও একবার এম্নি প্রস্তাব দিয়েছিলে তুমি আমাকে। সেবার প্রণামী দিতে চেয়েছিলে দুই হাজার টাকা। তখন আমি তোমাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলাম—যারা গোপন চক্রে যোগ দেয়, অমি সেই জাতের তান্ত্রিকা নই। আমাদের জীবনে গোপনীয়তা বলে কিছু নেই। এইসব প্রস্তাব দাও গে যাও বীরাচারী—বামাচারীদের কাছে। আমি তোমায় বার বার নিষেধ করেছিলাম আমার সঙ্গে আর কোনদিন দেখা না করতে। কিন্তু সে কথা তুমি রাখলে না। গতবারের দুই হাজারকে এবার পাঁচ হাজার করে এনে ভেবেছো তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ আমি করবোই।'

অগ্রবাল বললেন—'আদেশ করেন তো এ টাকার অঙ্ক আমি আরও বাড়িয়ে দিতে রাজী আছি।'

ঝাঁ করে উঠে দাঁড়ালেন মায়ি। অদূরে কম্বলের ওপর রাখা ছিল তাঁর চিরদিনের ব্যবহার লোহার সেই বড় চিম্‌টাটা। বিদ্যুৎ গতিতে সেটা হাতে তুলে রোষ বিকৃত স্বরে বল্লেন তিনি—'বের হও এই মুহূর্তে এ-ঘর থেকে অগ্রবাল। নইলে তোমার মুখোস আজই আমি খুলে দেবো এখানকার সাধুদের মহলে, তখন অপমান আর অনুশোচনার সীমা থাকবে না তোমার।'

Scanned by CamScanner

ভীত, সন্ত্রস্ত অগ্রবাল পায়ে পায়ে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন বাইরের দরজার কাছে। চিম্‌টাটা নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন মায়ি অগ্রবালের দিকে। মুখে বলছেন হিস্ হিস্ করে—'তোমায় সাবধান করে দিলাম আমি—আর কোনদিন আসবে না আমার কাছে। যদি আসো, তোমার ঐ নোংরা বুদ্ধিভরা মাথাটাকে দুই ফালা করে দেবো আমি এই চিম্‌টার ঘায়ে। তুমি আমাকে চেনো না। আমি বরিশালের আশালতা, একশো সাঁইত্রিশ বছর বয়সের পরমা সাধিকা নেত্রামার আমি শিষ্যা—তুমি আমার সঙ্গে এসেছো মস্করা করতে? যাও,বের হও।' অগ্রবাল জুতো জোড়া ঘরে ফেলে রেখেই এক লাফে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হন। আশামায়ি তখনও ফোঁশ্ ফোঁশ করেছেন ক্রুদ্ধ আহত সর্পিনীর মত।

একটু শান্ত হলে, জয়ন্ত জান্‌তে চাইল—'হঠাৎ অমন রেগে উঠলেন কেন আপনি মায়ি অগ্রবালের ওপর? ও আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা প্রণামী দিতে চাইল, নিমন্ত্রণ জানালো বক্রেশ্বরে যেতে! এতে রাগ করার কি আছে?'

'ও আমায় চক্রে যোগ দিতে বলল শুন্‌লে না?'

'চক্র কি মায়ি?'

'সে এক অতি জঘন্য ব্যাপার। বীরাচারী, বামাচারী তান্ত্রিকদের মধ্যে কিছু নিম্নগামী লোক মাঝে মাঝে গোপন চক্রের আয়োজন করে। এই চক্রে স্ত্রী-পুরুষ তন্ত্রের নাম করে মদ খেয়ে মত্ত হয়ে অশ্লীল সব কাণ্ড করে। নিজেদের পাশবিক ইচ্ছা চরিতার্থ করে এরা ধর্মের দোহাই দেয়।' এই বলে একটু থেমে, অনেকটা স্বাভাবিক স্বরে আবার বললেন মায়ি—'একটু আগে বলছিলাম না—স্কুলের ভালছেলে আর মন্দছেলের কথা? এরা হচ্ছে ধর্ম-স্কুলের মন্দ ছেলেমেয়ের দল। তাই বলে, এদের দেখে,ধর্ম-স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীকেই খারাপ ভাব্‌লে চল্‌বে তোমাদের ঐ দিল্লীর নেতার মত?

জয়ন্ত জিজ্ঞেসা করলো—'আপনি ঐ গোপন চক্রের ভেতরকার খবর জান্‌লেন কেমন করে,মা? আপনি তো কখনও ঐ চক্রে যোগ দেন নি।'

'পড়েছি অনেক। পড়ে জেনেছি। আমাদের সাধন পথ তন্ত্রের পথ। তাই তন্ত্রের সব গ্রন্থই প্রায় পাঠ করে দেখেছি আমি। কুলার্ণব, গুপ্তসাধনতন্ত্র; নিরুত্তর তন্ত্র,শ্যামা রহস্য, প্রাণতোষিনী—এই সব বই পড়লেই জানা যাবে—ওদের সব নোংরা কীর্তিকলাপের কথা।'

একটু থামলেন মায়ি। চিম্‌টাটা যথা স্থানে রেখে আবার বললেন—'তোমাদের সেই দিল্লীর নেতা এদের দেখতে পায় না? এই, যারা সোনায় গা মুড়িয়ে, খুস্‌বু ছড়িয়ে, মুঠো মুঠো টাকার লোভ কেদখিয়ে, নষ্ট করছে সমাজের দরিদ্র মেয়েদের?'

Scanned by CamScanner

দুই

পৌষ সংক্রন্তির মকর-স্নান আগামী কাল। দলে দলে সাধু,সন্ন্যাসী,ব্রহ্মচারীরা এসে আশ্রয় নিয়েছেন। মাঘী মেলার জন্যে প্রস্তুত করা বিভিন্ন ক্যাম্পে এবং সাধুনিবাসে। নানা স্বেচ্ছাসেবী সংঘও তাঁবু গেড়েছে। সেখানে ভীড় সাধারণ স্নানার্থী যাত্রীদের। ব্যাজ পরে ভলেন্টিয়ারদের দৌড়াদৌড়ি, মাঝে মাঝে পুলিশ-চৌকির বাঁশি বাজানো, ঝলমলে আলো, মাইকের অবিরাম গোঙানি—সব মিলে শীতের রাত্রিতেও গম্-গম্ করছে চারিদিক। সংক্রান্তির স্নানের পরেই শুরু হবে মাঘীমেলা। চলবে এক মাস। প্রশাসনিক প্রস্তুতিও সেই অনুযারী মেলা-প্রঙ্গণে।

আশামায়ি ঠাঁই পেয়েছেন এক বৈষ্ণব আশ্রমের ঘরে। গৃহীভক্ত অনেকেই চেয়েছিল মায়ি তাদের গৃহে বাস করে তাদের গৃহকে পবিত্র করে দিন। কিন্তু, কোন গৃহীর বাড়ীতে রাত্রিবাস করেন না কখনো মায়ি। এটা তাঁর গুরুর নিষেধ গত দশ বছরে জয়ন্ত বেশ ভাল ভাবেই লক্ষ্য করেছে—উচ্চাঙ্গের সাধু মহলে কেবল নয়, হিমালয়ে যাতায়াত করে এমন প্রায় সমস্ত সাধক আর উপাসকেরা আশামায়িকে অন্যরকম এক আন্তরিকতা নিয়ে সন্মান করে,সমীহ করে। যে কোন চটী, ধর্মশালা বা আশ্রমে গিয়ে দাঁড়ালে—সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে তাঁর সেবা করতে। এখানকার আশ্রমে পরিচালকবর্গও সদা সচেতন—মায়ির যাতে অসুবিধা কিছু না হয় কোন ভাবেই। বালগোপালের ভোগের মূল থালাটা এঁরা তুলে এনে দিয়ে যান আশামায়িকে—তাঁর আহারের সময় হলে একজন লোককে সব সময় কাছাকাছি রেখে দেন—মার সুবিধা অসুবিধার তদারকী করার জন্যে।

দুপুরে প্রসাদ গ্রহণ করার আগে আশামায়ি বলেছিলেন—'এও এক ধরণের বিশ্বাস, জানো মিন্‌সা?'

জয়ন্ত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি পুনশ্চ বললেন—'এই যে সাধু দেখলেই নাক সিঁটকানো,তাদের ঠগ ভাবা এ এক মস্ত ভ্রান্তিবিলাস। সাধু-সন্ত-যোগী ফকির—এরা সবাই যে যার পথে চলছে বটে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য এদের একটাই— ঐ অত্মোপলব্ধি। পথে কেউ পিছিয়ে পড়েছে, কেউ গেছে এগিয়ে। তাতে কি আসে যায়? পথটা তো ধরেই আছে ওরা। যারা পথভ্রষ্ট হচ্ছে, তারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে চিরদিনের মত। তাই বলে পথটাতো আর খারাপ নয়। পথকে তো ঘৃণ্য বলা যায় না। একটা কি দুটো অগ্রবালকে দেখে যেমন দুনিয়ার সমস্ত সংসারীকে খারাপ বলা যায় না, ঠিক তেমনি দুটো চারটে অসৎসাধুকে দেখেই

Scanned by CamScanner

দেশের সমস্ত উপাসকসম্প্রদায়কে সম্ভোগপ্রিয়, লোভী, দুর্নীতিপরায়ণ—এসব কথা বলা ঠিক নয়।' মায়ির কথা শুনে জয়ন্ত বুঝতে পারছিল—দিল্লীর সেই বিশ্ব বরেণ্য নেতাটির উচ্চারিত উক্তি ভুলতে পারছেন না তিনি কিছুতেই।

সন্ধ্যার একটু পরেই মা বেরিয়ে গেলেন। মাথায় গেরুয়া পাগড়ী,অঙ্গে গেরুয়া আলখেল্লা, চাদর আর কাপড়। কপালে ভস্মের টিকা। ডান হাতে চিমটা,বাঁ হাতে ভিক্ষাপাত্র—সানকী। চিমটার কড়াতে আওয়াজ তুল্‌তে তুল্‌তে পথ হাঁটেন তিনি। কেউ যদি তাঁকে দেখে নমস্কার জানায়,অথবা তাঁর ভিক্ষাপাত্র সানকীতে ফেলে দেয় কিছু পয়সা, থমকে দাঁড়িয়ে যান তিনি সেখানে। সানকীর ভেতর থেকে যজ্ঞ-ভস্ম বৃদ্ধ অঙ্গু-লিতে লাগিয়ে নিয়ে তারই টীকা এঁকে দেন তিনি সেই নমস্কারকারী অথবা ভিক্ষাদাতা পথচারীর ললাটে। আশ্চর্য্য গম্ভীর স্বরে উচ্চরণ করেন—'হরি ওম্ তৎ সৎ'। তার পরক্ষণেই—আবার চিমটায় আওয়াজ তুলে পথ চলা শুরু করেন তিনি—ঝনাৎ ঝন্ ঝনাৎ ছন। সন্ধ্যায় যাবার সময় বলে গেলেন—'আমি না ফেরা পর্য্যন্ত তুমি কিন্তু কোথাও বেরোবে না মিন্‌সা।' ওঁর আদেশ রক্ষা করেই একা বসে অপেক্ষা করছিল জয়ন্ত। উনি ফিরলেন রাত্রি প্রায় ৯টায়। ফিরেই, হাতের সানকী আর চিম্‌টাটা রেখে দিয়ে পুনর্বার বেরুবার উদ্যেগ করতেই জয়ন্ত শুধালো—'আবার কোথায় যাচ্ছেন এই ঠাণ্ডায়, এত রাত্রে?'

মায়ি হাসলেন একটু। বললেন—'আমার মাথায় এখন একটি মাত্র চিন্তা—কেমনভাবে তোমার মনের সংশয় মুছে ফেলে আমি প্রমাণ করবো—দিল্লীর নেতা রাজনীতিতে বড় হতে পারেন, বিশাল এই পুণ্য দেশের বিরাট অধ্যাত্মপ্রাণ পুরুষটির খবর উনি আজও পান নি। তাই, ভোগ সর্ব্বস্ব সহরের কয়েকটি সাধরণ গেরুয়াধারীকে দেখেই উনি ঘোষণা করে বসলেন— সব সাধু-সন্ত ব্রহ্মচারীরাই মানুষের কাছ থেকে ধর্মের নামে টাকা নিয়ে সম্ভোগ আর আলস্যে সুখে দিন কাটায়।'

'ও কথা ভুলে যান মায়ি!' জয়ন্ত বলল।

'ভুলতে পারতাম, যদি তোমার মনে কোন সংশয় দেখা না দিত। তুমি যে বললে তোমারও মাঝে মাঝে মনে হয়—ঐ নেতা ঠিকই বলেছেন।'

এই বলে, আশ্রমের জনৈক ব্রহ্মচারীকে ডেকে জানিয়ে দিলেন যে উনি জয়ন্তকে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে বেরুচ্ছেন। প্রসাদের থালা যেন মায়ির ঘরে রেখে দেওয়া হয়,উনি ফিরে এসে প্রসাদ গ্রহণ করবেন।

'আমাকেও যেতে হবে?' জয়ন্ত প্রশ্ন করলো।

'নিশ্চয়! আজ রাত থেকেই শুরু হল তোমার মনের সংশয় ঘোচানোর কাজ।

Scanned by CamScanner

সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম খোঁজ খবর নিতে—মাঘী মেলায় যোগ দিতে কোথায় কোন ধরণের সাধুরা এসে উঠেছেন।'

এখন মার হাতে চিমটা নেই, সানকী নেই, পথ চলার শব্দ উঠছে না কোন। নিঃশব্দে পথ চলে সঙ্গমঘাটের দিকে যেতে গিয়ে ভারত সেবাশ্রম সংঘের পাশেই একটি গলির মধ্যে ঢুকে একটা দোতলা বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রবেশ পথে বেশ ভীড়। কেউ ঢুকছে কেউ বেরুচ্ছে।

একটা বেশ বড় ঘরের মাঝখানে একটি প্রায় পাঁচ ফুট দীর্ঘ কাঠের পাটাতনে সারি সারি ছয় ইঞ্চিলোহার কাঁটা বসিয়ে কণ্টক শয্যা বানানো হয়েছে। সব ছুঁচলো কাঁটা গুলির ওপর শুয়ে আছেন এক জটাধারী সন্ন্যাসী। সর্ব্বাঙ্গে এক মাত্র কৌপীন ছাড়া আর দ্বিতীয় বসন নেই। লোহার কাঁটা এই বিছানায় খালি গায়ে কেমন টান হয়ে শুয়ে আছেন সন্ন্যাসী,শুয়েই ভক্তদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। মাথাটাও রয়েছে ঐ লোহার কাঁটারই ওপরে।

মায়িকে দেখেই উঠে বসলেন তিনি ঐ কাঁটার বিছানায়।

করযোড়ে নীরবে স্বাগত জানালেন তাঁকে। মা হিন্দিতে বললেন—'বিঠ্-ঠল মহারাজ, সব কুশল তো?'

"সব কুশল মাতাজী আপনার আশীর্বাদে"

'এই যে কাঁটার বিছানায় সর্ব্বদা শোয়া বসা,তা এতে কষ্ট হয় না?' সন্ন্যাসী বিস্ময় প্রকাশ করলেন—'কষ্ট? না মাতাজী কষ্ট কিছু নেই। কেবল আনন্দ। ভগবান শঙ্করে সাধনা করছি, কষ্ট থাক্‌বে কোথা থেকে?'

'ক'বছর হল এই সাধনার?'

'বেশী নয়, এগারো বছর। চোদ্দ বছর সাধনা করতে হবে এই ভাবে—গুরুজীর নির্দ্দেশ। এখনও তিন বছর বাকী।'

এগারো বছর! এগারো বছর ধরে লোকটা কাঁটার বিছানায় শুয়ে বসে কাটাচ্ছেন, অথচ মুখে কোন গ্লানি নেই,অসন্তোসনেই, ক্লেশের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। কি পাচ্ছেন ও ঐ কন্টক শয্যায় শুয়ে?

নমস্কার জানিয়ে সেখানে থেকে বেরিয়ে এসে আবার রাস্তায় দাঁড়ালেন মায়ি। কোন কথা না বলে পথ চলতে শুরু করলেন। কিছুদূর গিয়ে একটা মঠের সামনেকার ছোট খোলার মাঠে দেখা গেল বেশ লোকের ভীড় জমছে। পৌষের এই হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়েও—কী যেন দেখছে তারা একভাবে।

মায়িকে দেখেই,তাঁকে প্রণাম জানিয়ে, মঠের এক সেবক এসে,ভীড় সরিয়ে নিয়ে গেল চক্রাকারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের ব্যুহর ঠিক মধ্য স্থলে। সেখানে যা

Scanned by CamScanner

ঘট্‌ছে, তা দেখে তো জয়ন্তের বিস্ময়ের আর সীমা পরিসীমা রইল না।

কিছুটা মাটি খুঁড়ে মুণ্ডুটা তার মধ্যে ঢুকিয়ে গলা পর্যন্ত মাটি দিয়ে চাপা একটা লাল নেংটি পরা কুচ-কুচে কালো মানুষ শীর্ষাসন করে রয়েছে স্থির হয়ে। মাথাটা ছাড়া দেহের আর সমস্ত অংশটাই বেরিয়ে আছে মাটির ওপরে। এমন কি হাত দু'খানাও। কিন্তু, লোকটা নিঃশ্বাস নিচ্ছে কেমন করে?

'এম্‌নি শীর্ষাসন কি রোজ করেন বিষ্ণু মূর্তিজী?' মা শুধালেন মঠের সেবককে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, দুই ঘণ্টা সকালে, এক ঘণ্টা রাত্রিতে।'

'শ্বাস প্রশ্বাস চলে কেমন করে?'

'আসলে নীচের গর্তটা মাথার চেয়ে অনেকটা বড়। কেমন ভাবে যেন সেখানে মাথাটা রাখেন। রেখে শীর্ষাসন শুরু করেন। তখন আমরা—দুটো কাঠের পাটা গলার দুইদিক থেকে দিয়ে তাতে মাটি চাপা দিয়ে দিই।'

'সময় কেমন করে বুঝতে পারেন উনি?'

'উনিতো ওসবের হিসাব রাখেন না। আমরা ঘড়ি দেখে,মাটি সরিয়ে,ওঁকে ঠিক সময়ে তুলে দাঁড় করিয়ে দি। কিন্তু তখন উনি দাঁড়াতে পারেন না। মিনিটি পনেরো দুই একবার টলে টলে পড়েন। তারপর আস্তে আস্তে আবার স্বাভাবিক হয়ে আসেন।'

'এই রকম শীর্যাসন কতদিন হল করছেন?'

'দুই বছর পার হয়ে তৃতীয় বছরে পড়েছে ওঁর এই সাধনা। এই বছরটা শেষ হলেই উনি গুরুর কাছ থেকে অন্য নির্দেশ পাবেন।'

দর্শকদের ব্যুহ থেকে বেরিয়ে আসার সময় একটা প্রশ্ন এসে দেখা দিল জয়ন্তের মনে।—নিজের ওপর এমন দৈহিক পীড়ন করে এরা পায় কি? কি লাভ হয় এদের? যখন বিঠ-ঠল বাবা উঠে বসলেন কণ্টক শয্যার ওপর, তখন খুব ভাল করে লক্ষ্য করেছে জয়ন্ত—সমস্ত পিঠে তাঁর ক্ষতচিহ্ন সুস্পষ্ট।

মায়ি গম্ভীর ভাবে পথ চলা শুরু করলেন আবার। প্রশ্ন না করলে একটি কথাও বলছেন না নিজে থেকে। রাত যত বাড়ছে,শীতের হাওয়াও বইছে ততই বেগে হু হু করে।

'এঁরা কি সবাই এই এলাহাবাদেরই বাসিন্দা?'জয়ন্তের প্রশ্ন।

'না এঁরা বছরের অন্য সময় থাকেন অন্যত্র। কুম্ভমেলা,মাঘীমেলা, গঙ্গাসাগর মেলায় এঁরা হাজির হবেনই। স্নান করবেন, পাঠ-প্রবচন শুন্‌বেন। তারপর মেলা সাঙ্গ হলে আবার ফিরে যাবেন নিজের নিজের আস্তানায়— আড্ডায়।'

'এবার আমরা কার কাছে যাবো মা?'

Scanned by CamScanner

'এক দরবেশের কাছে।'

'দরবেশ! নাম শুনেছি দরবেশের কিন্তু চোখে দেখিনি কখনও। দরবেশ কি সন্ন্যাসী?'

'না। কিছুটা বাউলদের মত এরা। অনেক পণ্ডিতের মতে এই দরবেশ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন শ্রীচৈতন্য পার্ষদ শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী। জনশ্রুতি বলে, তিনি দরবেশ অর্থাৎ ফকিরের বেশ ধারণ করে গৌড় বাদশাহের কাছ থেকে পালিয়ে কাশীধামে গিয়ে শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে আসেন এবং পরে চৈতন্য মতাবলম্বী হয়ে পড়েন। শ্রীসনাতন দরবেশের বেশ গ্রহণ করেছিলেন বলে,এক শ্রেণীর বৈষ্ণব ঐ বেশ ধারণ করে পৃথক সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছে। গায়ে আলখেল্লা,ডোর আর কৌপীন ব্যবহার করে এরা। বজ্রফল, স্ফটিক, প্রবাল প্রভৃতি দিয়ে মালা প্রস্তুত করে গলায় ধারণ করে দেশে দেশে পর্যটন করে বেড়ায়। কঠোর নিয়মে একাদশীর উপবাস পালন করে। আর মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলে ওঠে— 'জয় জয় দীনদরদী।' ওদের ধর্মসঙ্গীত বলছে— 'কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান। মিল জুলকে করো সাঁইজীকাকাম।'

'এই দরবেশকে .অপনি আগে কখনো দেখেছেন?'

'প্রায়পাঁচ-ছ বছর আগে দেখছি ওকে বিভিন্নধর্মমেলায়। বয়েসে তোমার মতই হবে,তেইশ কি চব্বিশ। বীরভূমের মানুষ। দরবেশের নারী গ্রহণের নিষেধ নেই। স্বামী-স্ত্রীর মত কাটিয়ে দেয় ওরা সারা জীবন। এই ছেলেটির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল একটি মেয়ের। তাকে ও কথা দিয়েছিল জীবন সঙ্গী করার। কিন্তু পরে,এক ত্যাগী তন্ত্রসাধকের সঙ্গলাভ করে ত্যাগের দিকে ঝুঁকে পড়ে ওর মন। মেয়েটির কাছ থেকে পালিয়ে আসে ও কথা রক্ষা না করেই। গত এক বছর ধরে সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে দীননাথ ওর দরবেশ গুরুর আদেশে। 'দেখবে চলো, কী সে প্রায়শ্চিত্ত।' একটা একতলা বাড়ীর ছোট একটি ঘরের মেঝেতে বসেছিল দীননাথ। সতরঞ্জির ওপরে একটি আসনে বসেছিল সে। চেহারায় বেশ উজ্জ্বলতা আছে। কিন্তু জীভটা ঠোঁটের বাইরে বের করা। আশামায়ি কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন—'যে জীভ দিয়ে কথা দিয়েছিল দীননাথ মেয়েটাকে, সেই জীভ ফুটো করে তার মধ্যে একটা খড়ের কাঠি ঢোকানো রয়েছে দ্যাখো। এই অবস্থায় ও রয়েছে প্রায় এক বছর। এক বছর শেষ হলেই ওর প্রায়শ্চিত শেষ হবে। তখন ও সেই ত্যাগী তন্ত্র-সাধকের আদেশ অনুযায়ী চলবার যোগতা অর্জন করবে।'

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল জয়ন্ত দীনতাথের জীভ বের করা যৌবনদৃপ্ত

Scanned by CamScanner

মুখ-খানার দিকে। এ পৃথিবীতে কত যুবকই তো কত যুবতীকে বিবাহ করার কথা দেয়, আবার তা ভাঙ্গেও, কিন্তু এমন কঠিন প্রায়শ্চিত কেউ কোন দিন করেছে বলে তো শোনে নি জয়ন্ত কখনও।

ছেলেটিকে ঘিরে বসেছিল অনেক পুরুষ-নারী সতরঞ্জিটার ওপরে। মায়ির চোখে চোখ পড়তেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন দরবেশ। এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন মায়ির চরণ স্পর্শ করে। মায়ি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নেহে শুধালেন—'ভাল আছো তো বাবা?'

খড়কাঠি লাগানো জীভ নেড়েই বিকৃত উচ্চারণে দীননাথ বলল'খুব ভাল আছি মা।'

'তোমার প্রয়শ্চিত্ত শেষ হতে আর কতদিন বাকী বাবা?'

ডান হাতে তিনটে আঙ্গুল তুলে সামনে ধরে দীননাথ জানালো—তিন মাস।

'তারপর কি করবে?'

জড়িত জিহ্বায় উত্তর এলো—'কোটেশ্বরে। সেই মহাত্যাগী তন্ত্র-সাধকের কাছে যাবো।'

'কোটেশ্বর? নিজমাবাদ দিয়ে যেতে হয় যেখানে? সে তো তবে গাড়োয়ালের মধ্যেই পড়লো। ভালই হল। গাড়োয়ালের সব প্রান্তেই তো আমায় যেতে হয় নানান কাজে। আবার কোন দিন দেখা হবে নিশ্চয়।'

এই বলে,দীননাথের মাথায় আর একবার হাত বুলিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন মায়ি তার কাছ থেকে। তারপর ধরলেন সোজা সঙ্গমঘাটের পথ—যেখানে তাঁবুতে দুর-দুরান্তর থেকে আসা সাধু, ব্রহ্মচারী থৈ থৈ করছে এখন। দপ্‌দপ্ করছে সরকারী তত্ত্বাবধানে লাগানো বিরাট বিরাট ফ্রাড লাইটগুলি, গমগম করছে পুণ্যার্থীদের সমাগমে চতুর্দ্দিক গাঁক গাঁক করে এক নাগাড়ে নানা ঘোষণা করে চলেছে ক্যাম্পে ক্যাম্পে বসানো মাইকগুলো। কোথাও বা প্রবচন শোনার ভীড় জমেছে শ্রোতৃবর্গের।

এরই মধ্যে দিয়ে পথ চলে যে তাঁবুটিতে গিয়ে ঢুকলেন এবার আশামায়ি, তাকে দেখা গেল লোকের আনাগোনা অপেক্ষাকৃত কম।

অদূরে মধ্যবয়সী দাড়ি-গোঁফ আর বড় বড় চুলওয়ালা এক ব্রহ্মচারী এক পা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পরনে লুঙ্গির মত করে পরা সাদা কাপড় ও একটি সাদা ফতুয়া। সামনে, দুদিকে তিন হাতি দুটো পোঁতা বাঁশের মাথায় একটা শুরু বাঁশ বেঁধে অনেকটা ছোট গোল-পোষ্টের মতন করা। সেই মাথার বাঁশটির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ব্রহ্মচারী। মায়িকে দেখেই উৎফুল্ল হয়ে চিৎকার করে উঠলেন—'জয় মা,জয় মা। প্রণাম মাতাজী।'

Scanned by CamScanner

'এই ছেলেটি এসেছে তোমায় দেখবে বলে'জয়ন্তকে দেখিয়ে আশামায়ি বললেন।

' আমার মধ্যে আর কি দেখার আছে মাতাজী।'

'এই এক পায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করা—একি কম কথা? ক'বছর হল এই অবস্থায়?'

'সামনের ফাল্গুনে পাঁচ বছর পূর্ণ হবে।'

'শুনলে মিন্‌সা? পাঁচ বছর ধরে এক পায়ে এমনি দাঁড়িয়ে আছেন এই বাবা সামনের ঐ বাঁশের খোঁটা-টাকে ধরে। পেচ্ছাপ-পায়খানার সময় ছাড়া সব সময় অমনি এক পায়ে দাঁড়িয়ে। পা বদল করতে হলেও দুটো পা একসঙ্গে মাটিতে ফেলতে পারবে না। লাফিয়ে বদল করতে হবে পা।'

'আর ঘুম পেলে?' জয়ন্ত জানতে চাইল। 'একপায়ে দাঁড়িয়ে ঐ বাঁশের ওপর মাথা রেখেই ঘুমোবে, খাওয়া দাওয়াও ঐ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই।' উত্তর দিলেন মায়ি।

কী আর্শ্চয্য! পাঁচ বছর লোকটা এই অবস্থায় দিনাতিপাত করছে, অথচ চোখ মুখ ভরা এক আনন্দের দ্যুতি। কোথা থেকে আসে এত হাসি এমন অবিরাম দৈহিক পীড়নের পরেও? 'আচ্ছা মা, ইনি এখান থেকে ওখানে যাতায়াত করেন কেমন করে? এক পায়ে লাফাতে লাফাতে।' 'না। সাধারণ মানুষের মতই উনি চলতে পারবেন। কোন জায়গায় দাঁড়ালেই এক পায়ে দাঁড়াতে হবে, আর বসতে বা শুতে পারবেন না কোথাও। যা করবেন ঐ এক পায়ে দাঁড়িয়েই।'

অনেক রাত্রে, নিজের ঘরে শুতে যাবার আগে মায়ি বললেন জয়ন্তকে ডেকে, আজ যা যা দেখলে নিজের চোখে তাতেও কি তোমার মনের সংশয়ের বরফ একটুও গলতে শুরু হয় নি মিন্‌সা?'

'কিন্তু, দেহের ওপর এই যে অমানুষিক নিপীড়ন—'

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন মায়ি— তোমার মনে প্রশ্ন আসতে পারে—শরীরের ওপর এমন স্বেচ্ছা পীড়ন করে লাভ কি?সে প্রশ্ন উঠতেই পারে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই সব তপস্বীদের বিশ্বাসেরও তো একটা মূল্য আছে। এঁরা বিশ্বাস করেন— এমনি ভাবে দৈহিক কষ্ট স্বীকার করলে একদিন ঈশ্বর-উপলব্ধি হবেই। সেই বিশ্বাস নিয়েই এঁরা এমন কঠোর জীবন যাপন করছেন। এ বিশ্বাসে কোন ফাঁক-ফাঁকি নেই। আর, জানো তো মিন্‌সা, বিশ্বাসের আর এক নামই ভগবান।' এই বলে মুহূর্তের জন্যে নীরব হলেন তিনি। তারপর হঠাৎ অত্যন্ত উত্তিজিত স্বরে বলে উঠলেন আবার—' এবার তুমিই বল, এদের মধ্যে সম্ভোগ-সুখ কোথায় দেখতে পাচ্ছো তুমি।'

Scanned by CamScanner

তিন

ভোরে ঘর থেকে বেরিয়ে জয়ন্ত তো অবাক। ঝোলা ঝুলি—সান্‌কী চিম্‌টা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন মায়ি। কপালে টাটকা ভস্মের টিকা। জয়ন্তকে দেখেই হেসে বললেন—'এ যাত্রায় আর মাঘী মেলায় থাকা হল না আমার মিন্‌সা। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নও। এক ঘণ্টার মধ্যে ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ী ধরতে হবে আমাদের।'

'সেকি? হঠাৎ সব প্রোগ্রাম পাল্টে গেল কেন?'

'তোমার মনের সংশয় সম্পূর্ণ ভাবে দূর করতে, সমস্ত সাধু-সন্ত সম্পর্কে সেই দিল্লীর নেতার ধারণা যে কত বড় ভুল—তা প্রমাণ করতে, আমাকে যে এখন যেতে হবে আরও দুটো জায়গায়। উত্তরকাশী আর দেবপ্রয়াগে।'

'সে তো অনেক দূর।'

'সেই দূরেই তোমাকে যেতে হবে সত্যকে জানবার জন্যে।'

ব্রহ্মবিদ ভারতের আধ্যাত্মিক প্রাণ পুরুষের সঠিক পরিচয় জানতে পারবে না মিন্‌সা প্রাসাদ নগরীর ভোগ লালসার অগ্নিগহ্বরে বসে। তা জানার জন্যে যেতে হবেই তোমাকে পর্ব্বত কন্দরে,অরন্যে,নির্জ্জন প্রান্তরে। না হলে তুমিও ঠিক ভুল করে বসবে দিল্লীর ঐ নেতাটির মতই।'

এরপর আর কিছু কথা থাকতে পারে না। জয়ন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লো যাত্রার জন্যে তৈরী হতে।

ট্রেনে, বাসে অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হবে। সারাপথ মাতাজী নীরব। চোখে মুখে এখনও সেই গাম্ভীর্য,দৃষ্টিতে এখনও সেই ক্রোধের ছায়া। কি কুক্ষণে যে জয়ন্ত খবরের কাগজ থেকে নামী সেই নেতার উক্তিটা পড়ে শুনিয়ে ছিল মায়িকে—যার ফলে মাঘী মেলা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন তিনি। দেশের সমস্ত সাধু-সন্তকে সম্ভোগ আর আলস্য সুখে মত্ত থাখতে দেখেছে নাকি দিল্লীর ঐ নেতা। এত বড় একটা মিথ্যাকে কাগজে ফলাও করে বের করা হয়েছে দেখে তেজস্বিনী মায়ির ভেতরকার তেজ ফেটে বেরিয়ে অসেতে চাইছে যেন প্রতি মুহূর্তে। সত্যের অপলাপ দেখলে সাত্বিক মানুষদের অন্তর্দাহ এমনি রূপই নেয় বোধহয় চিরকাল।

নরেন্দ্রনগর থেকে এক ভদ্রলোক উঠলেন বাসে। প্রতিভা উজ্জ্বল চেহারা বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। ড্রাইভারের ঠিক পেছনে লম্বা যে বেঞ্চটা,তাতে তিনজন বসতে পারে। আশামায়ি আর জয়ন্ত এতক্ষণ বসেছিল সেই বেঞ্চেই,এবার ঐ

Scanned by CamScanner

ভদ্রলোক এসে বসলেন জয়ন্তের পাশের জায়গাটুকুতে। খুব সপ্রতিভ মানুষ। হাত যোড় করে প্রথমে মায়িকে নমস্কার জানালেন। তারপর ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে পরিচয় দিলেন নিজের। নাম সুন্দর রাজন। দক্ষিণ ভারতের মানুষ। চাকুরীস্থল থেকে দুই মাসের ছুটি নিয়ে যে সংস্থার পক্ষ থেকে তিনি হিমালয়ে এসেছেন এবার পরিক্রমায়, সে সংস্থার মুখ্য কাজই হচ্ছে—অলৌকিকতা বলে যে কিছু নেই এই দুনিয়াতে—তা প্রমাণ করা। সেই সংস্থার মতে অলৌকিক কাণ্ডকারখানা যারা দেখায়, তারা সবাই একধরণের প্রতারক। ধর্মভীরু ভক্তসাধারণের ধর্ম অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে অলৌকিকতাবাদের প্রচারকরা বুজরুকীর পথে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে থাকে সেই প্রতারণার সাহায্যে। এই পর্য্যন্ত বলে, আবার একথাও শুনিয়ে দিলেন মায়িকে—'সাধু সজ্জনদের সঙ্গে আমাদের কোন ঝগড়া নেই, মাতাজী, আমাদের জেহাত অলৌকিকত্বের নামে প্রতারণার বিরুদ্ধে।' গগনচুম্বী পাহাড়ের প্রাচীর ঘেঁষে রাস্তা একপাশে পাহাড় অন্যধারে খাড়াই নেমে গেছে বিরাট বিরাট প্রস্তর সঙ্কুল খাদ—কয়েক শো গজ নীচ দিয়ে প্রবাহিত খরস্রোতা গঙ্গার বুক পর্য্যন্ত। কখনো কুয়াশা, কখনো নির্মল আকাশ। ভারী ভাল লাগছিল জয়ন্তের চারিধারের পরিবেশকে। মায়ি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন—'অলৌকিতা সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু অসাধারণ সাধক সাধিকা যে আছেন আমাদের দেশে সেকথা তো মানো?'

'কেমন করে মন্‌বো? অলৌকিক কাণ্ড না দেখিয়ে অসাধারণ হতে পেরেছেন কোন সাধক? তেমন সাধকের খবর অন্ততঃ আমার তো জানা নেই।'

' কখনো দ্যাখোনি এমন কোন সাধক বা সাধিকাকে যিনি অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন না করেও তাঁর অসাধারণত্বের সাক্ষ্য রেখে যান জীবনে প্রতিটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে।'

'আমি বিশ্বাস করি না তেমন সাধু আজকের পৃথিবীতে আছে। হয়ত অতীতে ছিল কখনো।'

'কোথায় চলেছো এখন? টিহ্‌রী নাকি?'

' না,উত্তরকাশীতে।'

' উদ্দেশ্য?'

'সাধুদের মধ্যে কিছুদিন থেকে, তাদের বুজরুকীগুলো স্টাডি করা। ফিরে, রিপোর্ট দেবো সংস্থার কাছে।'

এরপর বেশ কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। টপগিয়ারে গর্জন তুলে বাসখানি তখন চড়াই এর পথ ধরেছে। বসে বসে কি যেন ভাবলো সুন্দররাজন কিছুক্ষণ। তারপর

Scanned by CamScanner

পশমের টুপীটা মাথা থেকে অকারণেই খুলে হাতে নাড়াচাড়া করতে করতে প্রশ্ন করলো—'অসাধারণ সাধক সাধিকা বলতে আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন মাতাজী?'

'তার আগে তুমি বলো—বুজরকী তুমি বলতে চাচ্ছ কাকে?'

'এই কারুর অসুখ হলে তুক্-তাক করা, কারুর ভাগ্য পরিবর্তন করবার জন্যে তাবিচ, কবচ, রত্ন দেওয়া, শূণ্য থেকে সোনার হার, হাতের আংটি, যজ্ঞ ভস্ম বের করা, এই ধরণের কাজকেই আমরা বুজরুকী বলে থাকি। একটা মজার ঘটনা আপনাকে শোনাই। ঘটনাটা কিন্তু ইতিহাসের নামে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভক্তমালে আছে এই কাহিনী। সন্ত-তুলসী এই সেদিনকার লোক, পুরাণের কোন দেবতা নন,তাঁকে নিয়েও অলৌকিক গল্প ফেঁদে বসেছেন গ্রন্থকার। কাশীতে হনুমান দর্শনের পরে তুলসীদাসের যশ যখন ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে, তখন নাকি বাদশা শাজাহান তুলসী সাদরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেন—শ্রীরামচন্দ্রকে আনয়ন করো। তুলসী বাদশার অনুরোধ প্রত্যাখান করলে বাদশা তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। তখন শুরু হল এক সাংঘাতিক অলৌকিক কাণ্ড। লক্ষ্য লক্ষ্য বানর একত্রিত হয়ে তখন সেই কারাগার এবং তৎসংলগ্ন বাড়ীগুলি ভেঙ্গে তচ্‌নচ্ করে দিতে আরম্ভ করলো। বানরদের অত্যাচারের ভয়ে দলে দলে মানুষ পালাতে লাগলো অন্যত্র। তখন আতঙ্কিত বাদশা শাজাহান সন্ত তুলসীদাসকে মুক্ত করে দিলেন কারাগার থেকে। আচ্ছা, বলুন তো—তুলসীকে বন্দী করলো, অমনি লক্ষ্য লক্ষ্য বানর এসে কারাগার ভাঙ্গতে শুরু করলো? এমন ঘটনা বাস্তবে কি ঘটতে পারে কখনো? অথচ অলৌকিকত্ব প্রমাণ করার জন্যে ইতিহাসের নাম জড়িত করে কেমন উদ্ভট অবিশ্বাস্য সব ঘটনা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ভক্তমালের মধ্যে।'

হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠলেন মায়ি। হাসতে হাসতেই বললেন, 'গল্পটা যে আজগুবী কেবল তাই নয়, সমস্ত কাহিনীটাই অনৈতিহাসিক। তুলসীদাস শাজাহানকে কেচাখেও দেখেন নি কোনদিন।'

'তার মানে?' সুন্দররাজনের বিস্মিত প্রশ্ন।

'তার মানে—জাহাঙ্গীর বাদশার রাজত্বকালেই সন্ত তুলসীদাস লোকান্তরিত হয়েছিলেন, সাজাহান বাদশা হওয়ার অনেক আগেই।' এই পর্য্যন্ত বলার পর সুন্দর সুর করে আবৃত্তি করলেন মায়ি-

'সম্বৎ সোলহ সর অসী গঙ্গাকে তীর।
সাবণ শুক্লা সত্তম তুলসী তজ্যৌ শরীর।।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১৬৮০ সম্বৎ-এ তুলসীদাস শরীর ত্যাগ করেন। এখন বুঝতে পারছো, অলৌকিকত্ব প্রচার করতে গিয়ে যে গল্পটা ফাঁদা হয়েছে ভক্তমাল-

Scanned by CamScanner

এ তুলসীদাস আর শাজাহানকে নিয়ে তা নিছকই একটা মনগড়া ব্যাপার।

'আপনি ভক্তমাল পড়েছেন মাতাজী?' ক্রমেই বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে সুন্দর রাজন মায়ির প্রতি। গৈরিক বসনা অশ্চর্য্য রূপৈশ্বর্যময়ী এক সন্ন্যাসিনী—তিনিও বলছেন ভক্তমালের কাহিনী মনগড়া গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। গল্পের মধ্যেকার বানর বৃত্তান্তটিকে তিনিও সত্য বলে গ্রহণ করেননি অন্তরে?কেবল বিদুষীই নন; বিরাট উদার এক বিদগ্ধ হৃদয়ের অধিকারিনীও বটে এই সন্ন্যাসীনী।

ঝাঁকানি দিতে দিতে বাস দৌড়ে চলেছে তার গন্তব্যের দিকে। ধরাস্বরে মায়ি বললেন—'আমি অলৌকিক টলৌকিক বুঝি না। আমি জানি অসাধারণ সাধক-সাধিকার অনন্য সাধারণ শক্তির কথা—যা নিজের চোখে দেখেছি,যাচাই করেছি দিনের পর দিন।'

'তাই নাকি?' সুন্দররাজন বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন মনে হল, 'কোথায় গেলে তেমন সাধুর দেখা পাবো। আপনার মত আমিও। চোখে না দেখলে আর নিজে বিচার না করলে, কোন জিনিসকেই সত্য বলে মেনে নিতে রাজী নয়, আমার মন।'

'বেশ তো যাচ্ছই তো উত্তরকাশীতে,সেই খানেই দেখতে পাবে একজন মহাপুরুষকে।'

'তাঁর বিশেষত্বটা কি মাতাজী? তিনি কি তুক্‌-তাক্‌ করেন?'

বেশ গম্ভীর শোনালো এবার সন্ন্যাসিনীর কণ্ঠ—'না। ওসব তুক-তাক টুক তাক কিছুই করেন না তিনি। যারা তুকতাক করে তারা প্রবঞ্চক কিনা আমি বলতে পারবো না। তবে তারা যে উচ্চকোটীর সাধক নয় সেটা হলফ করেই বলা যায় বোধ হয়।'

'তবে উত্তরকাশীর সেই সাধু যাঁকে মহাপুরুষ বলছেন আপনি—তাঁর অসাধারণত্বতা কোথায়?' সেটা নিজে গেলেই দেখতে পাবে। সে এক অবিশ্বাস্য বিস্ময়। আমি তো গেরুয়া পরা সাধুনী। আমার মুখে এক সাধুর প্রশস্তি শুনলে তোমার মনে ততটা সাড়া না জাগতেও পারে। তাই ঐ মহাপুরুষ সম্বন্ধে শুনতে হবে তোমাকে কোন গৃহীর কাছ থেকে, তবে হয়ত বিশ্বাস হবে তোমার কিছুটা।'

'আমি সে-গৃহীর কাছে নিশ্চই যাবো,শুন্‌বো তাঁর মুখ থেকে ঐ মহাপুরুষের কথা। কে সে গৃহী মায়ি?'

'উত্তরকাশীর সিভিল সার্জন—ডাঃ অমিতাভ বসু। অকৃতদার। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মস্ত ভক্ত। এক সময় মিলিটারীতে ডাক্তার ছিলেন। মনে কোন সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই। এই মহাপুরুষটির কাছে প্রায়ই যান উনি। উত্তরকাশীতে

Scanned by CamScanner

পৌঁছে পরের দিনই জয়ন্তকে সঙ্গে নিয়ে অপরাহ্ন বেলায় ডাঃ বসুর আবাসে গিয়ে উপস্থিত হলেন সুন্দররাজন। এমনিতেই ফর্সা রং। গোলাপী সাজের স্যুটে ভারী মানিয়েছে সুন্দররাজনকে। অত্যন্ত সভ্রান্ত এবং অভিজাত করে তুলেছে তাঁকে। সকলের চোখে তাঁর পরিচ্ছদ। দ্বারে করাঘাত করতেই যিনি বেরিয়ে এলেন, তিনিই যে স্বয়ং অমিতাভ বাবু,তাঁর লম্বা চওড়া মিলিটারী ধাঁচের চেহারা দেখেই বোঝা গেল। সুন্দররাজন ডান হাত বের করে হাতে হাত মিলিয়ে সহাস্য মুখে জানালেন,আশামাই-র নির্দ্দেশেই তিনি ডাঃবসুর সঙ্গে দেখা করতে ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন। ডাঃ বসুর কাছে তাঁর কিছু প্রশ্ন আছে।

আশামায়ির নাম উচ্চারিত হতেই দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে সোল্লাসে বলে উঠলেন ডাক্তার, 'মা এসেছেন নাকি উত্তরকাশীতে? জানতে পাই নি তো!'এই বলে, সাদরে অভ্যাগত দ্বয়কে বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে শুধালেন—'বলুন কি প্রশ্ন আছে?'

জয়ন্ত বাংলায় বলল—'এখানে নাকি একজন অসাধারণ শক্তিধর মহাপুরুষ আছেন,যাঁর অসাধারণত্ব অনেকটাই অবিশ্বাস্যের পর্য্যায়ে পড়ে।'

দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুহূর্তে অমিতাভর। ঘাড় নেড়ে বললেন—'আছেনই তো।' সুন্দররাজন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—'তাঁর অসাধারণত্ব সম্বন্ধে আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।' বলে, একটু থেমে আবার কথা কইলেন তিনি—আমার পরিচয়টা আগে দিয়ে রাখা ভাল। 'আমার নাম—এস সুন্দররাজন। দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী এবং এমন একটি সংস্থার সভ্য যে-সংস্থা অলৌকিক কোন শক্তিতে বিশ্বাসী নয়। যে সংস্থা তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনকারীদের ম্যাজিসিয়ান বা প্রতারক ছাড়া আর কিছুই ভাবে না।'

'আচ্ছা? পড়ছিলাম বটে আপনাদের সংস্থার কথা সেদিন ইংরেজী কাগজে। আপনারা তো কিছু পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করেছেন কাগজে,বলেছেন—যিনি অলৌকিক শক্তির প্রমাণ দিতে পারবেন, তিনিই পুরস্কৃত হবেন। ঠিক বলছি কি?'সুন্দররাজন ঘাড় নেড়ে জানালেন—ঠিক।

দুই কাপ চায়ের হুকুম দিয়ে ডাঃ বসু পুনশ্চ বললেন—আমি ডাক্তার,তার ওপর মিলিটারীম্যান। বিজ্ঞান যাকে বিশ্বাস্য বলেনা, আমিও তাকে বিশ্বাস করি না।

কিন্তু উত্তরকাশীতে এসে এই রামানন্দ অবদূতকে দেখে মহা ফাঁপরে পড়ে গেছি,ভাই। নিজের চোকে যা দেখছি তাকে অবিশ্বাস করি কেমন করে। অথচ কেমন করে যে এসব সম্ভব হচ্ছে সেটাও ভেবে পাচ্ছেনা অমার বিজ্ঞানপ্রবণ মন।'

Scanned by CamScanner

'কি দেখেছেন এই রামানন্দ অবদূতের মধ্যে?' সুন্দররাজন জানতে চাইলেন।

'গত তিন বছর ধরে দেখছি আমি এঁকে। সপ্তাহে পাঁচদিন অন্ততঃ যাই ওঁর কাছে। সকালে গিয়েছি, দুপুরে গিয়েছি, বিকালে গিয়েছি, রাত্রে গিয়েছি। সবর্বরকম ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি এঁকে নিয়ে। পরীক্ষাতে ওঁরই জয় হয়েছে, কোথাও কোন ত্রুটি দেখতে পাই নি এঁর মধ্যে। অথচ ভেবে পাইনে।'

'অসাধারণত্বের কি খুঁজে পেলেন অবধূতের মধ্যে।'

যা খুঁজে পেয়েছি আমি তা আপনিও পাবেন দেখতে। সমস্ত ব্যাপারটা দিনের আলোর মত পরিস্কার। এর মধ্যে লুকোচুরি কোথাও নেই।'

'আমাকে একবার নিয়ে যাবেন তাঁর কাছে?'

'নিশ্চয়ই। কাল রবিবার। কালই সারাদিনের প্রোগ্রাম রাখুন না রামানন্দজীর আড্ডায়। ওঁর দৈনন্দিন জীবনের একটা ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে আপনার চোখে। আনন্দে,উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো সুন্দররাজনের মুখ। শুধালেন— 'উনি কোথায় থাকেন?'

'লাক্‌সেশ্বর মহাদেবের মন্দির প্রঙ্গণে।'

'লাক্‌সেশ্বর? অদ্ভূৎ নাম।'

'বাংলায় যাকে লাক্ষা বলে, হিন্দি উচ্চারণে সেটাই লাক্‌সা। সেই লাক্‌সা থেকেই লাকসেশ্বর।' এই বলে, মুহূর্তের জন্যে নীরব হলেন ডাক্তার। বাবুর্চির আনা দুই কাপ চা দুই অতিথির দিকে এগিয়ে দিয়ে পুনরায় সরব হলেন তিনি। বললেন—লাক্ষা অর্থাৎ গালাকে সংস্কৃতে জতুও বলা হয়। পুরাণ বলছে—যেখানে লাক্‌সেশ্বর মহাদেব বিরাজমান, সেটাই মহাভারতের জতুগৃহ। লাক্ষার পলস্তারা দিয়ে ঘর বানিয়ে,সেই ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়েছিল এই জতুগৃহেই। মহাভারতে বলা হয়েছে বারণাবত পবর্বতের কাছেই এই জতুগৃহ নির্মিত হয়েছিল। সেদিক থেকেও মিলে যাচ্ছে অনেকটা। উত্তরকাশীতেই বারণাবত পবর্বতশ্রেণী বিদ্যমান। ঐ লাক্‌সেশ্বর মহাদেবকে পূজো করেছিলেন কুন্তীদেবী স্বয়ং।'

সুন্দররাজনের সঙ্গে জয়ন্ত এবার উল্লসিত হয়ে উঠল—মহাভারতের জতুগৃহ তবে এখানেই? আর, সেই জতুগৃহেই বাস করেন রামানন্দ অবধূত! এতো ভালই হল। মহাপুরুষের সঙ্গে মহাভারতে পড়া জতুগৃহেরও দর্শন তবে পাওয়া যাবে কাল। কিন্তু কাল পর্য্যন্ত আর অপেক্ষা করতে হল না জয়ন্তদের। বেলা চারটে নাগাদ ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের আর্দ্দালী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল—ম্যাজিষ্ট্রেট সাব বেহুঁশ হয়ে লাক্‌সেশ্বরে পড়ে আছেন—আপনি শিগগির আসুন ডাক্তার সাব।

Scanned by CamScanner

'কেঁও? বেঁহুশ কেঁও হো গ্যয়া?'

'অবধূতজীনে অ্যায়সা লাথ লাগায়া'

'লাথ লাগায়া? সর্বনাশ! গুজরাতী হাতীর মত মোটা মোটা পা রামানন্দ অবধূতের। ঐ পায়ের লাথি যদি লেগে থাকে কালেক্টরের বুকে, তবে তো বাঁচানোই মুস্কিল হবে তাঁকে।' তড়িৎ গতিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন অমিতাভ। আর্দ্দালীকে হাসপাতালে খবর দিতে বলে—বেরিয়ে পড়লেন উনি ঘর থেকে। চকিতে একবার সুন্দররাজনের দিকে তাকিয়ে বললেন—'ইচ্ছা করলে আসতে পারেন আমার সঙ্গে আপনারাও।' ভয়ঙ্কর উৎরাই-এর পথে চলতে চলতে কৈলাস আশ্রমের কাছে গিয়ে আবার কথা কইলেন ডাক্তার 'এমন ঘটনা এই প্রথম নয়।'

'কিন্তু অবধূত লাথি মারলেন কেন?'

'সেটা একমাত্র উনিই বলতে পারবেন। যতদূর জানি কেউ ওঁর পা স্পর্শ করুক এটা উনি চান না। তবু,ভক্তরা গিয়ে পা ছোঁয় এবং তাতে কোন বিপদও হয় না। কারণ, চোখ তাকিয়ে বসে থাকলেও অবধূত সজ্ঞানে থাকেন না অধিকাংশ সময়ই, কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ কখনও যখন সম্বিৎ ফিরে আসে ওঁর আর সেই সময় কেউ যদি ওঁর দেহ স্পর্শ করে, তাহলে আর রক্ষা নেই, হয় লাথি কিম্বা হাতের লাঠির ঘা বসিয়ে তিনি দেবেনই সেই প্রণামকারী ভক্তের শরীরে। এমন ঘটনা যে ঘটেছে এর পূর্ব্বেও, সে কথা তো বলেছি আমি একটু আগেই।'

জয়ন্ত বলল—'তাই বলে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে এমনিভাবে মারবে?'

চলতে চলতেই জবাব দিলেন অমিতাভ—'রামানন্দজীর চোখে দেশের প্রধানমন্ত্রী যা, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট যা, একটা ভিখারীও তাই, কোনো পার্থক্য নেই ওদের মধ্যে।' কিছুক্ষণ নীরবেই হাঁটতে লাগলেন ক্ষিপ্রগতিতে ডাক্তার। তারপর একসময় পুনশ্চ বললেন—'অথচ সরকারের আদেশে এই ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটই ঐ সাধুকে দেখা শোনা করবার জন্যে একটা সেবক নিযুক্ত করেছেন। সাধুর খাবার জন্যে রোজ দুই সের দুধ, আর আধসের চিনির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

'রোজ দুই সের দুধ খান রামানন্দজী?' সুন্দররাজন জিজ্ঞেসা করলেন।

'খান কোথায়?কোন কোন দিন হয়তো এক পোয়া কি আধসের দুধ খান। বাকীটা যায় সেবকের গর্ভে।'

'দুধের সঙ্গে আর কি খান?'

'কিছুই নয়। বছরের মধ্যে অধিকাংশ দিনই থাকেন উপবাসে, কোন কিছু না খেয়েই। অথচ দেহটা দেখুন— ইয়া তাগড়া চেহারা। যেন কোন নাম করা

Scanned by CamScanner

কুস্তিগীর। আমার উরুর চারটে উরু এক করলে তবে ওঁর একটি উরু হবে। সেই জন্যেই তো বলছিলাম একটু আগে—উত্তরকাশীতে এসে এইসব দেখে মহা ফাঁপরে পড়ে গেছে আমার বিজ্ঞাননির্ভর মন। আমি ডাক্তার আমি জানি বছরের পর বছর না খেয়ে থাকলে মানুষ শুকিয়ে কাঠ হয়ে একদিন মারা যায়। এঁর বেলায় বিজ্ঞানের সে-ফর্মূলা খাটছে কোথায়। নিজের চোখে যা দেখছি তাকে অবিশ্বাস করতে পারছি নে,আবার পুরোপুরি মেনে নিতেও মন চায় না।'

সুন্দররাজন জিজ্ঞেসা করলো—'আচ্ছা, অবধূতের বয়স কত হবে?'

'সে আর এক ইতিহাস। জাঠ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন রামানন্দজী। জনশ্রুতি বলে,১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাই বিদ্রোহের সময় ইনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বন্দুক চালিয়েছিলেন। তখন বাইশ বছরের যুবক। সে হিসেব অনুযায়ী ওঁর এখন বয়স হয় একশো ত্রিশ।

'একশো ত্রিশ!'এই বয়েসে,প্রায় নিরাহারে থেকেও এমন স্বাস্থ্য-শরীর উনি পাচ্ছেন কোথা থেকে?'

'সেটাই তো সবার মনের প্রশ্ন'বলতে বলতে পথ থেকে ডান ধারে নীচের দিকে নেমে পড়লেন অমিতাভ অনেকটা। কিছুটা এগুতেই হাসপাতালের কিছু লোক এসে সেলাম জানিয়ে চীফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ অমিতাভ বসুকে নিয়ে গেল লাক্‌সেশ্বর চত্বরের সেই প্রান্তে যেখানে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে শুইয়ে রাখা হয়েছে ষ্ট্রেচারের ওপরে। চারিদিকে লোকে লোকারণ্যে। ভীড় সরিয়ে ডক্তার বাবুকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। উনি অনেকক্ষণ পরীক্ষা করলেন নানা ভাবে। তারপর বললেন'যা ভয় পেয়েছি তাই হয়েছে। পাঁজরের একটা হাড় মনে হয় ফ্যাক্‌চার হয়েছে। নিঃশ্বাসে বেশ কষ্ট হচ্ছে। ওঁকে এক্ষুনি নিয়ে যাও হাসপাতালে। রেসিডেন্ট সার্জনকে খবর দাও। আমি আসছি।'

হাসপাতালের লোকেরা ষ্ট্রেচারে তুলি নিয়ে চলে গেলে অমিতাভ অবদূতের সেবককে ডাকলেন। বললেন—এই বাবু দুটি একটু বেশী রাত পর্য্যন্ত থাকবেন লাক্‌সেশ্বরে। অবধূত রাত্রে কোথায় শোন, কি করেন, এঁদের দেখতে দেবে কাল সকালে বখ্‌শিস্ পাবে।' বখ্‌শিসের প্রস্তাবে এক গাল হেসে যুবক গাড়োয়ালী সেবক বার বার বলতে লাগলো—কোই ফিকির নেহি,কোই ফিকির নেহি।'

'আমরা তাহলে এখন এখানে থাক্‌বো?' জয়ন্ত প্রশ্ন করলো।

'নিশ্চয়! দেখুন অবদূত রাত্রে কি খান, কোথায় শোন। আপনারা বিজ্ঞান বিশ্বাসী। কোন জিনিসকে সত্য বলে গ্রহণ করতে হলে সেটাকে যাচাই করতে হবে না? আজ রাত্রে যতক্ষণ পারেন থাকুন, থেকে সব দেখুন। কাল সকাল থেকে

Scanned by CamScanner

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আবার আমরা এসে রইব এখানে। তাহলেই অবধূতের জীবনের পুরো একটি দিন আর রাত দেখা হয়ে যাবে আপনাদের।' এই বলে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে সোজা উঠে গেলেন তিনি আবার ওপরের রাস্তায়।

সেবক খুব খাতির করে নিয়ে গেল জয়ন্তদের সেই জায়গাটায় যেখানে কিছুটা ফাঁকা জায়গায় একটি বড় পাথরের ওপর বসে আছেন রামানন্দ। মনে হল যেন একটা পাথরের ওপরে আর একটা পাথরের চাঁই বসে আছে। দিনের আলো নিভে আসছিল ক্রমে,সেই অপ্রতুল আলোতেও দেখতে পেলেন সুন্দররাজন—ডাক্তার বাড়িয়ে বলেন নি একটুও। সত্যিই মস্ত এক কুস্তিগীরের মতই চেহারা বটে অবধূতের। কিন্তু শরীরে এক ফালি কাপড়ও যে নেই কোথাও ওঁর। হিমালয়ের এই মাঘের শীতে সকলে যখন তিনটে চারটে সোয়েটার, জাম্পার, কোট চাপিয়ে কাঁপছে ঠক ঠক করে,তখন উনি রয়েছেন সম্পূর্ণ উলঙ্গ, এ এক বিভ্রান্তিকর ব্যাপার বটে।

কালেক্টারের মত লোকের বুকে লাথি মেরেছেন একটু আগে কে বলবে ওঁকে দেখে। চেয়ে আছেন একভাবে সামনের দিকে—অনুত্তেজিত চোক মুখ। ডান হাতে ধরা একটা ছোট লাঠি। মাথায় চুল নেই বললেই চলে। বিরাট পেট ঝুলে পড়েছে সামনের দিকে, ফলে লজ্জা নিবারিত হয়েছে স্বাভাবিক ভাবে।

জয়ন্ত শুধালো—'গায়ের ওপর সবুজ সবুজ ভাব দেখছি, এমনটি কেন?'

'ও শ্যাওলা।'

'শ্যাওলা? গায়ের ওপর শ্যাওলা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। রাত্রে উনি যেখানে শোন,সেটা জল স্যাঁৎসেতে জায়গা কিনা!'

'জল স্যাঁৎসেতে জায়গায় খালি গায়ে রাত্রে শোন এই বরফের মত ঠাণ্ডায়?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না, না? একটু পরেই তো উনি শুয়ে পড়বেন। তখন আমি নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেবো আপনাকে।

'কথা বললে জবাব টবাব দেন?'

'গত ত্রিশ বছর ধরে এঁর মুখ বন্ধ। কথা বলেন না কারুর সঙ্গে।'

সুনন্দরাজন বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে কেমন এক অদ্ভুৎ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন অবধূতের দিকে। ওঁর মনে পড়ে গেল মায়ির বলা কথাটা—নিজে সেই মহাপুরুষকে দেখলেই বুঝতে পারবে তিনি এক অবিশ্বাস্য বিস্ময়।

'সুনন্দরাজন জিজ্ঞেসা করলেন—দিনে যে দুই-সের দুধ বরাদ্দ করা আছে ওঁর নামে, সেটা তো খান উনি?'

'কোথায় খান?কোন দিন হঠাৎ হয়তো এক পোয়া দুধ খেয়ে নেন—নইলে

Scanned by CamScanner

এমনিতে উনি থাকেন কিছু না খেয়েই।'

এই সময় সহসা জয়ন্তের মনে হল—দিল্লীর সেই নেতা সুবিচার করেননি ভারতের উপাসক সম্প্রদায়ের প্রতি। তিনি কখনও প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাননি এমন সব মহাপুরুষদের, তাই তিনি নির্ব্বাচনী বক্তৃতায় অমনভাবে বলতে পেরেছিলেন—ভারতের সমস্ত সাধু-সন্তই সম্ভোগ আর আলস্য সুখে দিন কাটায়,বছরের পর বছর দুরন্ত এই হিমালয়ের ঠাণ্ডার মধ্যে সম্পূর্ণ আবরণহীন দেহ নিয়ে, কিছু না খেয়ে, ত্রিশ বছর একটি কথাও না বলে কোন আলস্য সুখ আর সম্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন—একশো ত্রিশ বছরেও অনন্য সাধারণ দেহ সম্পদের অধিকারী এই অবধূত!

তখনও লোকের ভীড় কম ছিল না। কিন্তু রাতের অন্ধকার নেমে আসতেই লাক্সেশ্বর ফাঁকা হয়ে গেল একেবারে। একে হু হু করে বইছে উত্তরের হিমেল হাওয়া, তার ওপর ঘুটঘুটে অন্ধকার। সাধু যে এখন লাক্সেশ্বর শিবের মন্দিরে গিয়ে ঢুকবেন সারা রাত্রের মত, সে খবরটাও জানা এখানকার সব বাসিন্দাদের কাছেই। এইসব কারণেই বোধ হয় ভক্ত বৃন্দের এই প্রস্থান।

অবধূত কিন্তু বসে থাকলেন অন্ধকারের মধ্যে আর এক অন্ধকার সৃষ্টি করে আরও অনেকক্ষণ। সুন্দররাজন বললেন—'সেবকজী রাত্রিতে কোথায় উনি শোন আমাদের একটু দেখিয়ে দেন।' সেবকজী সঙ্গে সঙ্গে রাজী। সিভিল সার্জন নিজে বলে গেছেন—এই দুই ভদ্রলোককে বেশী রাত পর্য্যন্ত থাকতে দিলে কাল সকালে বখ্শিস্ মিলবে। বখ্শিস্ যিনি দেবেন তাঁর লোককে যত্ন আত্তি করতে হবেই তো একটু।

মন্দির তো নয়, একটা আধভাঙ্গা ঘর প্রাচীনত্বে ন্যুব্জ কুব্জ হয়ে পড়েছে। মেঝেটা মাটিতে বসে গিয়ে জল বেরিয়ে পড়েছে। সেই জলে ভেজা মেঝের ওপরেই শিব লিঙ্গটা—লাক্সেশ্বর মহাদেব, যাঁকে একদিন পূজো করেছিলেন নাকি পাণ্ডব জননী কুন্তীদেবী স্বয়ং।

খালি পায়ে লিঙ্গের একেবারে কাছে গিয়ে মেঝেতে হাত দিয়ে দেখলেন সুন্দররাজন বরফগলা জল যেমন ঠাণ্ডা হয়,তেমনি ঠাণ্ডা জল ছপ ছপ করছে লিঙ্গের চারিদিকে সেবক জানালো—'এই লিঙ্গে মাথা রেখে এই জল ছপ ছপ মেঝেতেই শুয়ে থাকেন অবধুত রাত চারটে পর্য্যন্ত।'

'বলছেন কি সেবকজী? এই ঠাণ্ডা জলে ভেজা জায়গায় মাঘের রাতে খালি গায়ে উনি শোন?' একটু হাসলো সেবক। বলল—'একটু অপেক্ষা করলে নিজের চোখেই দেখতে পাবেন ওঁর শোয়া।'

Scanned by CamScanner

'দুধ খান কখন?'

'সকালে একবার দুধ নিয়ে গিয়ে সামনে ধরি, রাতে আর একবার। কোনদিন হয়ত তাকিয়েও দেখেন না, কোনদিন লোটা তুলেনিয়ে ঢক্ঢকিয়ে খানিকটা দুধ মুখে ফেলে দেন। তবে আধসের দুধও খেতে দেখি নি কখনও এই দুইসের দুধ থেকে। এই দেখুন না আজকের দুধ। যতটা এনেছি, ততটাই পড়ে আছে।'

'আর অন্য কিছু খেতে দাও না?'

'অনেক কিছু দিয়ে দেখা হয়েছে,একবার হাত দিয়ে ছুয়ে দেখেনও না।'

অলৌকিকতায় অবিশ্বাসী সুনন্দরাজন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখছেন—রামানন্দ সম্পর্কে যা বলেছেন ডাক্তার বসু, তার কতখানি যুক্তিগ্রাহ্য, কতখানি লোকের মুখের শোনা কল্পিত কথা।

মন্দিরের মধ্যে একটি জ্বলন্ত লণ্ঠন এক কোণে একটা পাথরের ওপর বসানো। তারই আলোতে দেখা গেল—গোরিলার মত থপ্ থপ্ করতে করতে উলঙ্গ অবধূত হাতের লাঠির শব্দ তুলতে তুলতে মন্দিরে এসে ঢুকলেন। জয়ন্ত আর সুন্দররাজন বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সব দেখ্তে পাচ্ছিল। ঘরে ঢুকেই মুখ দিয়ে দুইবার আওয়াজ তুল্লেন—হুম,হুম। সমস্ত ঘর কেঁপে উঠল মনে হল। মনে হল যেন কোন হিংস্র পশু গর্জন করছে ঘরের মধ্যে। সেবক তাড়াতাড়ি এসে দুধের ঘটীটা ধরলো সামনে। সাধু সেদিকে তাকালেনও না। সোজা গিয়ে শুয়ে পড়লেন—প্রাচীনত্বের দরুণ মাটিতে দেবে যাওয়া শিব লিঙ্গের ওপর হাতে মাথা রেখে—সেই স্যাঁৎসেতে ভেজা মেঝেতে।

ঘর থেকে বেরিয়ে সেবক এসে দাঁড়ালেন জয়ন্তের পাশে। রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ওরা তিনজনে মন্দিরের সামনে সেই অন্ধকারের মধ্যে। দেখ্লো —এপাশ ওপাশ ফেরা নেই,টান হয়ে একই ভাবে শুয়ে আছেন অবধূত ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

হাতে নেই গ্লাভ্স গায়ে নেই ওভারকোট—রাত এগারোটার শীতে বুকের মধ্যে শুদ্ধু কাঁপন গুড় গুড় করে উঠ্ছে মাঝে মাঝে আর নয়। সেবকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিঃশব্দে যাত্রা করলো ওরা দু'জনে নিজেদের ডেরার দিকে। পথে কোন কথা বলল না কেউ কারও সঙ্গে। বিধবস্ত, বিপর্য্যস্ত দুটি মন। এতদিনের সংশয়ের মূলে পড়েছে কুঠারাঘাত। যা প্রত্যক্ষ করলো আর শুনলো তারা এতক্ষণ,স্বচক্ষে দেখেও তা মেনে নেওয়া কি সহজ কথা?

Scanned by CamScanner

চার

ঠিক ছিল সকাল দশটায় জয়ন্ত আর সুন্দর রাজন যাবে চীফ মেডিক্যাল অফিসারের কাছে, সেখান থেকে তিন জনে একসঙ্গে গিয়ে হাজির হবে লাক্সেশ্বর মন্দির। জীবন সকাল আটটা বাজার আগেই ডাঃ বসুর লোক দৌড়াতে দৌড়াতে এসে খবর দিল—'ডাক্তার সাব এখনই আপনাদের যেতে বলেছেন। সোজা মন্দির যাবেন। ডাক্তার সাবের সঙ্গে। সুন্দররাজন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বল্‌লেন—'নতুন কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই।'

তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে হ্যাভারস্যাক্-এ কিছু পাঁউরুটি আর কলা ভরে নিয়ে উভয়ে যখন গিয়ে হাজির হল মন্দির প্রাঙ্গনে তখন মাত্র সোয়া আটটা। কিন্তু এরই মধ্যে মন্দির চত্বর একটা মেলা প্রাঙ্গনে পরিণত। ভীড়ের মধ্যে থেকে ডাঃ বসু বেরিয়ে এলেন সহাস্যবদনে হাত যোড় করে বুকের ওপর রেখে 'আসুন, আসুন, আপনারা পরম ভাগ্যবান।'

সুন্দররাজন শুধালেন—'কেন? ভাগ্যবান কেন?'

'বছরে একবার কি বড় জোর দুইবার ঘটে যে ঘটনা এ-মন্দিরে, সেই ঘটনাই দেখবার সৌভাগ্য হ'ল আজ আপনাদের। আজ অবধূত ডান হাতটা মুখের কাছে নিয়ে নিজেই ইঙ্গিতে জানিয়েছেন—তিনি আহার্য গ্রহণ করবেন। বছরে একবার কি দুইবার এরকম ইনি বলেন। আজ সকাল সাতটা থেকে শুরু হয়েছে এঁর খাওয়া। চলবে সেই বিকাল পর্য্যন্ত। চলুন, দেখবেন চলুন।'

একটা চাতাল পাথরের ওপর পা ছড়িয়ে বসেছেন অবধূত। ছড়ানো দুই পায়ের মধ্যস্থলে—দলে দলে ভক্ত এসে যে যা দিচ্ছে, উনি সঙ্গে সঙ্গে তা মুখের মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন।

ডাক্তার বললেন—'উনি যে খেতে চেয়েছেন—এখবরটা রটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরকাশীর বাসিন্দারা হয়ে ওঠে উল্লাস আর উৎসাহে উদ্দীপিত। যার যেমন ক্ষমতা, সে তাই নিয়ে এসে তুলে দেয় হাতে সশ্রদ্ধচিত্তে। দূর দূর পাহাড়িয়া গাঁ থেকেও মানুষেরা আসে। দেখছেন না—বেলা এখনও ন'টা হয় নি, এরই মধ্যে ভক্ত সমাগমের বহরটা।'

'সেই বিকেল পর্য্যন্ত খাবেন?' জয়ন্ত জানতে চাইল।

'হ্যাঁ'

'পেটে ধরবে?'

'ধরে তো দেখি।'

Scanned by CamScanner

'অসুস্থ হয়ে পড়বেন না?'

'কখনও তো দেখি নি অসুস্থ হতে।'

সুন্দররাজন আপন মনেই যেন বিড় বিড় করলেন—'সারা বছর যে মানুষটা নিরাহারী হয়ে থাকেন, একদিনে তিনি এত খেতে পারেন কেমন করে?'

ওঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অমিতাভ ফিস ফিস করলেন—'এসে যখন পড়েছেন এবং আপনার ভাগ্য যখন আপনাকে সুযোগ এনে দিয়েছে এমন একটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার, তখন নিজের চোখেই তো দেখতে পাবেন সব। আমরা বিকাল পর্য্যন্ত তো আছি এখানে।'

কেউ হয়ত চারটে চাপাটি দিল। দুই হাত দিয়ে সেগুলিকে টুকরো টুকরো করে মুখে ভরে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। কেউ হয়ত ক্যান-এ করে সেরখানেক দুধ এনে সামনে ধরল। অবধূত অমনি সে ক্যান হাতে নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে ঢেলে দিলেন সেই দুধ গলার মধ্যে। কেউ হয়ত বারোটা কলা এনেছে। অবধূত সেই বারোটা কলাই এক এক করে মুখে পুরে দিলেন খোসা ছাড়িয়ে। কারুর দেওয়া কোন জিনিস তিনি ফেলে রাখছেন না একটুও।

এ কী রাক্ষুসে খাওয়া।

এই ভাবে এক নাগাড়ে খাওয়ার পর বেলা তিনটে নাগাদ ডান হাতটা শূন্যে তুলে নাড়লেন অবধূত। দুধ-দই ছানা-মিঠাই-চাপাটি-ফল—যে যা দিয়েছে তাই খেয়ে,আহারের পালা সাঙ্গ করে, এবার উঠে দাঁড়াতেই দেখা গেল—যেখানে বসেছিলেন সেখানেই মল-ত্যাগ করেছেন উনি। একটু আধটু নয়—যেন হাতীর নাদ।

ডাক্তার বললেন—এটাই ওঁর স্বভাব। বেশীর ভাগ দিনই এমনি বসা অবস্থাতেই পায়খানা করে ফেলেন উনি। বাহ্যজ্ঞান থাকে না তো, তাই অবোধ শিশুরা যা করে, উনিও সেই রকমটিই করেন।

'এখন পরিস্কার করবে কে?'জয়ন্ত শুধালো।

'মেথর আছে,সে আসবে। আর ঐ যে দেখছেন লাঠি নিয়ে এগিয়ে চলেছেন অবধূত ঐ ধারে—উনি গঙ্গায় যাচ্ছেন স্নান করবেন।'

'মাঘ মাসের ঐ বরফগলা গঙ্গা জলের দুরন্ত স্রোতের মধ্য দাঁড়িয়ে উনি স্নান করবেন?'

'হ্যাঁ। তাও হুস্ করে একটা ডুব দিয়েই উঠে আসবেন না। অন্ততঃ একঘন্টা ঐ অবশ করা ঠাণ্ডা জলে কোমর পর্য্যন্ত ডুবিয়ে নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে কিসব বলবেন আর দুই হাত ভরে জল তুলে কার উদ্দেশ্যে যেন অঞ্জলি দেবেন। অথচ আমি

Scanned by CamScanner

আপনি যদি মাঘ মাসের এই প্রচণ্ড শীতে ঐ বরফগলা গঙ্গাজলে পাঁচ মিনিটও হাতের একটা আঙ্গুল ডুবিয়ে রাখি—আড়ষ্ট হয়ে যাবে সেটা ঠাণ্ডায়। ঐ একশো ত্রিশ বছর বয়সের বৃদ্ধের কিন্তু এক ঘণ্টা জলে অর্দ্ধাঙ্গ ডুবিয়ে রাখা সত্ত্বেও কখনও কোন রকম অস্বস্তি হতে লক্ষ্য করিনি কেউ।'

সুন্দররাজন তাড়াতাড়ি অনুসরণে প্রবৃত্ত হলেন অবধূতকে। বললেন—'চলুন ডাঃ বসু সবই যখন দেখলাম স্নানটাই বা বাকী থাকে কেন। চলুন সেটাও দেখে আসি।'

রাত্রে কালী কম্বলিওয়ালা ধর্মশালার সেই ঘরের ভেজানো দরজায় ঠক্ ঠক্ করে শব্দ তুলল জয়ন্ত যে ঘরে ধর্মশালার সম্মানিত অতিথি হয়ে বসে করছেন আশামায়ি। পাশে তার সুন্দররাজন।

দরজা খুলে ওদের দেখতে পেয়ে,প্রশান্ত হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে শুধালেন—'কি বাবা, ডাঃ বসুর সঙ্গে দেখা হয় নি?'

সুন্দররাজন জবাব দিলেন—'হয়েছে'।

'সেই অবধূতকে দ্যাখো নি?'

'দেখেছি, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি।'

'সে কি কথা?'মা আবার হাসলেন।

'আপনি হাসছেন মা?' বেশ উত্তেজিত মনে হল সুন্দররাজনকে এবার। আমার এতদিনের বিশ্বাস ধারণা সব চুড়মার করে দিয়ে, আমার চিন্তায় নতুনের আগুন লাগিয়ে আপনি হাসছেন!'

'হাসবো না! দিল্লীর ঐ নেতার মত তুমিও যে একটা মস্ত ভুল করেছিলে বাবা! নিজে পরীক্ষা না করে,নিজে কাছে গিয়ে না দেখেই মনে মনে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলে সাধুসমাজ সম্বন্ধে। সেই ভুল তোমার ভাঙ্গতে শুরু করেছে আজ, আর আমি হাসবো না।'

'এমন মানুষ যে পৃথিবীর বাতাসে আমারই মত শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে আমারই মত ধরণীর বুকে পা ফেলে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না আমি কখনো।'

সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তও বলে উঠল—'চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে কি চায় মনটা।'

সহাস্য বদনেই মায়ি বললেন—'এইবার চলো দেবপ্রয়াগে। সেখানে তোমাদের জন্যে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছে।'

'আরও বড় বিস্ময়!' চোখে মুখে বিদ্যুতের ঝিলিক দেখা দিল সুন্দররাজনের। বললেন—'যাবো মাতাজী, নিশ্চই যাবো। যা কোনদিন দেখতে পাবো বলে ভাবতে

Scanned by CamScanner

সুযোগ পাচ্ছি, এ যে আমার কত বড় সৌভাগ্য—তা বলে বুঝাবো কেমন করে!' পর্য্যন্ত পারিনি—আপনার অকৃপণ দাক্ষিণ্যে সেইসব দেখবার, জানবার, বুঝবার

'তবে সেই নতুন বিস্ময় তোমাদের সামনে হাজির করাবার জন্যে আমাকে এবার কঠিন অভিনয়ে নামতে হবে।' মায়ি বললেন।

'অভিনয়? আপনাকে অভিনয় করতে হবে? সুন্দররাজন জিজ্ঞেসা করলেন।

'হ্যাঁ,বাবা! আমার অভিনয় দর্পণেই তো হবে তোমাদের সত্য-দর্শন।'

পাঁচ

দেবপ্রয়াগে দুধাধারী পাণ্ডা দুইখানা কামরা ওয়ালা একটা বাড়ীর ব্যবস্থা করেছিলেন মায়ির আদেশে। একটি কামরায় সুন্দররাজন আর জয়ন্ত শুয়েছে গতরাত্রে। আর একটিতে মায়ি। হিমালয়ের যে অঞ্চলেই জয়ন্ত গেছে মায়ির সঙ্গে এর আগে দেখেছে সেখানকার সাধারণ মানুষের ওপর তাঁর কি অসম্ভব প্রভাব। সকলেই ভক্তি করে—ভালবাসে তাঁকে। যাকে যে আদেশ করেন যখনই,তখনই সে পালন করে সেই আদেশ। মায়ির সেবায় লাগতে পারলে সকলে ধন্য মনে করে নিজেদের।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘরের বাইরে এসে দেখতে পেলো জয়ন্ত,মায়ির ঘরে তালা ঝুলছে। 'কোথায় গেলেন আবার মাতাজী!' সুন্দররাজন বললেন—'আমাদের তো কিছু বলে গেলেন না!' জয়ন্ত হাসলো। এই অশ্চর্য্য রহস্যময়ী সন্ন্যাসিনীকে এখনও চিনতে পারেনি দাক্ষিণাত্যের এই অধিবাসীটি। ইনিও যে ঐ অবধূতের চেয়ে কম বড় বিস্ময় নন—মাত্র এক দিনের পরিচয়ে সেকথা জানা কি সুন্দররাজনের পক্ষে সম্ভব?

নিজেদের ঘরে তালা দিয়ে, দোকানথেকে দুইজনে দুভাঁড় গরম দুধ এবং চারটে পেড়া গলাধঃকরণ করে—বেরিয়ে পড়লো দেবপ্রয়াগকে একটু ঘুরে দেখবার জন্যে।

জয়ন্ত বলল—মায়ির কাছে শুনেছি, শাস্ত্রে দেবপ্রয়াগের আর একটা নাম আছে। ত্রিকূটাচল। তিনটে কূট, অর্থাৎ তিনটি পবর্বতচূড়া দিয়ে পরিবেষ্টিত এই দেবপ্রয়াগ। গৃধ্রাচল,নৃসিংহাচল আর দশরথাচল—এই তিনটে হচ্ছে ঐ তিনটি কূটের নাম। এই তিন পাহাড়ের মাঝখানেই ঘটেছে ভাগীরথী আর অলকানন্দার সঙ্গম।'

কথা বলতে বলতে অলকানন্দার ওপরকার ব্রীজ পার হয়ে বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে চলছিল ওরা। একটা বাড়ীর সামনে কিছু লোকের ভীড় দেখে দাঁড়িয়ে গেল

Scanned by CamScanner

সেখানে। বাগান আছে প্রবেশ পথে খানিকটা। সেখান থেকে বারান্দা পেরিয়ে একটু এগুতেই একটা সান বাঁধানো আঙ্গিনা দেখা গেল। উঠোনের মাথাটা সামীয়ানা দিয়ে ঢাকা। সেই আঙ্গিনাতেই বসেছে ভজন গানের আসর। দুই হাতে খঞ্জনি নিয়ে দিব্য হাসিতে মুখ ভরিয়ে যিনি ভজন গাচ্ছেন,তাঁর রূপের দিকে চেয়ে আর চোখ ফেরানো যায় না। আশামায়ির মতই টক্ টকে রং গায়ের। বড় বড় দুই আঁখি সোনালি ফ্রেমের চশমার নীচে জ্বল জ্বল করেছে। মাথার কুচকুচে কালো চুল বাব্‌রি হয়ে নেমে এসেছে কাঁধ পর্য্যন্ত। সযত্নে রাখা দাড়ি আর গোঁফে ভজন গায়কের চেহারা যেন অনেকটা যিশু খৃষ্টের মত করে তুলেছে।

আট আঙ্গুলে আটটি হীরে বসানো সোনার অংটি। টক্‌টকে লাল পুলওভার পরে থাকা সত্ত্বেও মোটা সোনার হার উঁকি দিচ্ছে গলার কাছটিতে চিক্ চিক্ করে। বাঁ-হাতের কব্জিতে সোনার ব্যাণ্ডে বন্দী সোনার ঘড়ি। উঠোন ঠাসা নানা বয়সী মহিলা। পুরুষ আশেপাশে নেই বললেই চলে। কিন্তু গায়ক যেহেতু পুরুষ মানুষ,সাহসে ভর করে দাঁড়িয়ে গেল দু'ইজনে উঠোনের একধারে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানটাও ভরে গেল পুঞ্জে পুঞ্জে আসা মহিলা ভক্তদের ভীড়ে। তবু দৃষ্টি ফেরাতে পারলো না দু'জনেই গায়কের মুখ থেকে। লাল পুলওভারের ওপর ফিনফিনে পাৎলা গেরুয়া বসন—গায়ের রং-এর জেল্লা যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক খানি।

গায়ক মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে গাইছেন মীরার ভজন—'যেকো শিরো ময়ুর মুকুটো মেরো পতি সোই'। জয়ন্ত এবং সুন্দররাজন দু'জনেই মুগ্ধ। দু'জনের মুখ দিয়েই একটি কথাও বেরুলো না অনেকক্ষণ। পরে একসময় জয়ন্ত নিম্ন কণ্ঠে বলল—'ইনিও নিশ্চই কোন মহাপুরুষ হবেন। দেখছেন না—গাইতে গাইতে চোখ দিয়ে ওঁর জল ঝরছে অবিরাম।'একটু নড়ে চড়ে সুন্দররাজন বললেন—'সত্যি, পুরুষ মানুষের এমন দিব্য রূপ আমি কখনো দেখি নি এর আগে। এমন আগুন জ্বালা রূপ যাঁর তিনি তো দিব্য শক্তিধর পুরুষ হবেনই। কোন বুজরুকী নেই, বক্তৃতা নেই, কেবল গানের অমৃতে ডুবে আছেন কেমন আপন ভাবে বিভোর হয়ে।'

সমবেত সমস্ত মহিলার নয়ন দৃষ্টিও—যিশু খৃষ্টের মত দেখতে ঐ ভজন গায়কের মুখে ওপরেই নিবদ্ধ।

এই সময় কে যেন চিম্‌টি কাট্‌লো ঘাড়ের কাছে জয়ন্তের।

চমকে পেছনে তাকিয়ে জয়ন্ত অবাক। আশামায়ি! চোখে মুখে কেমন যেন একটু দুষ্টুমীর হাসি। সুন্দররাজন তাড়াতাড়ি দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানালেন মায়িকে।

Scanned by CamScanner

'কি দেখছিলে তোমরা এত মন দিয়ে মিন্‌সা? ঐ সাধুকে, না আসর ভরা ঐ মেয়েদেরকে?

আশামায়িকে এমন লঘু সুরে কথা বলতে কমই শুনেছে জয়ন্ত এর আগে কখনও। সে বলল—'কি সুন্দর দেখতে ঐ গায়ককে মায়ি, অঙ্গে রূপ যেন আর ধরে না।'

মায়ি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন গলাস্বরকে নামিয়ে—'সেই রূপকেই তো চোখ দিয়ে চেখে চেখে খাচ্ছে ঐ মেয়ের দল। ওরা কি কেউ গান শুনছে ভাবছো?'

'গান শুনছে না?'

'পাগল হয়েছো? গান শুনছে ওরা? এর চেয়ে ঢের ভাল গান হচ্ছে হরনাথ বাবাজীর—ঐ কালী কম্বলিওয়ালা ধর্মশালার পাশে। হরনাথের গান শুনলে লোকে পাগল হয়ে যায়। সেখানে গিয়ে দ্যাখো একটি মেয়েও নেই। সব এসে জুটেছে এখানে। কেন জানো? হরনাথের বয়স হয়েছে। খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি, মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল, গায়ের রং কালো। পরনে হাঁটু অবধি একটা সাদা গামছা, গায়ে আধ ময়লা ফতুয়া। সেখানে তো সোনা দিয়ে অঙ্গ মোড়ানো, কাঁচা সোনার মত গায়ের রং আর বাব্‌রি চুলের বাহার নেই।

কিন্তু সাধু তো ভাল মানুষ। সুন্দররাজন বলল, 'উনি তো আপন ভাবে বিভোর হয়ে গানে ডুবে আছেন।'

'কে যে কোন সাগরে ডুব দিয়ে থাকে বাবা, সেটা বোঝার ক্ষমতা এই আশালতার নেই। তবে রূপ যার এত, গুণও যে তার থাকবে সেটাই তো স্বাভাবিক। নইলে এত লোক ভীড় করে এর কাছে আসবেই বা কেন?'

সুন্দররাজনের এবার হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো মায়ির সজ্জার দিকে। দেহে আল্‌খেল্লা নেই, মাথায় পাগ্‌ড়ী নেই, হাতে চিমটা নেই। গেরুয়া ব্লাউস্‌ আর গেরুয়া কাপড়ের নিজের অগ্নিক্ষরা রূপৈশ্বর্যকে আবৃত করার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

'এই ঠাণ্ডায় আলখেল্লা পরেন নি মা?'

'আজ আমার সাজগোজ, চলন বলন নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলবে না মিন্‌সা। উত্তরকাশীতেই বলে এসেছি না—দেব প্রয়াগে আমাকে কিছুটা অভিনয় করতে হবে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বলেছিলেন—'

'ব্যস্‌, তবে আর প্রশ্ন নয়। আজ আমি যা বলবো শুনে যাবে, যা করবো কেবল দেখে যাবে, বুঝলে বাবারা? তোমাদের চোখ ফুটাবার জন্যেই আমার এই অভিনয়ে নামা' 'আমাদের চোখ ফুটাবার জন্যে! একই সঙ্গে জয়ন্ত আর সুন্দররাজন একই

Scanned by CamScanner

কথা উচ্চারণ করলো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব বুঝতে পারবে পরে।' এই বলে একটু থেমে, কেমন ভাবে যেন একটু হাসলেন মাতাজী। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, 'আর কিছুক্ষণের মধ্যে ভজন শেষ হবে, লোকের ভীড় আর থাকবে না। তখন আমি সাধুর কাছে যাবো কিছু কথা বলতে। তোমরা কিন্তু চলে যেও না। যেখানে যেমন দাঁড়িয়ে আছো, থাকবে। কি কথা হয় আমাদের মধ্যে, শুনবে। এতবড় একজন সাধুর মুখের দুটো কথা শোনাও পুণ্যের কাজ।'

'সাধুর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে মাতাজী?' সুন্দররাজন শুধালো।

'উনি আমাকে চেনেন না। তবে আমি ওঁকে দেখেছি এই দেবপ্রয়াগেই এর আগে আরও দুই তিন বার। মাঘ মাসটা গাড়োয়ালে অতি পবিত্র মাস তো। প্রতি বছরেই মাঘ মাসে উনি এখানে এসে ভজন কীর্তন করেন, মাঘের পর চলে যান দেবপ্রয়াগ ছেড়ে।'

'কি নাম ওঁর?'

'দেবানন্দ মহারাজ।'

বেলা বারোটা নাগাদ ফাঁকা হয়ে গেল অঙ্গন ওঁর গান থামার সঙ্গে সঙ্গে। ফুলের মালা, মিঠাই, চাঁদির গয়না, নগদ টাকা, কাপড়, কম্বলের ঢেড়ি জমে উঠেছে সাধুর সামনে প্রণামী বাবদ। তিনটি তরুনী গেরুয়াধারিণী প্রণামীর ঐ জিনিসগুলি সরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো অচিরে। মায়ি ফিস্ ফিস্ করে বললেন—'ঐ তিন জনই হচ্ছে সাধুর সেবিকা। সাধু যেখানে যান, ওরাও সেখানেই যায় ওঁর সঙ্গে । সাধুর শোয়া-বসা-খাওয়া-নাওয়া—সমস্ত কিছু দেখাশোনা করে ওরাই।'

প্রায় জনশূন্য অঙ্গনের চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ভেলভেটের আসন ছেড়ে উঠবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন সাধু,আশামায়ি মাথায় কাপড় দিয়ে একেবারে গিয়ে হাজির হলেন তাঁর সামনে। সাধু সোনার ফ্রেমের চশমার ভেতর থেকে সুন্দর দুই চোখ মেলে সদ্যাবির্ভুতার মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে যে মোহিত হয়ে গেলেন, তা তাঁর চোখের ভাব দেখেই বুঝতেই পারলো জয়ন্ত ও সুন্দররাজন, দূর থেকেও।

একভাবে কিছুক্ষণ আশামায়ির দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন দেবানন্দ—বলো মা, তোমার কি বলার আছে?' সাধুর মুখের 'মা' সম্বোধনটি বড় মিষ্টি লাগলো সুন্দররাজনের কানে।'

চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে, আরও একটু এগিয়ে গিয়ে সাধুর দিকে, মায়ি বললেন—'আমার একটা নিবেদন আছে, মহারাজ।'

Scanned by CamScanner

'কি নিবেদন, মা? বলোনা—অত সংকোচের কি আছে?'

পুনশ্চ চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলেন মায়ি—যেন কত গোপন কথা বলতে যাচ্ছেন উনি সাধুর কাছে। তারপর বললেন—'আজ তো ভরা পূর্ণিমা। আমার মনে বাসনা জেগেছে-আজ রাত্রে আপনার সেবা করবো আমি।'

'সেবা করবে?'একটু নড়ে চড়ে বসলেন দেবানন্দ। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে গেরুয়া পরিহিতা আগন্তুকার দিকে তাকিয়ে থেকে, স্মিত হাস্যে বললেন—'তোমার যদি তেমনটি ইচ্ছা হয়ে থাকে মা,করবে, আমি বাধা দেবো কেন?'

'তবে,একটা কথা।'

'কি কথা মা?'

'অন্য কোন সেবিকা বা মানুষ উপস্থিত থাকতে পারবে না এই আশ্রমে সন্ধ্যার পরে আজ। তা হলে কিন্তু বিঘ্ন ঘটবে আমার সেবায়।'

'বেশ তো, তাই হবে মা। সবাইকে পাঠিয়ে দেবো মন্দিরে।'

'সেবাতে কিছু জিনিসও যে লাগবে আমার,মহারাজ।'

'কি জিনিস বলো, আমি আনিয়ে রাখবো।'

'তেমন কিছু নয়, অগুরু, চন্দন, কস্তুরী আর সিদ্ধি। আপনি সিদ্ধি খান না বাবা?'

'কেন খাবো না মা?দেবাদিদেব মহাদেবের ভোগ্য জিনিস। সাধু-সন্ন্যাসীদের ওটা গ্রহণ করতে হয় বৈকি উৎসবে পাব্বর্বণে।'

'তবে আমি এখন আসি,মহারাজ?'

'এসো মা। ঠিক সন্ধ্যায় আসবে কিন্তু। অগুরু, চন্দন, কস্তুরী আর সিদ্ধি তৈরী থাকবে।

আমি তোমার অপেক্ষায় থাকবো।'

বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় এসে মায়ি দাঁড়াতেই সুন্দররাজন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, যেমন রূপ, তেমন সুন্দর কথাবার্তা। আপনাকে মা-মা বলে যখন সম্বোধন করছিলেন সাধু—আমার প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছিল। নারী মাত্রকেই যারা মাতৃরূপে গ্রহণ করতে পেরেছে,একমাত্র তারাই পারে এমন ভাবে মা-মা বলে সম্বোধন করতে।'

মাথার কাপড় নামিয়ে দিয়ে মায়ি বললেন—'দেখলে তো সাধুর মত সাধুকে? এবার চলো সঙ্গমঘাটে।'

'সেখানে কি আছে মায়ি?' জয়ন্ত জানতে চাইলো।

'চলো না, দেখতেই তো পাবে এখনই।' মায়ি জবাব দিলেন।

Scanned by CamScanner

ছয়

পাথরের খাঁড়াই সিঁড়ি দিয়ে অনেকগুলো ধাপ নামতে হয় সঙ্গমে যেতে গেলে। ভাগীরথী এসে যেখানে মিলেছে অলকানন্দার সঙ্গে—ঠিক সেখানে ঘাটের ওপর,একটি ছোট গুম্ফা আছে। বেলা হয়েছে। ঘাটে দুই একটি স্নানার্থীর আনাগোনা। একবার গিয়ে সঙ্গমের জল স্পর্শ করলেন মায়ি। নিজের মাথায় সুন্দররাজন ও জয়ন্তের সর্বাংগে সঙ্গ-মবারি ছিটিয়ে দিয়ে, সিঁড়ির একধারে নীচের ধাপে—যেখানটায় শেকল বাঁধা আছে পুন্যার্থীদের স্নানের নিরাপত্তার জন্যে, সেখান থেকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন মায়ি গুম্ফার ভেতরটা। মাথার চুল, দাড়ি, গোঁফ সব কামানো—বছর তেইশ চবিবশের এক যুবক বসে আছে।

সারা শরীরে কোন আবরণ নেই। কোমর থেকে হাঁটু অবধি ঢাকা একফালি থান কাপড় দিয়ে শুধু। কপালে আঙ্গুল দিয়ে টানা ভস্ম রেখা। সামনে ছোট একটা কুণ্ডতে কাঠের আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি করে। সাধুর হাতে একটা মোটা বই। তারই মধ্যে চোখ গুঁজে বসে আছে সে। কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।

সুন্দররাজন জিজ্ঞেসা করলেন, 'উনি কে মায়ি?'

জানতে পারবে একটু পরে! ওর নিজের মুখ থেকেই সব জানতে পারবে। একটু আগে অলকানন্দার ওপারে যাঁর রূপ আর গুণ দেখে তোমরা দেবধূত বলেছিলে,এ ঠিক তার উল্টো।'

'তার মানে?' সুন্দররাজনের পুনঃ প্রশ্ন।

'দেবানন্দজীর গায়ের রং গৌরোজ্জ্বল, এর শ্যাম বর্ণ। সে সাধুর সমস্ত শরীরে ছলমল করছে দামী কাপড়, জামা, সোনার গয়না, এর কপালে কয়েকটি ভস্মের দাগ ছাড়া আর কিছুই নেই কোথাও। বিয়াল্লিশ বছর বয়সেও দেবানন্দের বাব্‌রি আর দাড়ির কি শোভা। এর দ্যাখো,ওসবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। চোখে নেই সোনার ফ্রেমের চশমা। এ গাইতে পারে না ভজন অমন মন মাতানো সুরে। দেবানন্দের মাতৃ সম্বোধন শুনে তোমরা মুগ্ধ হয়েছো দুজনায়। আর, এর আচরণ যে কত রূঢ়,কত কর্কশ যে এর কথাবার্তা—এখনই প্রমাণ পাবে তার। দেবানন্দকে তোমরা মহাপুরুষ বলেছো, একটু পরেই একে বলবে—লম্পট।'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলতে চাইল—'না, না, সেকি—লম্পট বলবো কেন এঁকে। ইনি তো ত্যাগী পুরুষ। এমন কনকনে ঠাণ্ডায় খালি গায়ে বসে আছেন—' কিন্তু তার কথা শেষ করতে না দিয়েই আশামায়ি বলে উঠলেন—

Scanned by CamScanner

'বেশ তো, কত বড় ত্যাগী পুরুষ দ্যাখোই না তা।' এই বলে, ওদের দুজনকে নিয়ে গুম্ফার প্রবেশ মুখের দুই ধারে দাঁড় করিয়ে দিলেন আড়ালে। তারপর, নিজে মাথায় কাপড় নিয়ে গুম্ফার মুখে দাঁড়িয়ে মিষ্টি সুরে ডাকলেন—'প্রণাম হই গো বাবাঠাকুর।'

বই থেকে মুখ না তুলেই সাধু বললেন—'কি চাই?'

'দুটো কথা নিবেদন করতে এসেছি আপনার কাছে।'

দৃষ্টি যেখানে নিবদ্ধ ছিল সেখানেই রইল, মুখে গড় গড় করে বলে গেলেন সাধু-'আমার কাছে কেন এসেছো?' জানো না—আমি মদ-ভাঙ্গ-গাঁজা খাই, সুযোগ পেলেই নারী সঙ্গ করি আমার কাছে মেয়েরা তাই কেউ আসে না। তুমি এসেছো কোন সাহসে?' সুন্দররাজন আর জয়ন্ত পরম বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চাওয়া চাওয়ি করলো।

মায়ি বললেন—'আমি যে এসেছি একটি মেয়ের খবর নিয়ে, বাবা।'

'মেয়ের খবর?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,বৃন্দাবন থেকে আজ সবে এসেছে। আঠারো বছর বয়েস। যেমন গায়ের রং,তেমনি চোখ মুখ। ও আজ স্নান করতে এসে আপনাকে দেখে পাগল হয়ে গেছে। বলে পাঠিয়েছে,আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আজ সন্ধ্যার পর ও আসবে আপনার গুম্ফায়। আপনার সেবা করবে ওর সবর্বস্ব দিয়ে সারারাত। সন্ধ্যার পরে তো ঘাটে জনপ্রাণী কেউ আসে না কখনও।'

'আমার সেবা করবে?' কথার সুর শুনে মনে হল—মায়ির সব কথা বোধগম্য হচ্ছে না সাধুর।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার মত বয়সের স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ পেলে কোন মেয়ের আবার ইচ্ছা হয় না সেবায় লাগার।' বই থেকে এতক্ষণে মুখ তুললো যুবক। ভাল করে দেখলো মায়িকে একবার। তারপর বলল—'আমার সেবায় লাগতে চায় আবার কোন মেয়ে?একটু আগে বলিনি—আমি মদ-গাঁজা-ভাঙ্গ খাই, নারী সম্ভোগে মেতে থাকি। আমার নাম শুনলে ভদ্রলোকের মেয়েরা পালিয়ে যায় দশহাত দূরে। আর তুমি চাচ্ছ আমার সেবায় লাগাতে?' বোঝা গেল,বই-এর মধ্যে এমনই ডুবে ছিলেন এতক্ষণ যে, মায়ির সব কথা কানেও যায়নি সাধুর।'

আমি নই, আমি নই—বাবা, আমি তো তেত্রিশ বছরের বুড়ী। যে আজ সেবায় লাগতে চায়, তার বয়েস মাত্র আঠারো। তার ওপর আবার বৃন্দাবনের মেয়ে। বুঝতেই পারছেন—গোপীকা রসে ভরা মন। আপনি অনুমতি দিন বাবা, আমি পাঠিয়ে দেবো সেই ব্রজবাসিণীকে আপনার কাছে সন্ধ্যা বেলায়।'

Scanned by CamScanner

'পাঠিয়ে দেবে? সন্ধ্যা বেলায়?' স্বপ্নোত্থিতের মত স্বর মনে হল সাধুর।

'হ্যাঁ, বাবাঠাকুর।'

'আমি ব্যাভিচারী জেনেও সে আস্‌বে?'

'নিশ্চয়, সে যে আপনার সঙ্গপাবার জন্যে পাগল। আর, আপনিও যখন নারীসঙ্গ ভালবাসেন?'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই'

'তবে পাঠাবো তো বাবা—।'

ঘাড় নেড়ে সাধু বললেন—বেশ পাঠাবে।' বলেই আবার চোখ নামালেন বই-এর ওপর।

'ওটা কি বই পড়ছেন, বাবা শ্রীমদ্ভাগবত?'

'না। মহর্ষি বাৎস্যায়নের কামসূত্র।' বই থেকে মুখ না তুলেই গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন সাধু। আবার পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় হল জয়ন্ত এবং সুন্দররাজনের।

মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন মায়ি। বললেন—এখন তবে আসি বাবা!

'এসো।'

'ওবেলা পাঠিয়ে দেবো তাহলে?'

'পাঠিও।'

আশামায়ি ধাপে ধাপে পা ফেলে ওপরে উঠতে লাগলেন সঙ্গমঘাট থেকে। অনেক্ষণ তিন জনের মধ্যে একটি কথাও হল না। ওপরে এসে দুধাধারী পাণ্ডার দেওয়া বাড়ীটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত প্রশ্ন করলো—'ব্রজবাসিনী মেয়ে আবার কে মায়ি।'

মায়ি হাসলেন। চিরদিনের তাঁর সেই গালে টোল ফেলা রহস্যময় হাসি। বললেন 'দেখতেই পাবে সন্ধ্যাবেলায়।'

'আমাদেরও কি যেতে হবে সন্ধ্যাবেলায়?' সুন্দররাজন জানতে চাইলেন।

'নিশ্চয়। তোমরা যে যাচাই করতে এসেছো। তোমাদের তো যেতেই হবে আমার সঙ্গে সবর্বত্র। ঐ সাধু আর এই সাধুতে পার্থক্য কত দেখতে পাচ্ছ? উনি ডুবে আছেন ভজনগানে, আমায় মা-মা বলে সম্বোধন করলেন কতবার। আর, ইনি? ইনি ডুবে আছেন বাৎস্যায়নের কামসূত্রে। আমাকে একবারও মা বলে ডাকলেন না।'

সুন্দররাজন রাগে গস্‌ গস্‌ করে উঠলেন—'সঙ্গমঘাটের এই লোকটাকে আবার আপনি সাধু বলছেন মাতাজী একটা ইতর,কামুক,ববর্বর—সত্যিই তো! কতবড়

Scanned by CamScanner

নির্লজ্জ নিজেই চিৎকার করে বল্‌ছেন—বাৎস্যায়নের কাম-শাস্ত্র পড়ছি! এদিকে অথচ, সাধু সেজে ব'সে আছে ধূনী জ্বালিয়ে এক টুকরো লাল কাপড়ে হাঁটু অবধি ঢেকে, আর কপালে ভস্মের আঁচর কেটে।' জয়ন্ত জুড়ে দিল।

সুন্দররাজন শুধালেন—'আচ্ছা মায়ি, এইরকম জঘন্য একটা ভণ্ডের সঙ্গে আপনি এসব কি করছেন, কি বল্‌ছেন এতে, আপনার লাভ কি হবে?' হঠাৎ খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন মায়ি লঘুচিত্তাবালিকার মত। হাসির দমক থাম্‌লে বললেন—'আমার আবার লাভ ক্ষতি কি বাবারা। আমার তো এদের সবার স্বাভাবই জানা। তবু এই যে আজ অভিনয়ে নেমেছি, এতো শুধু তোমাদেরই জন্যে। তোমরা না যাচাই করতে এসেছো।' এই বলে, নিজের ঘরের দিকে এগুতে এগুতে আশামায়ি তাঁর আশ্চর্য্য সম্মোহিনী স্বরে কবীরের ভজন ধরলেন—

মনকা ফেরৎ জনম গয়ো গয়ো ন মনকা ফের।
করকা মন্‌কা ছোড় কর মন্‌কা মন্‌কা ফের।।

(জপমালার গুটিকা ঘুরোতে ঘুরোতেই জীবন গত হ'ল,কিন্তু হৃদয়ের অন্ধকার তো ঘুচ্‌ল না। অতএব,হে সাধু,হাতের গুটিকা ফেলে দিয়ে এবার মনের গুটিকা ঘুরাও।)

সাত

বেলা চারটেতে মায়ি বললেন— ঠিক সন্ধ্যায় তোমরা দুইজনে গিয়ে দাঁড়াবে অলকানন্দার ওপারে সেই চশমা পরা সাধুর ডেরার সামনে। আমি না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবে কিন্তু।'

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন মাতাজী।' সুন্দররাজন প্রশ্ন করলেন।

'এখানকার এক ভক্তের বউ-এর কাছ থেকে শাড়ী-গয়না জোগাড় করতে। ব্রজবাসী মেয়ের শাড়ী গয়নার দরকার হবে না?'

গেরুয়া কাপড়ই সুন্দর করে কোঁচা দিয়ে পরেছেন আজ মায়ি। নিটোল কপালে দিয়েছেন একটা সিঁদুরের টিপ্। তাতেই তাঁকে মনে হচ্ছে যেন অষ্টাদশী তরুণী। ওঁর গমনপথের দিকে একভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে—একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সুন্দররাজন কিছুটা যেন আপন মনেই বলে উঠলেন—'আশ্চর্য্য রহস্যে ঘেরা এই মাতাজী। কোথায় যেন একটা অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার আছে এঁর মধ্যে লুকিয়ে—বাইরে থেকে যার হদিস্ পাওয়া ভয়ানক কঠিন। এঁরই দয়ায় রামানন্দ অবধূতের মত অবিশ্বাস্যএক ব্যক্তিত্বকে দেখার সুযোগ আমরা পেয়েছি। কিন্তু আজ যে উনি

Scanned by CamScanner

দেবানন্দ এবং ঐ সঙ্গমঘাটের সাধুকে নিয়ে কি খেলা খেলতে চাচ্ছেন—কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।

জয়ন্ত হাস্‌লো। বলল-'আমার তেরো বছর বয়সে প্রথম যখন মায়ির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল হরিদ্বারের হরকি পেরী ঘাটের চত্বরে, তখন থেকে বেশ কয় বছর মায়িকে নিয়ে আমিও কম চিন্তা করি নি। ক্রমেই বুঝেছি—ওঁর কোন আচরণের তাৎক্ষণিক বিচার করতে যাওয়াটা ভুল। অপেক্ষা করতে হবে, তবেই একসময় সব বোঝা যাবে স্পষ্ট ভাবে, ওঁর শক্তিটাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে তখন আমাদের কাছে।'

নির্দ্দেশিত সময়ে নির্দ্দেশিত জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো দুইজনে। অভ্রভেদী পর্ব্বত পরিবেষ্টিত দেবপ্রয়াগে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তাড়াতাড়ি পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে আকাশে। স্বপ্নময় হয়ে উঠছে ক্রমে পাহাড়ী এই ক্ষুদ্র জনপদটি।

লাগ্ লাগ্ সন্ধ্যায় মাতাজী এসে দেখা দিলেন ব্যস্ত পদে হাতের লালরং-এর সিল্কের শাড়ীটা জয়ন্তকে দিয়ে বললেন—'এটা ধরো মিন্‌সা। আমি যাই দেবানন্দের কাছ থেকে ঘুরে আসি। দ্যাখো তো,আমার কপালের টিপটা ঠিক আছে কি না।'

জয়ন্ত জানালো—ঠিক আছে।

এইবার পরণের গেরুয়া কাপড়টা ভালোভাবে গুছিয়ে নিয়ে, মন্থর পদে রাজহংসীর মত আশামায়ি গিয়ে প্রবেশ করলেন দেবানন্দের আবাসে। বলে গেলেন—'কান সজাগ রাখবে। যদি ডাকি ভেতরে যাবে। নাহলে বাইরেই অপেক্ষা করবে।'

আধ ঘণ্টা পরে হঠাৎ দেখা গেল—উন্মাদিনীর মত ছুটতে ছুটতে আশামায়ি বেরিয়ে আসছেন আশ্রমের ভেতর থেকে। আলু থালু চুল। কাপড়ের আঁচল লুটাচ্ছে মাটিতে। দুই ভুরু মধ্যেকার সিঁদুরের টিপ লেপ্টে গেছে সারা কপালে।

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে মায়ি বললেন—'তোমাদের দেবদূতের মত চেহারার লোকটার কীর্তি দ্যাখো বাবারা। আমার কাপড় খুলে দিতে চায়, আমায় জাপ্টে ধরতে চায়।—আমি ধাক্কা মেরে ছুটে বেরিয়ে এসেছি পথে—'

আকাশ থেকে পড়লেন সুন্দররাজন—কী বলছেন? অমন চেহারা যে সাধুর,অমন মা-মা করে ডাকছিলেন যিনি আপনাকে বার বার,সকালে তিনিই আপনার শরীরে হাত—'হ্যাঁ বাবা। আশ্রমের সব লোককে তো পাঠিয়ে দিয়েছে আগেই মন্দিরে। আমি ঢুকতেই আমার হাতে চন্দন, কস্তুরী, অগুরু তুলে দিয়ে বলল—এই নাও মা। তুমি যা যা চেয়েছিলে। সিদ্ধিটা কেবল আমি সরবৎ করে খেয়ে নিছি। তোমার জন্যেও রেখেছি কিছুটা খাবে নাকি? আমি বললাম—আমি সিদ্ধি খাই না বাবা।

Scanned by CamScanner

লক্ষ্য করে দেখলাম—সিদ্ধির নেশায় একেবারে টলমল করছে, জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে কথা বলতে গিয়ে দেবানন্দ বলল—এবার তবে আমার সেবা শুরু করো। চলো, শোবার ঘরে চলো। সেবায় খুশি করতে পারলে, আমার এই সোনার আংটিটা বখ্‌শিস পাবে, মা তোমার কোন চিন্তা নেই। এই বলেই আমার কাপড়ের আচল ধরে টানাটানি আরম্ভ করলো সে। মুখে মা বলছে, আর হাতে করছে এইরকম ব্যবহার। অতি কষ্টে, হ্যাঁচ্‌রা হেঁচড়ি করে কাপড়ের আচঁলটা ওর হাত থেকে বের করতে গিয়ে যে ধস্তা ধস্তি করতে হয়েছে আমাকে, তারই ফলে চুলের খোঁপা গিয়েছে খুলে, কপালের সিঁদুর গিয়েছে লেপটে। এরপর আমার হাত চেপে ধরাব চেষ্টা করতে, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে মারলাম একধাক্কা। তোমাদের দেবদূতের পা তখন টলছিল ভাঙ্গের আমেজে, আমার ধাক্কা সামলাতে না পেরে ছিট্‌কে গিয়ে পড়লো আসনটার ওপর। আমি ছুটে বেরিয়ে এলাম পথে!'

সুন্দররাজন হাতের আস্তিন গুটাতে গুটতে দাঁত কড়মড় করে বললেন—'এত বড় সাহস ঐ সাধুর? আপনার কাপড় ধরে টানাটানি করে? ওকে আজ উচিৎ শিক্ষা দেবো।' বলে প্রায় দৌড়ে চলে যাচ্ছিলেন আশ্রমের দিকে, মায়ি চিৎকার করে ডেকে তাঁকে ফেরালেন। আলু থালু চুলগুলো আবার গোছ করে নিয়ে, এলো খোঁপাটা বাঁধতে বাঁধতে বললেন—'তোমরা এসেছো ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনধারার ভালমন্দ সম্বন্ধে খোঁজ নিতে। তোমাদের কি এমন সামান্য ব্যাপারে এত উত্তেজিত হওয়া উচিত। যে মানুষকে দেখে ওবেলা দেবতা ভেবেছিলে, এবেলা তাকেই মারতে চাচ্ছ, ভুল তো ভাঙ্গলো তোমাদের। তোমাদের গবেষণার পথে এই ভুল ভাঙ্গাটাই হচ্ছে আসল কথা। এখানে উত্তেজনার কোন স্থান নেই। গৃহীদের মধ্যেও তো মন্দ লোক আছে। নেই?'

'আছে। কিন্তু তারা তো আর সাধু সেজে থাকে না।'

'অনেক গৃহী আছে, অনেক ধর্ম-কর্ম করছে, ধর্মের কাজে হাজার হাজার টাকা ঢেলে দিচ্ছে, আবার তারই সঙ্গে শত শত লোককে প্রতারণা করছে, বাঈজী নিয়ে মেতে আছে দিন-রাত, টাকার লোভ দেখিয়ে গরীদের মেয়েদের টেনে আনছে কুপথে। কালোবাজারি করে লুটে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। কি, ঠিক নয়?'

'তা তো ঠিক। কিন্তু-'

'তাদের কজনকে তুমি পারছো সাজা দিতে বলো? ঐ কজন দুষ্ট প্রকৃতির গৃহীকে দেখেই সমস্ত গৃহীদের যদি আমি বলি খারাপ, তাহলে যেমন একটা ভয়ঙ্কর ভুল হবে আমার। ঠিক তেমনি, দুটো চারটে সাধুবেশ ধারীর অসাধু আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে এই মহান দেশের সমস্ত উপাসক সাম্প্রদায়কেই কেউ যদি সম্ভোগ প্রিয় আলস্য

Scanned by CamScanner

সুখভোগী বলে আখ্যা দিয়ে বসে তোমাদের ঐ দিল্লীর নেতার মত,তবে তার মত মহাপ্রমাদ আর কেউ করবে না।'

মায়ির কথায় কাজ হল দেখা গেল। হাতের আস্তিন আবার কব্জি পর্য্যন্ত নামিয়ে বোতাম লাগালেন সুন্দররাজন দুই হাতের।

এতক্ষণে মায়ির গলা তার হাত আর কানের দিকে দৃষ্টি পড়লো জয়ন্তের। কানে দুল,হাতে বালা,গলায় হাঁসুলি চক্ চক্ করছে।

'আপনি গয়না পড়েছেন মা? কোথায় পেলেন?' জয়ন্ত জিজ্ঞেসা করলো।

'যে ভক্তের কাছ থেকে শাড়ী এনেছি, এ গয়না তারই। উত্তরকাশীতে বলেছিলাম না—দেবপ্রয়াগে আমায় অভিনয় করতে হবে। এসব হচ্ছে অভিনয়ের সাজ।'গেরুয়া কাপড়টা ঠিক করে পরে নিয়ে আবার বললেন—'চল এবার সঙ্গমঘাটে। সেখানে শুরু হবে আর এক অভিনয়ের পালা।'

'দরকার নেই মাতাজী আর আপনার অভিনয়। আমাদের চোখে সত্যকে তুলে ধরতে গিয়ে আর হেনস্থা ভোগ করতে হবে না আপনাকে।'সুন্দররাজনের কণ্ঠে অনুনয়ের সুর।

'তা কি হয় বাবা? সাধুকে কথা দিয়ে এসেছি যাবো বলে,সে কথা কি ভাঙ্গা যায়?'

'আপনি যে বৃন্দাবনী মেয়ের কথা বলেছিলেন, সে কোথায়?'

নিজেকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে মায়ি বললেন—'এইতো সেই আঠেরো বছরের বৃন্দাবনী মেয়ে। ঘাটে গিয়ে কাপড় বদলে নেবো কেবল। বৃন্দাবনী সাজতেই তো গয়না পরতে হয়েছে এত।

'ও লোকটা মদ খায়, গাঁজা খায়, ভাঙ খায়—ও নিজে বলেছে।' সুন্দররাজন বলল।

'তা তো জানি।'

'ও লোকটা বাৎস্যায়নের কামসূত্র পড়ে বসে সবসময়।'

'সেটাও তো শুনেছি ওরই মুখে।'

'ওলোকটা লম্পট।'

'তেমনি তো মনে হয় ওর কথাবর্তায়।'

'এসব জেনেও আপনি যাবেন জনশূন্য ঐ ঘাটে বৃন্দাবনী মেয়ে সেজে ঐ লোকটার কাছে এই শীতের রাত্রে?'

সেই গালে টোল খাওয়ানো বিচিত্র হাসি হাসলেন আবার আশামায়ি। বললেন, 'হ্যাঁ,এসব জানা সত্বেও যেতে হবে আমাকে। চল, আর রাত বাড়িও না বাবা।'

Scanned by CamScanner

আট

পূর্ণিমায় জোৎস্নায় ঢল নেমেছে আজ দেবপ্রয়াগের পবর্বতে পবর্বতে। চীর-দেবদারু গাছের অঙ্গে অঙ্গে আর অলকানন্দা এবং ভাগীরথীর জলতরঙ্গে। উদ্ভিদ যৌবনা কোন অভিসারিকার মত তর তর করে পথ চলছেন মায়ি—সহযাত্রী দুজনকে অনেকটা পেছনে ফেলে। অনেক্ষণ নীরবে পথ চলার পরে জয়ন্তই প্রথম কথা কইল। বলল 'কেমন যেন অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেদের। সাধু সমাজ সম্বন্ধে আমাদের মনের ধারণার পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করতে গিয়েই তো মাকে আজ লাঞ্ছনা সহ্য করতে হ'ল ঐ দেবানন্দের হাতে।'

চিন্তিত স্বরে সুন্দররাজনও সমর্থন জানালেন জয়ন্তকে। বললেন—'দেখুন না,আবার এখন চলেছেন আর মাতাল চরিত্রহীন যুবকের কাছে। প্রাণে কি ভয় বলে কোন জিনিস নেই মাতাজীর?'

'মায়ি যে স্তরের মানুষ,সেখানে ঘৃণা,লজ্জা,ভয়—বলে কিছু নেই। এ সব কিছুর উর্দ্ধে উনি। অন্ততঃ আমার গত দশ বছরের অভিজ্ঞতা এমনটাই বলে।' জয়ন্ত বলল।

জনমানবহীন সঙ্গমঘাটে পৌছে, প্রথমেই একটা পাথরের আড়ালে গিয়ে ভক্তের কাছ থেকে নিয়ে আসা লাল সিল্কের শাড়ীটা পরে নিলেন আশামায়ি। ঝলমলে গয়নায় আর টকটকে লাল শাড়ীতে নির্মল আকাশের চাঁদের আলো এসে পড়ে, মায়িকে করে তুলেছে স্বর্গের ইন্দ্রাণী। সত্যি সত্যিই অষ্টাদশীর মত দেখাচ্ছে বটে তাঁকে।

ঘাটে নামবার শেষ ধাপটার ওপর দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখে নিলেন লাল এক ফালি মাত্র কাপড় পরে এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় খালি গায়ে বসে থাকা সেই যুবক সাধুটাকে। গুম্ফার মধ্যে দেওয়াল গাত্রে চীড়কাঠ জ্বলছে। তাতেই ছোট গুম্ফা বেশ আলোকিত। তার ওপর সাধুর সামনে জ্বলছে ধিকি ধিকি করে ধুণীর আগুন। তারই আভাতে মুখটা লাল হয়ে আছে পাঠনরত সাধুর। সকালের মত এখনও বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রই পড়েছে নিশ্চয়। হু হু করে এই যে কন্‌কনে বাতাস বইছে উত্তর থেকে, এই যে তিন তিনটে মানুষ গুম্ফার বাইরে থেকে তাকে দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—কোন দিকে কি ভ্রুক্ষেপ আছে তার! কামসূত্র পড়ছে, আর মনে মনে সময় গুনছে বোধহয়—কখন আসবে সেই আঠেরো বছরের বৃন্দবনবিলাসিনী।

ওবেলা আড়ালে থাকতে হয়েছিল। তাই ভাল করে সাধুকে দেখতে পায় নি

Scanned by CamScanner

জয়ন্তরা। এবেলা যেখানে এখন দাঁড়িয়ে ওরা, সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় সমস্ত শরীর। মুণ্ডিত মাথার নীচে কপাল জোড়া দুই বড় বড় চোখ আকর্ণ বিস্তৃত। নিটোল নাক, গাল, থুতনী। কচি কচি ভাব সমস্ত মুখে। নগ্ন দেহের পরতে পরতে মাংসপেশী গুলো সবল সুঠাম। কোমরটা সরু, কিন্তু, চওড়া বুক যেন পাথর দিয়ে তৈরী। কাটা কাটা মাংস পেশীগুলো ফেটে বেরিয়ে আসতে চায় ও একটু নড়লে চড়লেই। যেমন স্বাস্থ্য তেমনি লাবন্য। প্রথম দর্শনেই মনে হয় বুঝি মহাভারতের অর্জুন বসে আছে তার অজ্ঞাতবাসের সজ্জায়। একটা রুদ্রাক্ষের মালা ছাড়া সারা গায়ে আর আভরণ নেই কোথাও।

এমন অপরূপ কান্তি যার, সে কেন সংসারী হল না? কেন সাধুর ছদ্মবেশে নিজের লাম্পট্য চরিতার্থ করতে এমন জঘন্য জীবন বেছে নিল! জয়ন্ত ভাবল।

আশামায়িকে দেখে মনে হল তাঁর সমস্ত সাহস সমস্ত উৎসাহ যেন ফুরিয়ে গেছে। কেমন যেন একটা আড়ষ্টতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন তিনি ধীরে ধীরে। বোধহয় কামসূত্রে মগ্ন এ যুবকের সামনে এগিয়ে যেতে দ্বিধা আসছিল তাঁর অন্তরে। তবু এগুলেন। যাবার আগে নিম্নস্বরে বলে গেলেন—'তোমরা কিন্তু চলে যেও না, কাছাকাছি থেকো। 'জয়ন্তের মনে হল—আশামায়ির গলাটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠল শেষ কথাগুলো বলার সময়। এত শীতেও মায়ির কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে ফোঁটা ফোঁটা জড়িত চরণে গুম্ফার একেবারে সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেন মায়ি প্রথমে। তারপর কিছুক্ষণ গলাখাকানি দিলেন বেশ কয়বার। যাতে তন্ময়তা ভাঙ্গে সাধুর।

সুন্দররাজন গজ গজ করলেন—'এই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় খালি গায়ে বসে কামসূত্রে এমনি মেতে আছে যে, মাতাজীর গলার আওয়াজ পর্য্যন্ত কানে পৌঁছচ্ছে না ওর?'

অবশেষে প্রায় চিৎকার করে বললেন মায়ি—'ও গোঁসাই বাবা গো!'

প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ডাকে কিছুই হল না। সাধুর চোখ যেমন বই-এর ওপর ঝুঁকে ছিল,তেমনি রইল। জয়ন্ত ভাবল—নিশ্চয়ই লোকটা মদ খেয়ে বেটাল হয়ে বসে আছে,তাই এমন বাহ্যজ্ঞানরহিত।

চতুর্থবার তারস্বরে আবার ডাকাডাকি করতেই সাধু বিড় বিড় করে যেন মুখস্থ বলতে লাগল—

'এখানে গোঁসাই টোসাই কেউ নেই, এখানে জ্বালাতে এসেছ কেন। আমি মদ খাই, গাঁজা খাই, ভাঙ খাই, সুযোগ পেলেই নারীসঙ্গ করি। সমস্ত মেয়েরা আমার নাম শুনলে সাতহাত দূর দিয়ে পালিয়ে যায়,আর তুমি এসেছো কাছে একা, এতো রাত্রে। তোমার সাহস তো কম নয়। যাও, চলে, যাও, এখুনি।'

Scanned by CamScanner

'আপনি যে আমায় আসতে বলেছিলেন গোঁসাইজী।' বেশ বোঝা গেল মায়ির গলার স্বর কাঁপছে।

এইবার চোখ তুলল বই-এর মধ্যে থেকে সাধু। বিরাট দুই চোখে তন্ময়ভাবের চিহ্ন তখনও প্রকট—'আমি আসতে বলেছিলাম।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি সেই বৃন্দাবনের মেয়ে—যে আপনাকে দেখে পাগল হয়ে আপনার সেবা করবে বলে খবর পাঠিয়েছিল ওবেলা!'

'বৃন্দাবনের মেয়ে?' এমন একটা অদ্ভুৎ নাম জীবনে প্রথম শুনছে যেন সে—এমনি মনে হল সাধুর কণ্ঠের সুরে। বৃন্দাবনের মেয়েকে আমি আসতে বলবো কেন? কি আমার দরকার?'

'আজ রাত্রে যে আপনার চরণে উৎসর্গ করবো আমি আমাকে!'

'উৎসর্গ করবে? আমি দুশ্চরিত্র ব্যাভিচারী জেনেও!'

একটু হেসে আশামায়ি জবাব দিলেন—'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সব জেনেই তো এসেছি আমি। 'দেখছো আমি বাৎস্যায়নের কামসূত্র পড়ছি।'

'ও পড়া তো খুব ভাল। বৃন্দাবনের মেয়ে আমি। আমি তো ঐ সবই চাই। ভাল করে এবার তাকালো সাধু মায়ির মুখের দিকে। বলল—

'মুখ দেখে মনে হয় স্বর্গের দেবী,মনের ভেতর এত কামের জ্বালা?'

'সেই জ্বালা মেটাতেই তো তোমার কাছে আসা গোঁসাই। আজ পূর্ণিমার রাত। সঙ্গমঘাটে জনপ্রাণী নেই কোথাও। সারারাত শুধু তুমি আর আমি—

হঠাৎ সিংহনাদ করে উঠল সাধু—'চুপ রও শয়তানি।' মনে হল চারপাশের পাথরের চাঁইগুলো যেন কেঁপে কেঁপে উঠল সেই সাংঘাতিক গর্জনে। মায়ি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। নিদারুণ রোষে হাতের গ্রন্থ ছুঁড়ে গুম্ফার বাইরে ফেলে দিয়ে,বিদ্যুৎ গতিতে লাফিয়ে উঠল সন্ন্যাসী—কার সঙ্গে তুই লাগতে এসেছিস হারামজাদী জানিস নে? হরিহর মস্তানের নাম শুনিস নি?'

যে বইটা ছুঁড়ে ফেলেছিল হরিহর ক্রোধের আধিক্যে গুম্ফার বাইরে, সেটা এসে পড়েছিল জয়ন্তের পায়ের কাছে। সেটা তুলে নিয়ে তার নাম পড়ে,জয়ন্ত ·তো অবাক। বাৎস্যায়নের কামসূত্র কোথায়? এটা যে যোগাবিষ্ঠ রামায়ণ!

পেছুতে পেছুতে ঘাটের একেবারে মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন আশামায়ি।

আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠল সাধু—'চিনে নে আজ এই হরিহর মস্তানকে, চিনে নে, এই দ্যাখ্—' বলেই পরণের লাল কাপড়টা টেনে ছুঁড়ে ফেলে সম্পুর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো হরিহর। স্পষ্ট দেখা গেল, তার লিঙ্গের মাথা এফোঁড় ওফোঁর করে একটা আট

Scanned by CamScanner

আঙ্গুল ষ্টীলের শিক্ ঝুলছে। চাঁদের আলোতে চক্ চক্ করছে সেই ষ্টীলের শিকটা।

হরিহর বলে চলল, পাঁচ বছর আগে আমার আঠারো বছর বয়সে এই লিঙ্গ বিদ্ধ করি আমি, সাধু সমাজে সবাই জানে আমকে বিদ্ধ লিঙ্গি বলে। আর তুই এসেছিস সেই বিদ্ধ লিঙ্গির সঙ্গে রংগ করতে?'

খানিকটা উঁচু পাথরের ওপর গিয়ে দাঁড়ালেন এবার মাতাজী। চিৎকার করে বলে উঠলেন তিনি—'তবে তুমিও চিনে রাখো হরিহর মস্তান বরিশালের আশালতাকে। এই দ্যাখো,ভাল করে দেখে নাও—কাকে তুমি শয়তানী বলছো' এই বলে, আশামায়িও বিবস্ত্রা হলেন মুহূর্তে সম্পূর্ণ ভাবে। শরীরের নিম্নার্দ্ধে কোথাও কিছু নেই,কেবল চন্দ্রালোকে বোঝা গেল—চক্চকে কি যেন একটা পরে আছেন আশামায়ি নেংটির মতন করে।

উচ্চকণ্ঠেই বলে চল্লেন তিনি ওটিটা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে "এটা কি জানো? একে বলে তাম্-কোপনী। তামার জাল দিয়ে তৈরী কৌপীন। পেচ্ছাপ-পায়খানার জন্যে এই কৌপীনের সামনে পেছনে দুটো ফুটো আছে কেবল। আর এই কোমরটার কাছে দ্যাখো—কোপণীর বেল্টে তালা লাগানো। আমার তেরো বছর বয়সে এ তালা লাগিয়েছেন আমার গুরু নেত্রা-মা। যাঁর বয়স এখন একশো সাঁইত্রিস বছর, যিনি থাকেন সুবর্ণগিরি নদীর তীরে এক পাহাড়ের গহ্বরে। এ তালার চাবি রয়েছে তাঁর কাছে। তিনি যেদিন খুলে দেবেন এই তালা, সেদিনই মুক্ত হবো এই তাম্কোপণীর বন্ধন থেকে, তার আগে নয়। কুড়িটি বছর এই তামার জালে বন্দী হয়ে আছি, মস্তান, বয়ে বেড়াচ্ছি এই তালাকে। এই তালা, এই তালা—' বলতে বলতে সেই তালার ওপর চাপড় মারতে লাগলেন মায়ি! ঝুলানো সেই ছোট তালাটি তামার জালে ধাক্কা খেয়ে শব্দ তুলতে লাগলো—ঠক্ ঠক্ ঠক্। আশামায়ি ইন্দ্রিয় জয়ের তূর্য্যনাদ।

হরিহর ছুটে গিয়ে আশামায়ির সামনে দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল—'তুমি কামকে জয় করেছো, তুমি আমার সহোদরা!'

পাথরের চাঁই থেকে দ্রুত নীচে নেমে এসে তড়িৎগতিতে হরিহরের সামনে উপস্থিত হলেন মায়ি। উদাত্ত স্বরে বলে উঠলেন—'তুমি বিদ্ধ লিঙ্গি, তুমি উদ্ধরেতা! তুমি আমার ভাই।'

এই পর্য্যন্ত বলার পরই দুজনা ছুটে গিয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন

Scanned by CamScanner

উদ্বেলিত আবেগে। অদূরে ঘাটের নীচে, কহিমালয় দুহিতা দুই বোন ভাগিরথী আর অলকানন্দার মিলনোচ্ছ্বাসের শব্দ উঠছে গম্ গম্ করে। সেই সঙ্গম শব্দকে পশ্চাৎপটে রেখে ঘাটের ওপরে চন্দালোকে ঘটে গেল আর এক অপূর্ব্ব সঙ্গম। কামজয়ী দুই ভাইবোনের অকল্পিতপূর্ব্ব পবিত্র সঙ্গম।

নয়

পাথরের আড়ালে গিয়ে কাপড় বদলে এসে সেই যে মুখ বন্ধ করেছিলেন মায়ি—সারাটি পথ একটি কথাও বলেন নি। জয়ন্ত এবং সুন্দররাজনের কথা বলার শক্তি ছিল না। যে দৃশ্য তারা একটু আগে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে এসেছে—তার প্রভাব এতই গভীরভাবে পড়েছিল দুজনার মনে যে, কথা বলবে কি,মুখ তুলে চাইতেও লজ্জা হচ্ছিল তাদের আশামায়ির দিকে। বিদ্ধলিংগি এক নিষ্কাম শুচিশুদ্ধ যুবা-তাপসকে সমস্তটা দিন কী না বলেছে তারা—ইতর,লম্পট,কামুক,ভণ্ড! অথচ পাছে কোন রমণী এসে বিরক্ত করে তাকে, সেই ভয়ে নিজেকে নিজেই দুশ্চরিত্র বলে জাহির করার কত না চেষ্টা হরিহরের। নিজেই বলছে মদ খায়,গাঁজা খায়,ভাঙ খায়,নারীসংগ করে, বাৎস্যায়নের কামসূত্রে মজে থাকে রাতদিন। কিন্তু হরিহর যখন ক্রোধাধিক্যে জ্ঞানশূন্য হয়ে হাতের বইটাকে ছুঁড়ে ফেলে,বজ্রগর্ভ হুঙ্কার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল গুম্ফার ভেতর থেকে—বাইরে, তখন সেই বইটা তুলে নিয়ে জয়ন্ত কি দেখেছিল? ওটা বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র নয়, বৈরাগ্যের মন্ত্রোদগাতা যোগাশিষ্ঠ রামায়ণ। যৌবন সম্ভোগের শ্রেষ্ঠতম যন্ত্র লিংগমুখকে শিক বিদ্ধ করে বিদ্ধ লিংগি যে হয়েছে মাত্র আঠারো বছর বয়সে, তারই সম্বন্ধে কত কটুবাক্যই না আজ উচ্চারণ করেছে তারা দুজনে। কামকে জয় করার বাসনায় এমন নিষ্ঠুর আত্মনির্যাতন কেউ যে করতে পারে,সেকথা দুঃস্বপ্নেও কখনও কি কল্পনা করতে পেরেছিল সুন্দররাজন কিম্বা জয়ন্ত? আর এটাও তো তাদের বুঝতে বাকী নেই যে, হরিহর-রহস্যের উদঘাটন করতেই আশামায়ির আজকের এই সারা দিনের শ্রম এবং অভিনয়। আর এই কারণেই মায়ির সঙ্গে কথা বলার শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে বসেছিল তারা।

আশামায়ি ফিরেই ঘরের দরজা সেই যে বন্ধ করেছেন রাত বারোটাতেও সে

Scanned by CamScanner

দরজা খোলা গেল না আর। বার বার দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে রুদ্ধদ্বার থেকে ফিরে এলেন সুন্দররাজন।

'দরজা খোলা থাকলে কি করতেন?' জয়ন্ত জানতে চাইল।

'তাম্‌কোপ্‌নি পরা মাতাজীর চরণ দুটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রাণের সমস্ত শ্রদ্ধা উজাড় করে দিয়ে একবার প্রণাম করতাম বলতাম—'মাগো! তুমি আমায় ক্ষমা করো। তোমাদের সন্ধান আমার মত কুপমণ্ডুকের জানা ছিল না। তোমাদের মত সাধক-সাধিকা এখনও রয়েছে এদেশের অরন্যে, পবর্বতকন্দরে,তাই আজও ভারত আধ্যাত্মিকতায় সম্রাট সারা পৃথিবীতে। সে অনন্যা,সে একক।'

সারা রাত্রি ঘুমালো না দুইজন, ছটফট করে কাটালো শুধু। ভোরের আলো দেখা দিতেই উভয়ে বেরিয়ে পড়লো ঘরের খিল খুলে। জয়ন্তের প্রাণও কম ব্যাকুল হয়নি আশামায়ির পাদপদ্মে একবার প্রণাম জানাতে। গত সন্ধ্যার সেই জ্যোৎস্নালোকে দেখা দৃশ্যটা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিল না সে।

একটু এগুতেই দুইজনেই দেখতে পেলো মায়ির ঘরের দরজা খোলা। এক রকম দৌড়েই সেখানে গিয়ে ঢুকে পড়ে সুন্দররাজন শ্রদ্ধাসিঞ্চিত স্বরে ডেকে উঠলেন 'মাতাজী'বলে। কিন্তু পরক্ষণেই চমকে উঠলেন। ঘর শূন্য। মাতাজীর সান্‌কী, আলখেল্লা, চিম্‌টা, ঝুলি—কিছু নেই ঘরে।

দুধাধারী পাণ্ডা তাদের দেখে,এগিয়ে এসে,একটা চীরকুট জয়ন্তের হাতে তুলে দিয়ে বলল—'রাত্রি চারটের সময় মাতাজী যাত্রা করলেন তুঙ্গনাথের পথে। এই চিঠিটা দিতে বলেছেন আপনাদের।'

ক্ষিপ্রহস্তে জয়ন্তের হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে তার ওপর ঝুঁকে পড়লো সুন্দররাজন। ঝরঝরে অক্ষরে হিন্দিতে লেখা চিঠি। চিঠিতে কোন সম্বোধন নেই। আশামায়ি লিখেছেন—

তোমরা আমার পরম স্নেহাস্পদই কেবল নও। তোমরা নতুন যুগের যাত্রী,তাই তোমরা দেশ আর জাতির অমূল্য সম্পদও। এই পূণ্যভূমিতে জন্মাবার সৌভাগ্য যখন হয়েছে, তখন এর অন্তর্নিহিত প্রধান শক্তির উৎস যে আধ্যাত্ম-জীবন তাকে বুঝতে, তাকে হৃদয়ম করতে সচেষ্ট হও। এর কাছে যাও, স্বচক্ষে দেখে বিচার করো,দেখবে—কী এক মহাশক্তির সাধনা চলেছে এদেশের মাটিতে সকল লোকচক্ষুর আড়ালে,নিভৃতে,নীরবে—যুগ যুগ ধরে।

আমার অনুরোধ—দোহাই তোমাদের, দূর থেকে কয়েকটি শহুরে গৈরিকধারীর

Scanned by CamScanner

আচার আচরণ দেখেই তোমারাও যেন আবার দিল্লীর ঐ নেতার মত ঐ একই ভুলই করে বোসো না তোমাদের জীবনেও।

এ যাত্রায় আমার কাজ শেষ হয়েছে। আমি আজ রাত্রি শেষে যাত্রা করবো তুঙ্গ- নাথের উদ্দেশ্যে। শেষ রাতের এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ঘুম ভাঙ্গিয়ে তোমাদের আর বিরক্ত করলাম না।

আবার কবে দেখা হবে জানি না। দেখা হলে—আনন্দ পাবো, উদ্দীপিত হবো। কারণ তোমাদের মত সহজ সরল প্রাণকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি।

জয়ন্ত লক্ষ্য করলো চিঠিটা পড়তে পড়তেই সুন্দররাজনের কণ্ঠ কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

এখন, চিঠি পড়া শেষ হতেই—চিঠি শুদ্ধ হাত দিয়ে দুই চোখ ঢেকে বাষ্পরুদ্ধ স্বরে ফুঁপিয়ে উঠলেন সুন্দররাজন—'আমার প্রণাম করা হল না জয়ন্ত, মাতাজী আমার প্রণাম নিলেন না।'

Scanned by CamScanner

ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে

(দ্বিতীয় খণ্ড)

চতুর্থ অধ্যায়

হিন্দু মরিসাসের চোখে কেন বিন্দু বিন্দু জল

Scanned by CamScanner

রচনারম্ভের প্রাগ্ মুহূর্তে সবিনয়ে স্বীকার করতে দ্বিধানেই যে আজকের এই ক্ষুদ্রাবয়ব প্রবন্ধের সূতিকাগারটি নিহিত রয়েছে সহস্রাংশু স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের দিগ্বিজয়ী আদর্শচ্ছটায় উদ্দীপিত বিশ্ব পথিক সন্ন্যাসীপ্রবর অদ্বৈতানন্দজী প্রণীত—'প্রচারব্রতে বিশ্বময়' গ্রন্থটির গভীরেই।

গ্রন্থটি যখন পড়ছিলাম—ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া, ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিপ্রচারে স্বামীজীর নিরলস প্রয়াস প্রচেষ্টার কথা, ঠিক তখনই অন্তরের প্রেক্ষাপটে সহসা ফুটে উঠল—ভারত মহাসাগরের তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ বুকে ছোট্ট 'শাম্পান'-এর মত ভেসে থাকা নাতিবৃহৎ দ্বীপ মরিসাস্-এর কথা! আর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল- এক ভারত প্রেমী জার্মানের কাছে চাবুক খাওয়ার কাহিনীটিও। যে চাবুক সেদিন খেয়েছিলাম,আজ এতদিন পরে, সেই চাবুকের জ্বালাটাই যেন আবার দ্বিগুন হয়ে দেখা দিল মনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে—'প্রচারব্রতে বিশ্বময়' পড়তে পড়তেই।

মরিসাস্-এর বো-বেসিনের (Beau-Basin)একটি স্কুল প্রাঙ্গনে বসে কথা বলার সময়েই প্রথম চাবুকটা খেয়েছিলাম—মনে অছে। চাবুকটা কষিয়েছিলেন বন্-এর প্রকৃতিবিজ্ঞানী ফন হার্টম্যান্। জার্মান ভদ্রলোক জ্বলন্ত চুরুটটাকে তাঁর ঠোঁট থেকে নামিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছিলেন--'তোমাদের লজ্জা হয় না?' শিক্ষক রামাধারী আমার পাশেই বসেছিলেন মোড়ায়। তাঁর আশ্রয়েই আমি উঠেছিলাম। জার্মান সাহেবের ছিপ্‌টির হাত থেকে বাঁচাবার বৃথাই চেষ্টা করলেন তিনি--' না, না, এ-ব্যাপারে ওকে দোষ দেবেন না ফন্ হার্টম্যান! ও তো এ যুগের—কিন্তু তাঁর কথা শেষ হবার আগেই, বাঁ হাতের তালুতে দক্ষিণের কীল-দাক্ষিণ্য কষিয়ে,গর্জে উঠেছিলেন জার্মান—'আলবাৎ দুষ্‌বো। এতে আবার এ যুগ আর সে যুগ কি? এ যুগের মরিসাস্-এর জন্য কতটুকু করেছে,কতটুকু ভেবেছে? যে দ্বীপে শতকরা একান্ন জনই হচ্ছে হিন্দু,আর যেখানে এতগুলি ভারতীয় রক্তবাহীর বাস—সে দ্বীপে খোঁজ খবর কি ওরা ভালভাবে রেখেছে কখনও, নিয়েছে কোন সন্ধান? ওরা খোঁজ রাখে ইউরোপ, আমেরিকা, আর রাশিয়া-চীন, জাপানের। নিজেদের খবর

Scanned by CamScanner

যারা নিজেরাই রাখে না, আমি জোর গলায় বলবো-নিঃসন্দেহে আত্মবিস্মৃতের জাত তারা। উজ্জ্বল অতীতের দোহাই যতই তারা পাড়ুক, ভবিষ্যত তাদের নিশ্চয়ই অন্ধকার।'

এই 'অন্ধকার' সম্বন্ধেই আবার আলোচনা উঠল পরের দিন। Beau-Basin-এর যে স্থানটিকে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে 'মরিসাস্ হিন্দি লেখক সঙ্ঘ'-আয়োজিত 'হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন' বসেছিল, সেইখানে দাঁড়িয়ে পণ্ডিত রামাধারী বলেছিলেন জার্মান সাহেবকে উদ্দেশ্য করে—"প্রফেসর বিষ্ণুদয়ালের অক্লান্ত চেষ্টায় প্রথম হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল মরিসাসে ১৯৪১ সালে। তারপর যে সম্মেলনটি হয়েছিল, তাও হয়েছিল বো-বেসিনের এই জায়গাটিতে, ফন্ হার্টম্যান। ভারতীয় ভাষার উজ্জ্বল দীপ্তিতে আপনার গতকালের বলা সেই 'অন্ধকার' এবার আস্তে আস্তে কেটে যাবে নিশ্চয়-কি বলেন?"

আজ এ বেলা, দেখলাম-প্রকৃতি বিজ্ঞানী বেশ কিছুটা যেন প্রকৃতিস্থ। গতকালের সেই ক্ষোভের উত্তাপ অনেকটাই প্রশমিত। বেশ শান্ত স্বরেই একটু বিস্ময় প্রকাশ করলেন তিনি, 'তাই নাকি? হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন হয়ে গেছে নাকি মরিসাসে?'

রামাধারী বললেন—"কেবল সাহিত্য সম্মেলন? মনিলাল ডাক্তার মরিসাসে এসে বসবাস শুরু করেন ১৯০৭-এ। তাঁর আগমন এ-দ্বীপের আকাশে এক নতুন ঊষার আবির্ভাব যেন। কেবল রাজনীতিতে নয়, ভারতীয় সংস্কৃতিতেও তিনি ছিলেন পরম পারঙ্গম। তাঁরই অক্লান্ত প্রয়াস প্রচেষ্টায় এই দ্বীপে হিন্দি ভাষা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো দ্রুতগতিতে। প্রথমে কেবল 'বৈঠকা'-তেই (Baithka) হিন্দি শেখানো হ'ত, ক্রমে শুরু হ'ল পাঠশালাগুলিতেও। আজকের মরিসাসের যদিও সরকারী সব ক'টি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই হিন্দি ভাষা পড়ানো হয়,তবু 'বৈঠকা' (Baithka)এবং পাঠশালাগুলিতে আজও মাষ্টার মশাইরা পরম আন্তরিকতার সঙ্গেই হিন্দি শিক্ষাদান চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিক আগের মতই।'

আমি প্রশ্ন করলাম-'কেন? বিদ্যাশিক্ষার প্রারম্ভলগ্নে—মরিসাসের ছেলেমেয়েদের কেবল হিন্দিই শেখানো হচ্ছে কেন? এ দ্বীপের নিজস্ব কোনও ভাষা নেই?' 'না'। চুরুটের ধোঁয়ায় পুড়ে কাল্‌চে হয়ে যাওয়া ঠোঁট দু'খানি নেড়ে ধীরে ধীরে বললেন হার্টম্যান,'ঠিক নিজস্ব ভাষা বলে এ দ্বীপে কোন কিছুই কখনো ছিল-তা তো মনে হয় না'। মাত্র দুই দিনের হ্যারিকেন-ট্যুরেও সেটুকু বুঝতে কষ্ট হয়নি আমার। তবে, একটা জিনিস কিন্তু লক্ষ্যণীয়। গাঁয়ের লোকেরা দেখলাম প্রায় সবাই তোমাদের বিহারী ডায়লগে ঐ ভোজপুরীতেই কথাবার্ত্তা চালায়। কিন্তু সহরগুলিতে? সেখানকার অধিবাসীরা যে-ভাষায় কথা বলে, তা কিন্তু সত্যিই অবোধ্য আর

Scanned by CamScanner

অদ্ভুত।' রামাধারী হাসলেন। বললেন 'অদ্ভুতই বটে! ও ভাষাটির নাম Creole। ওটির উৎপত্তি অবশ্য ফ্রেঞ্চ ভাষা থেকেই, কিন্তু এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা জগাখিচুরি।'

এই সময়ে, নিখুঁত ভারতীয় কায়দায় কচি কলাপাতা রং-এর সিল্কের শাড়ী পরে' সরমা এসে দাঁড়ালো তার শিক্ষক পিতার পাশে। গায়ের রং বেশ ফর্সা,ঢলঢলে চোখ-নাক-মুখ। রামায়নে বাল্মিকী বর্ণিত দাক্ষিণাত্যবাসিনীদের সেই কবরীর ফুল-সজ্জার ঐতিহ্য যে আজকের মরিসাসবাসিনীরাও ঐকান্তিক নিষ্ঠায় বহন করে চলেছে, তারই জ্বলন্ত প্রমান যেন সরমার এখনকার পুষ্পগুচ্ছশোভিত ঘনকৃষ্ণ কুন্তলদাম।

পণ্ডিত রামাধারী জার্মান সাহেবের সঙ্গে স্ব-দুহিতাকে পরিচিত করে', পরে জানালেন, "মরিসাসের হিন্দি প্রচারিণী সভা কর্তৃক গৃহীত 'পরিচয়' এবং 'প্রথমা' উভয় পরীক্ষাতেই সরমা সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিল। এবার প্রস্তুত হচ্ছে 'মধ্যমা' দেবার জন্যে। প্রাণে ভারী ইচ্ছা-'উত্তমা'টাও পাশ করার।"

সরল হাসিতে উদ্ভাসিত আননে প্রাজ্ঞ জার্মান সস্নেহে বলে উঠলেন-'তবে তো তুমি একটি অমূল্য রত্ন মা মণি! ঠিক এই মুহূর্ত্তে এই বুড়ো মানুষটার মনেতে কি ইচ্ছা হচ্ছে জানো? ইচ্ছা হচ্ছে-তোমার মাথায় হাত রেখে হাইন্‌রিষ হাইনের ভাষায় বলি—

মীর ইষ্ট্‌ আল্‌স অপ ইষ ভি হ্যাণ্ডে
আউফ্‌স্‌ হাউপ্‌ট ভীর লেগেন জল্‌ট্‌
বেটেন্‌ড়্‌, ভাস্‌ গট্‌ ভীর এরহাল্‌টে
জো রাইন উন্‌ট্‌ শোন্‌ উন্‌ট্‌ হোল্‌ট্‌।'

সপ্রতিভ সরলা শিক্ষক-দুহিতা জানালো 'আমি কি জার্মান ভাষা জানি যে, এর মানে বুঝতে পারবো?'

'এর মানে? এর মানে-তোমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করছি ঈশ্বর যেন চিরদিন তোমায় এম্‌নি মধুর এমনি সুন্দর রাখেন।' এই বলে একটু থামলেন প্রজ্ঞাপ্রবীণ। চুরুট বের করে সেটি ঠোঁটে গুঁজে, তাতে অগ্নি সংযোগ করলেন। তারপর, এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে পুনরায় বললেন 'আমি প্রকৃতি-পাগল খেয়ালী মানুষ। অনেক দিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম হিমালয়ের এখানে ওখানে। যোশি মঠে নেমে আসার পর, হঠাৎ কাগজে পড়লাম একদিন মরিসাসের রাষ্ট্রপ্রধান রামগোলামের ভারতাগমন সংবাদ। রামগোলাম নামটা আমায় আকৃষ্ট করলো। সুদুর মরিসাসের রাষ্ট্রপ্রধানের নামের গোড়ায় রাম? তবে কি শত শত মাইল দূরবর্তী

Scanned by CamScanner

ভারত মহাসাগরীয় ঐ দ্বীপটিতেও বাল্মিকীর সৃষ্টিছায়া সম্প্রসারিত? ওখানেও কি পল্লবলতায় পুষ্পিত হয়ে আছে এই রামের দেশেরই ধর্ম আর সংস্কৃতি? ব্যস্, মনে যেই এই চিন্তার ঝলকানি-অমনি শুরু হ'ল এই পাগলের দিল্লীতে ফিরে গিয়ে মরিসাসের ওপর লেখা নানান লেখকের প্রবন্ধ নিবন্ধের সমুদ্রমন্থন। সে মন্থনে অমৃতই পেলাম মা-মণি। আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলাম-নীল সাগরের জলে ভাসা এই লাবণ্যনির্ঝর দ্বীপে।'

বৃদ্ধের প্রতিটি কথায় প্রত্যয় সমৃদ্ধ। বড়ই আন্তরিক। তাই শুনতে বড় ভাল লাগে। সরমা মুগ্ধ বিস্ময়ে এতক্ষণ তাকিয়েছিল হার্টম্যানের দিকে। তিনি থামতেই সে প্রশ্ন করলো-'ভালো লেগেছে আপনার এই মরিসাসকে?'

'লেগেছে মা-মণি, লেগেছে। আর কেবল কি আমারই ভালো লেগেছে? তুমি হয় তো জানো না-এই বিশ্বের কত নামী আর দামী লোক মরিসাস দেখে দেশে ফিরে গিয়ে কী লিখেছে তোমাদের সম্বন্ধে।'

'কেমন করে জানবো? তেমন বই-টই কি পাওয়া যায় এই দ্বীপে?'

'তা তো বটেই। তবে শোন দু'চার জনের কথা।' জার্মান ভাল করে চুরুটে একটা টান দিয়ে ধূম্রোদ্গীরণ করতে করতে বললেন-'চার্লস ডারুইন্ মরিসাস-দর্শনে এসেছিল ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে। তার মাত্র এক বছর আগে প্রথম ভারতীয় দলটি এসেছিল এই দ্বীপে স্থায়ী বসবাসের ইচ্ছা মনে নিয়ে 'The Voyage of the Beagle-এ ডারুইন লিখেছেন-Before seeing these people,I had no idea that the inhabitants of India were such noble looking figures।'

সোচ্ছ্বাসে সরমা বলে উঠল-'তাই নাকি? ডারুইন লিখেছেন এ- কথা?'

আমি বললাম-'ভারতের সমস্ত প্রান্ত থেকেই তো লোক এসেছিল এ-দ্বীপে-ফন্ হার্টম্যান, অতএব ডারুইনের ঐ inhabitants of India কথাটার মধ্যে বাড়াবাড়ি নিশ্চয়ই নেই!'

'আহা, সে কথাও তো স্বীকার করেছে Julas Duval তার লেখায়। সে তো বলেইছে-All the Disticts from Cape Comorien to the Himalayas contributed to this migration।' বলে,মুহূর্ত্তের জন্যে থেমে, পুনশ্চ বললেন তিনি-'সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক Bernardin be saint Pierre-এর নাম শুনেছ?'

সবিনয়ে জ্ঞাপন করলাম-'পড়েছি তাঁর অমর উপন্যাস Paul and Virginie। তিনি ছিলেন আপনারই মত ভারত-সংস্কৃতির একজন মস্ত ভক্ত।'

Scanned by CamScanner

'Rigrt you are! কিন্তু এবার বলো তো-Paul and Virginie-গ্রন্থের নায়িকা Virginie মরিসাসের মাটিতে পা দেবার আগেই কেন তাকে মেরে ফেললেন লেখক Saint Pierre?'

উত্তর দিলাম-'আমার মনে হয়,পাছে Virginie'র মধ্যে যে ফরাসী সংস্কৃতি সুপ্ত ছিল,তার সংস্পর্শে এসে মরিসাসের ভারতীয় সংস্কৃতির বিকৃতি পায়-সেই আশঙ্কায়। 'বাঃ, একেবারে ঠিকটি ধরেছো।' নিজের মনের মত জবাব পেয়ে জার্মান প্রকৃতি-বিজ্ঞানী যে ভারী খুশি-তা তাঁকে দেখেই বোঝা গেল।

এই সময়, হিন্দি-প্রচারিণী সভার জনৈক কর্মী এসে-'Advance','মরিসাস টাইম্‌স'ও 'জমানা' নামে তিনটি পত্রিকা টেবিলের ওপর রেখে চলে গেল। রামাধারী জানালেন, 'ভারতীয় সংস্কৃতি সম্প্রসারণে এই তিনটি পত্রিকাই চমৎকার কাজ করছে। এরই সঙ্গে সঙ্গে মরিসাস ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন এবং ভারতীয় চলচ্চিত্র ও সঙ্গীতের অবদানও বড় কম নয়।'

'কিন্তু বাবা,' সরমা অনুযোগের সুরে বলল-'কটা বাজে খেয়াল আছে? আমি যে এসেছিলাম তোমাদের কাবাদী (Cavadee) উৎসবের মিছিল দেখাতে নিয়ে যাবার জন্যে। আর বেশী দেরী করলে মিছিল যে ফস্‌কে যাবে!'

সরমার কথায় ব্যাস্ত হয়ে উঠলেন ধীমান জার্মান। বললেন, 'না,না, সে কি কথা মা-মণি? মিছিল ফসকালে চলবে কেন? ঐ মিছিল দেখবার জন্যে পরশু থেকে আমি যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। চলো আর এক মিনিটও দেরী নয়।' এই বলে, সরমার হাত ধরে একপ্রকার টানতে টানতেই দ্রুত এগিয়ে চললেন বড় রাস্তার দিকে ফন্‌ হার্টম্যান।

কাবাদী'র মিছিল দেখে আমি তো হতবাক্‌।

যুবা-বৃদ্ধ সকলে নগ্নপদে চলেছে সারি দিয়ে।

ধুতী পরেছে সকলেই। তাও গৈরিক রং-এ রঞ্জিত।

এ যেন ভারতেরই কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করছি চোখের সামনে।

পণ্ডিত রামাধারী এবার গ্রন্থনার কাজ শুরু করলেন মনে হ'ল। তিনি বলে চললেন-'মহাশিবরাত্রির জলুশেও এ-দ্বীপে এমনই ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী অঙ্গসজ্জা দেখতে পাবেন। দেখতে পাবেন-দেওয়ালী সংক্রান্তি এবং গঙ্গাস্নান পর্বেও ভারতীও সংস্কৃতির এমনি সুস্পষ্ট ছাপ। মহাশিবরাত্রির মিছিলে বাচ্চা-যোয়ান সবাই ধুতী পরিধান করে, আর প্রত্যেকেই মাথায় দেয় গান্ধীটুপি। অবশ্য ঐ একটিমাত্র দিন ছাড়া এখানে গান্ধীটুপি কেউ বড় একটা পরে না। মেয়েরাও শিবরাত্রি-জলুশের বিরাট এক অংশীদার। সে জলুশে তারা সকলেই তার শুভ্র পরিচ্ছদ, যে

Scanned by CamScanner

শুভ্রতাটিকেও ভারতীয় ঐতিহ্যেরই ঐকটি অঙ্গ বলে মেনে নেওয়া চলে।'

'ধূতী আর শাড়ীর চল এখানে কেমন পণ্ডিতজী?' আমার কৌতুহলী প্রশ্ন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন রামাধারী- 'ধুতীটা অবশ্য উৎসব-পার্বন ছাড়া একমাত্র হিন্দু পুরুত এবং কিছু বৃদ্ধ ব্যতীত এখানে কেউই বিশেষ ব্যবহার করে না। তবু, কাওহার আয়োজন যারা করে, তারা ধুতীই পরে। চিতায় মুখাগ্নি যে করবে,তাকেও ধূতীই পরতে হবে। আর, বরের বিবাহ-বেশও ঐধুতীই হতে হবে। কিন্তু শাড়ীর জনপ্রিয়তার অন্ত নেই। হিন্দু মেয়েরা তো শাড়ী পরেই, এখন শহরাঞ্চলের অহিন্দু নারীদের মধ্যেও শাড়ীর ব্যবহার হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। S.A.Waing তো এক জায়গায় শাড়ীর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেই ফেলেছেন, The Saree seems to be irreplacable।'

ক্ষণেকের জন্য নীরব হলেন পণ্ডিত রামাধারী। তারপর জার্মান সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন-"দেখতে পাচ্ছেন ফন্ হার্টম্যান,ভারতীয় সভ্যতার প্রতিটি বস্তুকে এ দ্বীপের মানুষরা আজও কেমন আঁকড়ে ধরে আছে। 'কন্‌টেম্পোরারী মরিসাসে'পড়েছিলাম একটি প্রবন্ধ। তাতে এক জায়গায় লেখা ছিল-Indo-Mauritians do not let their love for India die.The Dhoti and Saree are in evidence.

Temples and mosques are met with.What more-Sermons are delivered with a clock-like regularity। বড় খাঁটি কথা লিখেছেন

লেখক এই দ্বীপবাসীদের সম্বন্ধে। বেশ কিছু দিন ভারত আমাদের ভুলেছিল ফন্ হার্টম্যান। গতকাল্ আপনি স্কুলের মাঠে বসে ঠিক কথাই বলেছিলেন। কিন্তু আমরা আমাদের প্রাণের ভারতকে ভুলিনি কখনও। এমন কি ভারতীয় ঐতিহ্যের সেই কলাপাতার ব্যবহারটুকুকে পর্য্যন্ত আজও আমরা আমাদের প্রথার মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছি। কাবাদী উৎসবে, বিবাহে, অথবা কথকথার আসরে আমরা এখনও কলাপাতাতেই প্রসাদ এবং খাদ্য পরিবেশন করে থাকি। বলতে বলতে হঠাৎ, কেন জানি না, স্বভাব-শান্ত সদাপ্রফুল্ল পণ্ডিতজীর কণ্ঠ অত্যন্ত গাঢ় হয়ে উঠল। ভারতের তাচ্ছিল্যের জন্য অভিমানে, অথবা ভারতের প্রতি শ্রদ্ধায়, নাকি উভয়ের মিলিত কারণে-তাঁর কণ্ঠস্বরের এই পরিণতি-তা ঠিক বোঝা গেল না সেই মুহর্তেই।

চেয়ে দেখি, বৃদ্ধ জার্মানের সপ্রশংস দুই আঁখি তারা পণ্ডিতজীর মুখের ওপরই নিবদ্ধ।

Scanned by CamScanner

এইবার, পিতার কণ্ঠের সুরে সুর মিলিয়ে সেই একই রকম আবেগরুদ্ধ স্বরে সরমা সহসা বলতে আরম্ভ করলো-"ঠাকুদার মুখে শুনেছি, প্রথমে এ-দ্বীপে আসার পর তাঁদের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া অজস্র দুঃখ-ঝঞ্ঝার কাহিনী। কি নিদারুণ দৈন্য দুর্দ্দশার মধ্যে দিয়ে যে তাঁদের অতিবাহিত করতে হয়েছিল প্রতিটি মূহূর্তে। তবু, ভারত থেকে আনা ধর্ম আর সংস্কৃতিকে বুকে করে রক্ষা করেছিলেন তাঁরা।" মূহুর্তের বিরতির পর পুণর্বার সরব হলো পণ্ডিত দুহিতা, 'বাবা একবার আমায় A concise history of Mauritius নামে একটা বই পড়তে দিয়েছিলেন। ঐ বই-এর ৮৯ পৃষ্ঠায় আছে কবি। L' Eoville L' Homme-এর নির্লজ্জ ঘোষণার উদ্ধিতি। ১৯০১ সালে L' Eoville L' Homme নাকি লিখেছিলেন যে, মরিসাস দ্বীপ ইন্দো-মরিসিয়ানদের সাদর অভ্যর্থনা জানাবে কেবল মাত্র তখনই যখন তারা তাদের ভারত থেকে নিয়ে আসা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রথাগুলি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে রাজী হবে। কি সাংঘাতিক হৃদয়হীন কথা প্রখ্যাত এক কবির কলমের মুখে! এই রকম আরও কত ধাক্কাই না নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল এ-দ্বীপে প্রথমাগত ভারতীয়দের। তবু, কখনই তারা তাদের ধর্ম সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে অভারতীয় হয়ে যাবার কথা তাদের চিন্তাতেও প্রশ্রয় দিতে পারে নি। আর, সেই ভারতই কিনা দীর্ঘ প্রায় এক শতাব্দী সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হয়ে ছিল মরিসাসের চলে আসা এই ছিন্নমূল ভারত সংস্কৃতির পূজারীদের! একথা ভাবতেও বুকের মধ্যে কোথাও যেন কাঁটার ব্যথা খচ্ খচ্ করে লাগে।' অশ্রুবাষ্পে আপনা থেকেই রুদ্ধ হয়ে গেল বুঝি অভিমান ক্ষুণ্ণা সরমার আবেগ উদ্বেল কণ্ঠস্বর।

হার্টম্যানের নয়নদ্বয়ও সহানুভূতির প্রলেপে সজল হয়ে উঠেছে দেখতে পেলাম। সরমার পিঠে সস্নেহে হাতটি রেখে ধীরে ধীরে বললেন তিনি—' তোমার কথা শুনে এখন বেশ বুঝতে পারছি, মা-মনি মরিসাসের প্রাক্তন গভর্ণর স্যার হিলারী ব্লাড কেন বলেছিলেন—Those who Follow the European way of life. or think they see, a great threat from those who follow the oriental way of life. And the more the Franco-Mauritian section of the comnunity, largely in self defence, emphasises the excellence of its religion its culture and its social customs, the more does the Hindu lay stress on his religion and culture, action and reaction, as always'.

'বো-বেসিনের সেই দিনটি' বিশেষ করে সেই মুহূর্তটি আমি আজও ভুলতে পারি নি। ভারত থেকে বহু দূরে অবস্থিত মহাসমুদ্রে নীলাম্বুরাশি পরিবৃত এক দ্বীপের অধিবাসী দুই ভারতীয়ের অভিমান ক্ষুণ্ণতা, আর, এক ভারত প্রেমী ইউরোপীয় প্রজ্ঞাবানের উদার সহানুভূতির উদাত্ততা-সেদিন এক অনুভবমুখর মুহূর্তে হঠাৎ যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এবং সেই একীভূত

Scanned by CamScanner

উচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে স্পষ্টই ফুটে উঠেছিল ভারতের প্রতি তাদের তিন জনেরই অতলস্পর্শী শ্রদ্ধাটুকু।

এরপর, বেশ কিছুক্ষণ, সকলেই নীরব ছিল, মনে আছে। হার্টম্যানের হাতের চুরুট কখন নিভে গেছে। চুরুটটা পকেটে গুঁজে, তিনিই শেষে ভঙ্গ করলেন নীরবতা। কিছুটা অন্যমনস্কের মতই যেন বিড় বিড় করলেন তিনি—" রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অফ কাল্চারের পুরাণো একটা বুলেটিনে পড়েছি- পণ্ডিত ঋষিরামের এক অনুতপ্ত আক্ষেপের কথা। ১৯৫৩ সালের সেই বুলেটিনে পণ্ডিত ঋষি রাম লিখেছেন-'আমি যখন সম্প্রতি মরিসাসে যাই, তখন দেখি, চতুর্দিক থেকে হাজার হাজার হিন্দু এসে সমবেত হচ্ছে কেবল ভারত মায়ের সম্বন্ধে দুটো কথা শোনার দুরন্ত আগ্রহে। সে দৃশ্য দেখে-অশ্রুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না কিছুতেই। হঠাৎ আমার মনে হ'ল এদের যোগ্য আমরা নই। যে ভারত একশো বছরেরও বেশী সময় এদের কোন সহায়তাই দেয় নি, সেই ভারতেরই প্রতি আজও এদের ভালবাসা কত গভীর। সেই ভারতেরই রামায়ণ গানে এরা সর্ব্বদাই মুখর।' আজ বুঝতে পারছি, মা-মণি, ঋষিরামের চোখে জল কেন এসেছিল।" এই বলেই বৃদ্ধ ন্যাচারালিষ্ট সহসা স্তব্ধ হলেন।

আর, ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার মনে পড়ে গেল গতকালের চাবুকের কথা। কেন যে প্রকৃতি পাগল ভারত বন্ধু এই আপনভোলা জার্মান গতকাল হঠাৎ অমন ভাবে ভৎর্সনা করে উঠেছিলেন আমাকে-' তোমাদের লজ্জা করে না?'- এখন যেন হৃদয়ঙ্গম করলাম তার অন্তর্নিহিত কারণটাকে।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

Scanned by CamScanner